অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন : সূচনা পর্ব

অমিতাভ চন্দ্র

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৬০

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ
অমিয় ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ওয়েলনোন প্রিণ্টার্স
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স
৩২ বিডন রো
কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

চরম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অবিভক্ত বাংলায়
যাঁরা কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে গত তিরিশ-চল্লিশ বছর যাবৎ বেশ কয়েকটি গবেষণাধর্মী পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই বইগুলিতে মূলত এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি'র বিভিন্ন পর্বের তাত্ত্বিক-রাজনীতিক সিদ্ধান্ত-সমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং বলা বাহুল্য, লেখকদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি'র বিভিন্ন সময়ের রাজনীতিক অবস্থানের বিশ্লেষণ করেছেন। সব কটি প্রকাশিত পুস্তকই সম মানের এ কথা বলা যাবে না। কিন্তু এদের মধ্যে কয়েকটি বই যে উচ্চমানের, সে বিষয়ে বিতর্কের বিশেষ কোন অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া, বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য কমিউনিস্ট পার্টি'র দলিলসমূহ (অপ্রকাশিত দলিলসমূহও) সংকলিত ও সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হওয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস বোঝার কাজও আজ অনেকটা সহজ হয়েছে। এই বইগুলির আকরমূল্য অপরিসীম, এ কথা নিঃসংশয়েই বলা যেতে পারে। এর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে বেশ কয়েকজন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতার আত্মজীবনীমূলক রচনা। এঁদের স্মৃতিচারণায় তাঁদের রাজনীতিক জীবনের অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। স্মৃতিকথা নিশ্চয়ই ইতিহাস নয়, কিন্তু ইতিহাস রচনার কাজে এর গুরুত্বও নেহাত অকিঞ্চিৎকর নয়। মৌখিক ইতিহাস বা oral history ও ইতিহাস রচনার আর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। অনেক গবেষক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সেই উপাদান সংগ্রহ করেছেন। সরকারী মহাফেজখানায় সংরক্ষিত নথিপত্র, পুলিস রিপোর্ট ও সমকালীন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট এবং প্রবন্ধও ইতিহাস রচনা ও পাঠের সহায়ক। এতাবৎ গবেষণাধর্মী যে কয়টি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে তাদের গ্রন্থকাররা এই সব উপাদান কম বেশী ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসকে আরও গভীরে বুঝতে গেলে প্রয়োজন অনুপুঙ্খ পর্যালোচনার। বিভিন্ন প্রদেশে (রাজ্যে) কমিউনিস্ট আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস রচনাও একান্ত জরুরী। অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের উন্মেষ পর্বের (১৯১৭-২৯) ও সেই পর্বে বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে কমিউনিজমের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের এবং পাঞ্জাবের কমিউনিস্ট আন্দোলনের (১৯২৬-৪৭) উপর ভগওয়ান যোশের পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। কেরলের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা পর্বের উপর এন. ই. বলরামের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কেরল সহ দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের (রাজ্যের) কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে আঞ্চলিক ভাষায় পুস্তক প্রকাশিত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। কেতাবী অনুসন্ধিৎসার কারণেই নয়, ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনে অসম বিকাশ কেন ঘটেছে (আজও যে অসমতা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়), তা যথাযথ অনুধাবন করতে না পারলে কেবল তা জ্ঞানচর্চার

ক্ষেত্রকেই সীমাবদ্ধ করবে না, ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডেও ভ্রান্তির সম্ভাবনা দূর করা যাবে না। তবে ইদানীং কয়েক বছরে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস না হলেও কয়েকজন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা তাঁদের নিজেদের কর্মক্ষেত্রে—হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, রংপুর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি—পার্টি গড়তে গিয়ে ও বিভিন্ন আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তা লিপিবদ্ধ করে খানিকটা পরিমাণে আমাদের জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করতে হলে প্রয়োজন সব উপাদানের বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রদেশের, বিভিন্ন জেলার অনুপুঙ্খ পর্যলোচনার। সেই ভিত্তিতেই রচিত হতে পারে এ দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রামাণিক ইতিহাস।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক শ্রীমান্ অমিতাভ চন্দ্র অবিভক্ত বাংলার তিনটি জেলার—কলকাতা, হাওড়া ও মুর্শিদাবাদ—কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভব ও বিকাশ (১৯৩০-৪৭) সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে গবেষণারত। কিন্তু তার জিজ্ঞাসা আরও ব্যাপক ও গভীর। এই বইয়ের সূচী দেখলেই তা বোঝা যাবে। অমিতাভ এই বইয়ে তার মূল গবেষণার বিষয় অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করা ছাড়াও আর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেছে।

ইতিহাসেরও ইতিহাস থাকে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসের পিছনেও আছে এক উত্তরণের ইতিহাস। অগ্নিনালিকার রাজনীতিতে বিশ্বাসী জাতীয় বিপ্লবীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কিভাবে তাঁদের দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত ধ্যানধারণা ও কর্মনীতিকে অতিক্রম করে কমিউনিস্ট মতাদর্শকে গ্রহণ করলেন ও তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করলেন, তার সব তথ্য আজও উদ্ঘাটিত হয় নি। শ্রীমান্ অমিতাভ এই প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ বিস্মৃতপ্রায় কয়েকটি গোষ্ঠী সম্পর্কে বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য দলিল—সমকালীন পত্রপত্রিকা, পুস্তিকা, সরকারী মহাফেজখানায় সংরক্ষিত নথিপত্র, পুলিস রিপোর্ট—এবং ওই যুগের প্রবীণ সংগঠকদের (যাঁদের অধিকাংশই স্বল্প-পরিচিত বা অপরিচিত) সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছে। এই কাজ মৌলিক গবেষণাধর্মী হিসাবে সুধীজনের সাধুবাদ পাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এবং ভবিষ্যতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সম্পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার এক উল্লেখযোগ্য আকর হিসাবে স্বীকৃত হবে, এমন ধারণা করাও অমূলক হবে না।

এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস কেবল কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এদেশের বামপন্থী ও কমিউনিস্ট রাজনীতির ছাত্রমাত্রই অবগত আছেন যে তিরিশের দশকের প্রথম দিকে বেঙ্গল লেবার পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। দু-এক বছর মতাদর্শগত আভ্যন্তরিক টানাপোড়েনের পর ১৯৩৪-এ এই দল কমিউনিস্ট পার্টির সমান্তরাল একটি মার্কসবাদী দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমান গ্রন্থের লেখক দুটি প্রবন্ধে এই পার্টি সম্পর্কে তথ্যনির্ভর আলোচনা করেছে। বাংলাভাষায় লেবার

পার্টি সম্পর্কে এর আগে এই ধরনের আলোচনা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ইংরেজীতেও এই পার্টি সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে তাও এত তথ্যসমৃদ্ধ নয়। সেই দিক্ থেকে এই অধ্যায়ের আলোচনা বিশেষ মূল্যবান্ বলে মনে করি।

আদর্শ গবেষণাকর্মী শ্রীমান্ অমিতাভর এই বইটি অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা ও বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে আমাদের প্রভূত সহায়তা করবে। বহু অজানা তথ্যের আলোকে মূল্যায়নের কাজও সহজ হবে।

শ্রীমান্ অমিতাভ চন্দ্রের এই বইয়ের প্রত্যেকটি রচনায় ধৈর্য, নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। তাঁর বক্তব্য সর্বজনগ্রহণযোগ্য না হতে পারে, মূল্যায়নের প্রশ্নে ভিন্নমতের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু তাতে তার কাজের গুরুত্ব কোনভাবেই ক্ষুণ্ণ হবে না, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। তার সব বক্তব্যের সঙ্গে (তথ্যের সঙ্গে নয়) ব্যক্তিগতভাবে আমি ঐকমত্য পোষণ করি, এমন কথা বলতে পারছি না। কিন্তু অমিতাভর রচনার উৎকর্ষ সম্পর্কে আমি নিঃসংশয়। মতের ভিন্নতাই স্বাভাবিক, বিশেষত সমকালীন ইতিহাস পর্যালোচনায়। মানুষকে এক ছাঁচে গড়ে বস্তুপিণ্ডে পরিণত করতে গেলে কি বিষম বিপত্তি ঘটে তা সম্প্রতিকালে ফলিত সমাজতন্ত্রের অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে।

পরিশেষে, পুনরুক্তি হলেও বলা দরকার এই বইটি অবিভক্ত বাঙলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আগ্রহী সকলের—গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র, কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মী—জিজ্ঞাসাকে বহুলাংশে পরিতৃপ্ত করবে। প্রবন্ধ-সংকলনটি কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিবৃত্ত রচনায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসাবে সমাদৃত হবে বলে আশা করি।

নিবেদন

১৯২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর কানপুরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হল। অবশ্য স্বদেশের মাটিতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর আগেই বিদেশের মাটিতে, তাশকন্দে, ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশের দশকের গোড়া থেকেই প্রধানত মুজফ্ফর আহ্‌মদ এবং তাঁর সঙ্গে আব্দুল হালিম, আব্দুর রেজ্জাক খাঁ প্রমুখের প্রচেষ্টায় অবিভক্ত বাংলায় কলকাতাকে কর্মস্থল হিসাবে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন প্রচেষ্টার সূত্রপাত ঘটলেও এই প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হল ১৯৩১ সালের একদম গোড়ার দিকে, যখন আব্দুল হালিমকে সাধারণ সম্পাদক করে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ও স্থায়ীভাবে "কলিকাতা কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অংশ"—এই নাম দিয়ে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা হল, যদিও প্রকৃতপক্ষে তখনও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে "কলিকাতা কমিটি"র কোনও যোগাযোগই স্থাপিত হয় নি। সাত দশকের সমীপবর্তী এই কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাফল্য-ব্যর্থতার খতিয়ানের সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস চর্চা একান্ত প্রয়োজন, কারণ কমিউনিস্ট আন্দোলনের বর্তমানের সঠিক মূল্যায়নের এবং ভবিষ্যতের সঠিক দিশা নির্ধারণের জন্যই তার অতীতটাকে জানা দরকার। অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের লেখা *Communism and Bengal's Freedom Movement*, Volume 1 (1917-29) নিঃসন্দেহে অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের একদম গোড়ার যুগের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে একটি অতীব মূল্যবান গ্রন্থ, কিন্তু তার সময়সীমা নির্দিষ্ট ১৯২৯ সাল পর্যন্ত। মুজফ্ফর আহ্‌মদ, রণেন সেন, সরোজ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু, মনোরঞ্জন রায়, মণি সিংহ, খোকা রায় প্রমুখের লেখা স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থে এবং আব্দুল হালিম, সোমনাথ লাহিড়ী, ধরণী গোস্বামী প্রমুখের বিভিন্ন স্মৃতিচারণামূলক রচনায় অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস চর্চার অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান পাওয়া যায় এবং সেই কারণে এই গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলির মূল্য অপরিসীম, কিন্তু স্মৃতিচারণা কখনই পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস চর্চায় ঐকান্তিক আগ্রহ থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অবেক্ষণে গত প্রায় পাঁচ বছর যাবৎ বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ও কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ও বিকাশের প্রথম দুই দশকের (১৯৩০-১৯৪৭) ইতিহাস নিয়ে গবেষণার কাজে লিপ্ত আছি। এই গবেষণা-সূত্রেই একদিকে যেমন কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে প্রভূত তথ্য সংগ্রহ করেছি, অপরদিকে তেমনই অবগত হয়েছি অবিভক্ত বাংলাদেশে বিশের দশকের শেষভাগ থেকে আরম্ভ করে তিরিশ-চল্লিশ দশক জুড়ে কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতীতও বিভিন্ন ছোট-বড় বামপন্থী দলের অস্তিত্বের কথা। বিস্মৃতপ্রায় এই বামপন্থী দলগুলির অধিকাংশই আত্মপ্রকাশের কয়েক বছরের মধ্যেই হয় অবলুপ্ত

হয়ে যায়, নয় মূল কমিউনিস্ট পার্টিতে মিশে যায়, যদিও কয়েকটি দল অনেক বছর অবধি নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এই বামপন্থী দল বা কমিউনিস্ট গ্রুপগুলি আজ প্রায় বিস্মৃতির অন্তরালে, কিন্তু সেই যুগে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েও কমিউনিজম প্রচার এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন বিকাশ ও প্রসারের ক্ষেত্রে স্বল্পকালীন স্বাধীন অস্তিত্বের পর্যায়ে এই দলগুলি যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই বামপন্থী দলগুলির কয়েকটির মাধ্যমে ঘটেছিল জাতীয় বিপ্লববাদীদের কমিউনিস্ট মতাদর্শে উত্তরণ, আর কয়েকটি দল প্রথম থেকেই কমিউনিজমে আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিল। বিস্মৃতপ্রায় এই বামপন্থী দল বা কমিউনিস্ট গ্রুপগুলি সম্পর্কে আমার আগ্রহ কমিউনিস্ট পার্টি সংক্রান্ত আমার মূল গবেষণার পাশাপাশি এই দলগুলি সম্পর্কেও তথ্যসংগ্রহের কাজে আমায় নিরত করে। মূল কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য বামপন্থী দল বা কমিউনিস্ট গ্রুপ সম্পর্কিত তথ্যসংগ্রহের ফসল হিসাবে অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা এবং অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকটির বিবরণ আমি অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ইতিহাস-অনুসন্ধান বই-এর দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম খণ্ডে, অধ্যাপক আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ সম্পাদিত ইতিহাস-অনুসন্ধান-এর ষষ্ঠ খণ্ডে এবং অনীক, পরিচয়, মূল্যায়ন ও পদাতিক-এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে পাঠকদের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। বর্তমান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত এগারটি প্রবন্ধ উল্লিখিত এই প্রবন্ধাবলীর পরিমার্জিত এবং পাঁচটি ক্ষেত্রে পরিবর্ধিত সংস্করণ।

বর্তমান সংকলনে কমিউনিস্ট আন্দোলন কথাটিকে একদিকে ব্যাপক এবং অপরদিকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কমিউনিস্ট আন্দোলন কথাটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে কারণ কমিউনিস্ট আন্দোলন বলতে কেবলমাত্র ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বা এই কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত আন্দোলনগুলিকেই বোঝানো হয় নি অর্থাৎ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে কেবলমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই অবস্থিত নয়। পক্ষান্তরে কমিউনিস্ট আন্দোলন বলতে কমিউনিজম বা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ গ্রহণকারী প্রায় সমগ্র আন্দোলনটিকেই বোঝানো হয়েছে, যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতীত অন্যান্য বামপন্থী দল বা কমিউনিস্ট গ্রুপগুলিরও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অপরদিকে কমিউনিস্ট আন্দোলন কথাটিকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে কারণ কমিউনিস্ট আন্দোলন বলতে এখানে কেবলমাত্র কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অর্থাৎ তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুগমনকারী কমিউনিস্ট আন্দোলনটিকেই বোঝানো হয়েছে। ফলে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধারাকে সচেতনভাবেই বর্তমান সংকলনের পরিধির বাইরে রাখা হয়েছে কারণ এই ধারাটি তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুবর্তী ছিল না। এখানে এই ধারাটির একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়েই আমার কর্তব্য সমাপন করছি। ১৯৩৪ সালের জানুআরি

মাসে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশে ফিরে আসার পর কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই ধারাটির সৃষ্টি হয়। ১৯৩৪ সালেই সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট লীগ অভ্ ইণ্ডিয়া নামে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র সমান্তরাল একটি নতুন কমিউনিস্ট দল গঠিত হয়। গঠিত হওয়ার সময় এই দলের সদস্য ছিলেন পাঁচজন: সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীর দাশগুপ্ত, প্রভাত সেন, রঞ্জিত মজুমদার ও অরুণ ব্যানার্জী। ১৯৪১ সালে তৃতীয় কনফারেন্সে এই দল কমিউনিস্ট পার্টি অভ্ ইণ্ডিয়া নাম গ্রহণ করে। ১৯৪২ সালে "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের সময় এই দলের নাম আবার পরিবর্তিত হয়ে রেভলিউশনারী কমিউনিস্ট পার্টি' অভ্ ইণ্ডিয়া হয়। (*Historical Development of Communist Movement in India*, Edited and published by the Polit-bureau, C. C., Revolutionary Communist Party of India, Calcutta, December, 1944, pp. 22, 29, 43-44, 58-59).

বর্তমান সংকলনভুক্ত এগারটি প্রবন্ধকে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু কমিউনিস্ট পার্টি'। প্রথম তিনটি প্রবন্ধ এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সংকলনের প্রথম প্রবন্ধ, 'বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম পর্যায়: ১৯২৮-১৯৩৫,' ইতিহাস-অনুসন্ধান-এর চতুর্থ খণ্ডে (১৯৮৯) প্রকাশিত 'বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগ: ১৯২৮-১৯৩৫' নামক প্রবন্ধের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। দ্বিতীয় প্রবন্ধ, 'বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়: ১৯৩৫-১৯৩৯,' ইতিহাস-অনুসন্ধান-এর পঞ্চম খণ্ডে (১৯৯০) প্রকাশিত 'বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৩৫-১৯৩৯)' নামক প্রবন্ধের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ। অনীক পত্রিকার আগস্ট, ১৯৯০ (বর্ষ ২৭, সংখ্যা ২) সংখ্যায় 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' (১৯৩৯-১৯৪৫): কলকাতা মহানগরী—একটি সমীক্ষা' নামক প্রবন্ধটির প্রথম পর্ব ('সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' পর্ব) প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংকলনের তৃতীয় প্রবন্ধ, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি': সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪১): কলকাতা মহানগরী—একটি সমীক্ষা,' অনীক-এ প্রকাশিত প্রবন্ধটিরই পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ।

চতুর্থ থেকে নবম—মোট ছটি প্রবন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিধিভুক্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজম। চতুর্থ প্রবন্ধ, 'জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজম: মধ্যবর্তী কয়েকটি স্তর', ইতিহাস-অনুসন্ধান-এর ষষ্ঠ খণ্ডে (১৯৯১) প্রকাশিত। পঞ্চম প্রবন্ধ, 'ইয়ং কমরেডস্ লীগ: বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ও কমিউনিস্ট পার্টি'-গঠনের সংগঠিত সূচনা,' পদাতিক-এর ১৯৮৮ সালের বইমেলা সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির অনেকাংশে পরিবর্ধিত ও আমূল পরিমার্জিত সংস্করণ। ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম প্রবন্ধ, 'যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘ: জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ,' 'ইণ্ডিয়ান প্রোলেটারিয়ান রেভলিউশনারী পার্টি': জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ', 'সাম্যরাজ পার্টি': স্বরাজের বিকল্প পথসন্ধান'

এবং 'তিরিশের দশকে বাংলায় কয়েকটি কমিউনিস্ট সংগঠনের ভূমিকা,' যথাক্রমে পরিচয় পত্রিকার ফেব্রুআরি, ১৯৯০ (বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ৭) সংখ্যায় এবং মূল্যায়ন পত্রিকার শারদীয়, ১৩৯৬ (১৯৮৯, বর্ষ ২৫), নববর্ষ, ১৩৯৭ (১৯৯০, বর্ষ ২৬) ও শারদীয়, ১৩৯৭ (১৯৯০, বর্ষ ২৬) সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত প্রবন্ধচতুষ্টয়ের ঈষৎ পরিমার্জিত সংস্করণ।

তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি। দশম ও একাদশ—শেষ দুটি প্রবন্ধ এই অধ্যায়ের অন্তর্গত। বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সংকলনের ভিত্তিতে রচিত 'বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি—সংগঠন ও রাজনীতি (১৯৩২-১৯৪৪)' নামে একটি প্রবন্ধ অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ইতিহাস-অনুসন্ধান-এর তৃতীয় খণ্ডে (১৯৮৮) প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বলশেভিক পার্টির রাজনীতি ও কার্যকলাপ সম্পর্কিত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা ঐ প্রবন্ধের অন্তর্ভূর্ত ছিল। পরবর্তী তিন বছরে বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি সম্পকিত বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত আরও বহু তথ্য 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বলশেভিক পার্টি' সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ রচনায় আমাকে প্ররোচিত করে। একদা বেঙ্গল লেবার পার্টির ও বলশেভিক পার্টির এবং পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির তিন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় সদস্য কমল সরকার (বর্তমানে সুপরিচিত সি. পি. আই.-এম. নেতা), নন্দলাল বসু ও নির্মল সেনগুপ্ত দীর্ঘ দিন ধরে সাক্ষাৎকার দিয়ে ও অন্যান্যভাবে এই ধরনের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লেখার কাজে আমায় উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের ইচ্ছাকে সম্মান জানানোও এই ধরনের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই তিনজন ছাড়াও ইতিহাস-অনুসন্ধান-এর সম্পাদক অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় নানাবিধ সাহায্যের মাধ্যমে এবং প্রয়োজনীয় অনুমতি দিয়ে এই বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার কাজে আমায় উৎসাহ যুগিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সি. পি. আই. দলের সুপরিচিত তাত্ত্বিক নেতা অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার আগে বলশেভিক পার্টির সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৪১ সালে বলশেভিক পার্টির সদস্য হন এবং ১৯৪৩ সালের ফেব্রুআরি মাসে বলশেভিক পার্টি ত্যাগ করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। (লেখকের সঙ্গে গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার—১৭. ৮. ১৯৮৭)। এই সমস্ত তথ্যসংগ্রহ-সাহায্য-উৎসাহ-অনুমতির পরিণতিতে রচিত 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বলশেভিক পার্টি : ১৯৩৯-১৯৪৫' নামে একটি প্রবন্ধ পরিচয় পত্রিকার নভেম্বর, ১৯৯০ (বর্ষ ৬০, সংখ্যা ৪) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংকলনভুক্ত দশম প্রবন্ধ, 'বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি : ১৯৩২-১৯৩৯ : সংগঠন ও রাজনীতি', ইতিহাস-অনুসন্ধান-এর তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত প্রবন্ধটির ১৯৩২ থেকে ১৯৩৯ সময়সীমার অন্তর্বর্তী অংশের অনেকাংশে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ। একাদশ প্রবন্ধ, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বলশেভিক পার্টি : ১৯৩৯-১৯৪৫,' পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির ঈষৎ পরিমার্জিত রূপ।

এই প্রসঙ্গে সংকলনটি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া দরকার। প্রথমত, সংকলনটির নামকরণ করা হয়েছে 'অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন : সূচনা পর্ব'। আলোচনাকে মূলত তিরিশের দশকেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কিত আলোচনা তিরিশের দশকের গণ্ডি ছাড়িয়ে চল্লিশের দশকে পা দিয়েছে, কিন্তু সে আলোচনায় ১৯৪১ সালেই ছেদ টানা হয়েছে। যার ফলে অবিভক্ত বাংলায় "জনযুদ্ধে"র যুগে একদিকে ফ্যাসিবিরোধিতায় এবং অপরদিকে "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের বিরোধিতায়, মন্বন্তরের মোকাবিলায়, যুদ্ধ-পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ আন্দোলনে, দাঙ্গা প্রতিরোধে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় কমিউনিস্ট পার্টি'র ভূমিকা ও কার্যকলাপ বর্তমান সংকলনের পরিধিভুক্ত হয় নি। গুরুত্ব বিবেচনায় ও বৈচিত্র্যে ১৯৪১ থেকে ১৯৪৭ পর্যায়ের কমিউনিস্ট পার্টি'র ভূমিকা ও কার্যকলাপ পৃথক এক সংকলনের বিষয়বস্তু হওয়ার যোগ্যতা রাখে। 'সূচনা পর্বে' কমিউনিস্ট পার্টি'র ভূমিকা ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত আলোচনায় ১৯৪১ সালে ছেদ টানা হলেও বলশেভিক পার্টি সংক্রান্ত আলোচনাকে ১৯৪৪ সাল অবধি বিস্তৃত করা হয়েছে। তার কারণ বলশেভিক পার্টি'র ইতিহাস চর্চায় ১৯৪৪ সাল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। "জনযুদ্ধ" তত্ত্ব গ্রহণের পর থেকেই বলশেভিক পার্টি'র মধ্যে যে দুই মতের দ্বন্দ্ব চলছিল, তা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করল ১৯৪৪ সালে। ১৯৪৪ সালের মে মাসে বলশেভিক পার্টি'র সদস্যদের একটা বড় অংশ বলশেভিক পার্টি ত্যাগ করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। বর্তমান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলিতে দেখানো হয়েছে, কিভাবে একের পর এক কমিউনিস্ট গ্রুপ নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে মূল কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই মূল ধারাটিকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। মূল কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের এই যে ধারার সূত্রপাত হয় তিরিশের দশকে, অবিভক্ত বাংলায় তাতে সর্বশেষ সংযোজন ছিল বলশেভিক পার্টি। অবশ্য বলশেভিক পার্টি বিলুপ্ত হয় নি, সদস্যদের একটা বড় অংশের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান সত্ত্বেও একটি সমান্তরাল শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হিসাবে বলশেভিক পার্টি তার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ও বলশেভিক পার্টি'র জটিল পারস্পরিক সম্পর্কটিকে সম্যকরূপে অনুধাবনের জন্য এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের ধারাটির সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়ার জন্যই বলশেভিক পার্টি সম্পর্কিত আলোচনাটিকে ১৯৪৪ সাল অবধি বিস্তৃত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বর্তমান সংকলনভুক্ত প্রবন্ধগুলিতে সূত্রনির্দেশের আধিক্য আছে। এর ফলে ফুটনোটস্-রেফারেন্সেস্-কণ্টকিত এই অভিযোগের কাঠগড়ায় কেউ কেউ এই সংকলনটিকে দাঁড় করাতে পারেন এই আশঙ্কা সত্ত্বেও সচেতনভাবেই এটা করা হয়েছে। আমি সত্যের একমাত্র জিম্মাদার—এরকম কোনও দাবিই আমার নেই। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা পর্বের ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল বহু ব্যক্তির দীর্ঘ সাক্ষাৎকার থেকে এবং অন্যান্য আরও বহু আকর থেকে প্রবন্ধগুলির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি। যাঁদের সাক্ষাৎকার থেকে এবং অন্যান্য যে সমস্ত সূত্র থেকে তথ্য আহরণ

করেছি, তার যথাযোগ্য স্বীকৃতি প্রদান প্রয়োজন। একমাত্র সূত্রগুলির যথাযথ নির্দেশের মাধ্যমেই এই যথাযোগ্য স্বীকৃতি প্রদান সম্ভব। ফলে এই প্রবন্ধগুলির ক্ষেত্রে সূত্রনির্দেশের আধিক্য স্বাভাবিক। বিস্তারিত সূত্রনির্দেশ না করলে যাঁদের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছি ও অন্যান্য যে সমস্ত সূত্র থেকে তথ্য আহরণ করেছি, তাঁদের সকলের কাছে এবং সর্বোপরি নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী হয়ে থাকতাম। এ ছাড়াও আর একটি কারণে বিস্তারিত সূত্রনির্দেশ করেছি। উৎসাহী পাঠক ও উৎসুক গবেষক সূত্রনির্দেশ থেকে সমস্ত আকরের সন্ধান পাবেন এবং প্রয়োজনবোধে উল্লিখিত আকর থেকে প্রবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই করে নিতে পারেন।

তৃতীয়ত, বর্তমান সংকলন পৃথক পৃথক জায়গায় প্রকাশিত এগারটি প্রবন্ধের সমাহার। পৃথক এই প্রবন্ধগুলির নির্দিষ্ট প্রয়োজনে কয়েকটি ক্ষেত্রে একই তথ্য একাধিক প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল। বর্তমান সংকলন প্রকাশের সময় প্রবন্ধগুলি পরিমার্জন করে পৌনঃপুনিকতা যতদূর সম্ভব বর্জন করা হয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তুর নির্দিষ্ট প্রয়োজনে কোনও কোনও ক্ষেত্রে একাধিক প্রবন্ধে একই তথ্য ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি।

প্রবন্ধাবলীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বিভিন্ন সূত্র থেকে। প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ ছাড়াও সংবাদপত্র, কমিউনিস্ট পার্টির ও অন্যান্য কমিউনিস্ট গ্রুপের পত্র-পত্রিকা, কমিউনিস্ট সংবাদপত্র, কমিউনিস্ট পার্টির দলিল, কমিউনিস্ট ইস্তাহার, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মুখপত্র ও দলিল, জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত সরকারী নথিপত্র, ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে ও স্পেশাল ব্রাঞ্চে সংরক্ষিত তৎকালীন পুলিস রিপোর্ট প্রভৃতি সূত্র থেকে প্রভূত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। তৎকালীন কমিউনিস্ট আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণকারী বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতাদের স্মৃতিচারণমূলক বই ও প্রবন্ধও আমার তথ্যসংগ্রহের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। কয়েকটি অপ্রকাশিত স্মৃতিচারণও আমার হাতে এসেছে, যেগুলি থেকেও বহু তথ্য সংকলিত হয়েছে। প্রাগুক্ত সূত্রগুলি ব্যতীতও অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার আমার তথ্যাহরণের সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট মাধ্যম। সাক্ষাৎকার নেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি কলকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন জেলা শহরে, মফস্বলে ও গ্রামে। "মুখে মুখে ইতিহাস" বা "মুখের কথায় ইতিহাস"—এর মূল্য অনস্বীকার্য।

বর্তমান সংকলনে বানানের ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে রাজশেখর বসু সংকলিত 'চলন্তিকা' অনুসরণ করেছি। এই কারণেই জানুআরি, ফেব্রুআরি প্রভৃতি 'চলন্তিকা'-সম্মত বানান ব্যবহৃত হয়েছে। একই কারণে ী ও ূ কেও সম্পূর্ণ নির্বাসিত করা হয় নি।

আমাদের সম্মিলিত আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রণ প্রমাদ সম্পূর্ণ পরিহার করা সম্ভবপর হয় নি। এগুলির মধ্যে অধিকাংশই এত সামান্য যে পৃথক শুদ্ধিপত্র দেওয়ার কোনও

প্রয়োজন নেই। সুধী পাঠক নিজ গুণেই এই মুদ্রণ প্রমাদগুলিকে মার্জনা করে দেবেন। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রণ প্রমাদ এখানে সংশোধন করে দেওয়া হল। ৪ পৃষ্ঠার ২৯ লাইনে আছে ভাটাপাড়া, হবে ভাটপাড়া; ২৫ পৃষ্ঠার ১৮ লাইনে আছে Forward, হবে Foreword; ঐ পৃষ্ঠারই ২৫ লাইনে আছে England, হবে Enlarged; ৫৮ পৃষ্ঠার ৫ লাইনে আছে নীতি, হবে নতি; ১২২ পৃষ্ঠার ১৬ লাইনে আছে বিস্তৃতির, হবে বিস্মৃতির; ১২৭ পৃষ্ঠার ১ লাইনে আছে মুখপাত্র, হবে মুখপত্র। আশা রাখি, পাঠকবর্গের সহৃদয় সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হব না।

আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকারের তালিকাটি দীর্ঘ হওয়াই স্বাভাবিক। গবেষণার প্রয়োজনে অনেকের কাছেই আমি ঋণগ্রস্ত। একমাত্র যথাযোগ্য স্বীকৃতির মাধ্যমেই এই ঋণভার কিছুটা লাঘব করা সম্ভব। ন্যাশনাল আর্কাইভ্স্ অভ্ ইণ্ডিয়া, আর্কাইভ্স্ অন কণ্টেম্পোরারি হিস্ট্রি অভ্ ইণ্ডিয়া (পি. সি. যোশী আর্কাইভ্স্) এবং অজয় ভবন লাইব্রেরি (নয়া দিল্লী), ন্যাশনাল লাইব্রেরি (সংবাদপত্র বিভাগ), মুজফ্ফর আহ্মদ পাঠাগার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (আই. বি.) ও স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এস. বি.)—সংরক্ষিত সরকারী নথিপত্র, পুলিস রিপোর্ট, দলিল, পত্র-পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতি দেখার ও সংগৃহীত তথ্যাবলী ব্যবহারের প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়ার জন্য এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত সহযোগিতা করার জন্য এই সব কটি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আমার শিক্ষক ও গবেষণার অবেক্ষক। তাঁর সাহায্যের হাত সকলের জন্যই সর্বদাই প্রসারিত। ছাত্রজীবন থেকে আজ অবধি কারণে-অকারণে তাঁর সাহায্য পেয়ে এসেছি। ফলে দাবিটাও তাঁর প্রতি বেশীই থাকে। সমুদয় ব্যস্ততার মধ্যেও সময় করে তিনি এই সংকলনের মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন। কোনও স্বীকৃতির মাধ্যমেই তাঁর কাছে আমার ঋণভার লাঘব হওয়ার নয়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশের জন্য যথেষ্ট ভাষাজ্ঞানও আমার নেই।

আমার গবেষণার সূত্রপাতের সময় থেকেই অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতা-উৎসাহ-অনুপ্রেরণা আমি পেয়ে আসছি। তাঁর দীর্ঘ দিনের সাক্ষাৎকার অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টিতে আমায় যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এই সংকলনভুক্ত কয়েকটি রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রত্যক্ষ উৎসাহ কাজ করেছে।

অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সাহায্যের হাতও আমার জন্য সর্বদাই প্রসারিত থেকেছে। সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক তথ্য সংকলনের কাজে তাঁর যথেষ্ট সাহায্য আমি পেয়েছি। সাক্ষাৎকারসূত্রে সংগৃহীত কমিউনিস্ট আন্দোলন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য তিনি নির্দ্বিধায় আমার হাতে তুলে দিয়েছেন গবেষণার ও লেখার কাজে। এই সংকলন-ভুক্ত বিভিন্ন সংগঠন সম্পর্কে আমার চিন্তাভাবনা নির্দিষ্ট রূপ পাওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁর মতামত বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনার সময় থেকে আজ অবধি যাঁরা বিভিন্ন সময়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও আছেন, তাঁদের অনেকেরই দীর্ঘ সাক্ষাৎকার আমি নিয়েছি। অন্যান্যভাবেও তাঁরা আমায় সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই আজ অবস্থান বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিতে, কেউ কেউ আজ আর বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির কোনওটির সঙ্গেই আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত নন। যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি বা অন্যান্যভাবে যাঁদের অবারিত সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের সকলের নাম আলাদা করে উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। অবশ্য যাঁদের সর্বাধিক সাহায্য আমি পেয়েছি ও পেয়ে আসছি, তাঁদের নাম উল্লেখ না করলে আমি বিবেকের কাছে অপরাধী থেকে যাব। রণেন সেন, প্রয়াত সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, প্রয়াত চিন্মোহন সেহানবীশ, অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, নন্দলাল বসু, কমল সরকার, নির্মল সেনগুপ্ত, প্রয়াত সুরেশ দাশগুপ্ত, সুধী প্রধান, অরুণ বসু, সমর মুখোপাধ্যায়, জয়কেশ মুখোপাধ্যায়, বিনয় চৌধুরী, মনোরঞ্জন হাজরা, বিজয় মোদক, গৌরীচরণ ভট্টাচার্য, গোবিন্ কাঁড়ার, ধনঞ্জয় দাশ, প্রয়াত সুবোধ দাশগুপ্ত, গোপাল আচার্য, অসিত সেন, সুনীতিকুমার ঘোষ, নির্মাল্য বাগচী, প্রয়াত ধরণী গোস্বামী, সুধাংশুকুমার অধিকারী প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রগণ্য।

বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে ব্রজ ঘোষ ও অধ্যাপিকা পূরবী রায়ের নাম। তাঁদের মাধ্যমেই অনেকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, যাঁদের সাক্ষাৎকার আমি নিয়েছি। বয়সের ভার অগ্রাহ্য করে যুবকের উৎসাহ নিয়ে ব্রজ ঘোষ যেভাবে আমার সঙ্গে হুগলী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বিভিন্ন জনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন, তা আমি কোনও দিন ভুলব না।

অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অমল কুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক অসিত কুমার সেন এবং অধ্যাপক অশোক মুস্তাফি—আমার শিক্ষক ও শিক্ষকসম এই অধ্যাপকদের সহযোগিতা-উৎসাহ-অনুপ্রেরণা আমার সারা জীবনের পাথেয়। এঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতার নয়, আন্তরিক শ্রদ্ধার।

সম্পাদিত বই এবং পত্রিকায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধগুলি পরিমার্জিত রূপে বর্তমান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দেওয়ার জন্য অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ, অধ্যাপক অমিতাভ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ, অধ্যাপিকা দীপিকা বসু, অধ্যাপক দীপঙ্কর চক্রবর্তী, অধ্যাপক রতন খাসনবিশ এবং অধ্যাপক কুন্তল মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বারোমাস পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক অশোক সেনের কাছেও আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। বারোমাস পত্রিকায় প্রকাশিত আমার সম্পাদিত এবং ভূমিকা-টীকা-সংযোজনী সংবলিত অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের গোড়ার যুগের এক শ্রমিক কমিউনিস্টের স্মৃতিচারণ এবং পরবর্তী

যুগের কমিউনিস্ট আত্মসমালোচনার এক দলিল আমার যে-কোনও সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করার অবাধ অনুমতি তিনি আমায় দিয়ে রেখেছেন। বর্তমান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব না হলেও এই দুটিকে আমার পৃথক এক সংকলনের মধ্যে অবশ্যই স্থান দেওয়ার ইচ্ছা রইল।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি (সংবাদপত্র বিভাগ) এবং মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ পাঠাগারে সংরক্ষিত সংবাদপত্র এবং পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজে আমার ছাত্র সঞ্জয়কুমার মুখোপাধ্যায় আমায় বিশেষ সাহায্য করেছেন। সংবাদপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বন্ধু প্রবীরকুমার লাহার সাহায্যও আমি পেয়েছি। এই দুজনের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ কল্যাণ চন্দ্র দত্ত ও অন্যান্য সহকর্মীদের সাহায্য-উৎসাহ আমার কাজে অফুরন্ত পেয়েছি।

আমার বাবা-মা-দিদিমা-ঠাকুমা—সকলেরই সহযোগিতা-উৎসাহ আমাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। প্রয়াত দাদু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত আমার প্রথম শিক্ষাগুরু, আমার অনুসন্ধিৎসু মনটির স্রষ্টাও তিনি। আমার কাজে গৃহকর্ত্রী দীপ্তির সহযোগিতা-সহমর্মিতা সবসময়ে পেয়েছি। শিশুকন্যা অরুণিতার চঞ্চল উপস্থিতি আমার কাজের প্রেরণা-উৎসাহ।

'পুস্তক বিপণি'র অনুপকুমার মাহিন্দার এই সংকলন প্রকাশে আগ্রহী হয়ে আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। সযত্নে প্রুফ দেখেছেন শ্রীঅরুণচাঁদ দত্ত। প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী অমিয় ভট্টাচার্য। এঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই সংকলন প্রকাশ প্রসঙ্গেই অগ্রজপ্রতিম সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আন্তরিক প্রীতির সঙ্গে উল্লেখ করছি। এই সংকলনের মুদ্রাকর দি শিবদুর্গা প্রিন্টার্সের কর্ণধার নারায়ণচন্দ্র ঘোষ ও কর্মীদেরও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বইতে সংকলিত তথ্যগত এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়-দায়িত্ব একান্তভাবেই আমার। এই ত্রুটি-বিচ্যুতির আর কোনও অংশীদার নেই। যদি কোনও সহৃদয় পাঠক এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে দেন, তাহলে লেখক হিসাবে আমি ব্যক্তিগতভাবে বাধিত থাকব।

এই সংকলন অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা পর্বের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, এরকম কোনও দাবি আমার নেই। অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা পর্বের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার উপাদান যদি এই সংকলন থেকে পাওয়া যায়, তাহলেই আমার প্রয়াস সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

অমিতাভ চন্দ্র

প্রথম অধ্যায় ঃ কমিউনিস্ট পার্টি

বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম পর্যায় : ১৯২৮–১৯৩৫

বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ১৯২৮ থেকে ১৯৩৫-এই সময়সীমাকে নির্দিষ্ট করার একটি বিশেষ কারণ আছে। যে-কোনো দেশেরই কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট আন্দোলন দুটি পৃথক পরিমণ্ডলের অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত। একদিকে কোনো দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্দোলন যেমন সেই দেশের জাতীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের অন্যতম অংশ, আবার অপরদিকে তেমনই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনেরও অন্যতম অংশ। সুতরাং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন-সংক্রান্ত ঘটনাপ্রবাহকে বাদ দিয়ে কোনো দেশেরই কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সম্যকরূপে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ১৯২৮ ও ১৯৩৫—এই দুটি বছরই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই দুই বছরের মধ্যবর্তী সময়সীমাও একই কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৮ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো। ষষ্ঠ কংগ্রেসে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ঔপনিবেশিক প্রশ্নে এক 'বামপন্থী' অবস্থান গ্রহণ করল। তার প্রতিফলন পড়ল ভারত-সহ সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে এই 'বামপন্থী' অবস্থান ক্রমশ সংশোধিত হতে হতে ১৯৩৫ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হলো। সপ্তম কংগ্রেসে গৃহীত হলো ডিমিট্রভের ***'United Front'*** ('যুক্তফ্রন্ট') তত্ত্ব। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের লাইন পরিবর্তিত হওয়ার ফলে ভারত-সহ বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিরও লাইন বদলালো। ফলে ১৯৩৫ সাল থেকে বাংলার তথা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনে শুরু হলো এক নতুন যুগের। এই কারণেই আমি ১৯২৮ থেকে ১৯৩৫—এই নির্দিষ্ট সময়সীমার অন্তর্বর্তী কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম পর্যায় হিসাবে আমার নিবন্ধে অভিহিত করেছি।

পূর্বকথা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রকৃত তারিখ হিসাবে কোন্‌টিকে ধরা হবে, সেই নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয় বিদেশের মাটিতে—তাশকন্দে, ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর এবং স্বদেশের মাটিতে—কানপুরে, ১৯২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর। বাংলাদেশে বিশের দশকেই ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্ট মতাবলম্বন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ গ্রহণ, কমিউনিস্ট কার্যকলাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার সূত্রপাত হওয়া সত্ত্বেও সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ও স্থায়ীভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার প্রতিষ্ঠা হলো ১৯৩১ সালের গোড়ার দিকে। বিশের দশকে বাংলাদেশে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে ছিলেন মাত্র চারজন—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, আব্দুল হালিম, আব্দুর রেজ্জাক খাঁ ও শামসুল হুদা। গ্রেট

ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির (সি. পি. জি. বি.-র) সদস্য ফিলিপ স্প্রাটের (তখন কলকাতায়) সহায়তায় উপর্যুক্ত চারজন কমিউনিস্ট সেই সময়ে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। অবশ্য এই পাঁচজন ছাড়াও বিশের দশকের শেষভাগে বাংলায় আরো কয়েকজন কমিউনিস্ট-মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু তাঁরা তখনো কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হননি—যেমন, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বঙ্কিম মুখার্জী, মণি সিংহ, কালী সেন, আব্দুল মোমিন, ধরণী গোস্বামী, গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গোপাল বসাক, রাধারমণ মিত্র, নীরোদ চক্রবর্তী, পিয়ারীমোহন দাস, নলীন্দ্রমোহন সেন, আশু রায় প্রমুখ। এঁদের মধ্যে ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ব্যতীত প্রায় সকলেই পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টি'র সভ্য হন। বাংলাদেশে তখন কমিউনিস্ট পার্টি'র পরিবর্তে ছিল শুধু একটি নিউক্লিয়াস (nucleus) ।'[১] কমিউনিস্ট পার্টি'-সদস্য ও কমিউনিস্ট মতাবলম্বীরা সকলেই তখন অ-কমিউনিস্টদের সঙ্গে ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্ট্স্ পার্টি' অব বেঙ্গল-এর (বঙ্গীয় শ্রমিক ও কৃষক দল-এর) মধ্যে থেকেই কাজ করতেন।

ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্ট্স্ পার্টি' অব বেঙ্গল

১৯২৫ সালের ১ নভেম্বর সারা ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্ট্স্ পার্টি' গঠিত হয়। কুতুবুদ্দিন আহমদ, হেমন্তকুমার সরকার, কাজী নজরুল ইসলাম এবং শামসুদ্দিন হুসেন ছিলেন প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। "কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা"য় দণ্ডিত কমিউনিস্ট মুজফ্ফর আহ্মদ ১৯২৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ছাড়া পান এবং কলকাতায় ফেরার পর ১৯২৬ সালের ২ জানুআরি এই দলে যোগ দেন। প্রতিষ্ঠার সময় এই পার্টি'র নাম ছিল লেবার-পেজ্যাণ্ট্-স্বরাজ পার্টি অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। পার্টি'র বাংলায় নাম ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়। ১৯২৬ সালের ৬-৭ ফেব্রুআরি তারিখে হেমন্তকুমার সরকারের আহ্বানে নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। লেবার-পেজ্যাণ্ট্-স্বরাজ পার্টি'র সদস্যবৃন্দও উক্ত অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। ঐ অধিবেশনে পেজ্যাণ্ট্স্ অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স্ পার্টি' অব বেঙ্গল-কে (বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল) সংগঠিত করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তখন থেকেই লেবার-পেজ্যাণ্ট-স্বরাজ পার্টি'র নাম পরিবর্তিত হয়ে পেজ্যাণ্ট্স্ অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স্ পার্টি' অব বেঙ্গল নাম হয়। বাংলায় নাম হয় বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল। ১৯২৮ সালের ৩১ মার্চ ও ১ এপ্রিল এই দুদিন দলের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ভাটাপাড়ায়। ঐ অধিবেশনে দলের নাম পুনর্বার পরিবর্তিত হয়ে শেষপর্যন্ত হলো ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্ট্স্ পার্টি' অব বেঙ্গল। বাংলা নাম হলো বঙ্গীয় শ্রমিক ও কৃষক দল। বাংলার পর বোম্বাই, পাঞ্জাব প্রভৃতি জায়গাতেও এই পার্টি' গড়ে ওঠে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের ঠিক আগে ১৯২৮ সালের ২১-২৪ ডিসেম্বর প্রাদেশিক দলগুলিকে একত্র করার উদ্দেশ্যে সর্দার সোহন সিং জোশের সভাপতিত্বে

কলকাতার অ্যালবার্ট হলে বিভিন্ন প্রদেশের ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্ট্স্ পার্টিগুলির সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তখন বাংলাদেশে এই পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মুজফ্ফর আহ্মদ। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো যে, ১৯২৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্ট্স্ পার্টি অব বেঙ্গল-এর নেতৃত্বে প্রায় ত্রিশ হাজার শ্রমিকের এক বিশাল মিছিল কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে গিয়ে 'পূর্ণ ও আপসহীন স্বাধীনতার' দাবি পেশ করেন এবং উক্ত অধিবেশনে শ্রমিকরা 'পূর্ণ ও আপসহীন স্বাধীনতার' দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই সমস্তই ছিল শ্রমিকদের সংগঠিত শক্তির প্রকাশ ও রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচায়ক।[২] এই ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্ট্স্ পার্টি পরবর্তীকালে বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার পথ অনেকটাই প্রশস্ত ও সুগম করে দিয়েছিল।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেস : ১৯২৮

১৯২৮ সালের ১৭ জুলাই থেকে ১ সেপ্টেম্বর অবধি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় মস্কোতে।[৩] কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের এই ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত হলো সুবিখ্যাত "*Theses on the Revolutionary Movement in the Colonies and Semi-Colonies*",[৪] যা সংক্ষেপে "*Colonial Thesis*" নামেই সুপরিচিত। এই "*Colonial Thesis*"-এর এক "বামপন্থী" ঝোঁক ছিল সুস্পষ্ট। খুব সঠিকভাবেই "*Colonial Thesis*"-এ ভারতের কমিউনিস্টদের কাছে আহ্বান জানানো হলো দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে শামিল হওয়ার —"The basic tasks of the Indian Communists consist in struggle against British imperialism for the emancipation of the country."[৫] কিন্তু এই সঙ্গেই "*Colonial Thesis*"-এ বলা হলো, ভারতে কমিউনিস্টদের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে কংগ্রেসের মুখোশ খুলে দেওয়া—"The Communists must unmask the national reformism of the Indian National Congress."[৬] '*Thesis*'-এ আরো বলা হলো ভারতে কমিউনিস্টদের কোনো পেটি বুর্জোয়া গ্রুপ ও পার্টির সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক রাখা উচিত নয়— "It is absolutely essential that the Communist Parties in these countries should from the very beginning *demarcate themselves in the most clearcut fashion*, both politically and Organisationally, from all the petty-bourgeois groups and parties."[৭] "*Thesis*"-এ ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্ট্স্ পার্টিগুলিও তীব্র সমালোচিত হলো এবং বলা হলো, কমিউনিস্টদের এই ধরনের পার্টি সংগঠিত করার চেষ্টা করা উচিত নয়—"Special Workers' and Peasants' Parties, whatever revolutionary character they may possess, can too easily at particular periods be converted into ordinary petty-bourgeois parties, and, accordingly,

the Communists are not recommended to organise such parties."[৮] শ্রমিক ও কৃষক দুই শ্রেণীর পার্টি সংগঠিত করার প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে কমিউনিস্টদের শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চাপানো উচিত—"The union of all Communist groups and individual Communists scattered throughout the country into a single, independent and Centralised Party represents the first task of Indian Communists"[৯] এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ১৯২৮ সালে কমিণ্টার্ন শ্রমিক ও কৃষক দুই শ্রেণীর পার্টি হিসাবে ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্ট্স্ পার্টি'র (ডব্লিউ. পি. পি.) অস্তিত্বের বিরোধিতা করলেও মানবেন্দ্রনাথ রায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ক্লেমেন্স পাম দত্ত, রজনী পাম দত্ত, আর. পেজ আর্ন'ট প্রমুখ সি. পি. জি. বি.-র নেতারা কিন্তু গণ-আন্দোলন প্রসারের ক্ষেত্রে ডব্লিউ. পি. পি.-র ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং কমিউনিস্টদের এই ধরনের সংগঠনের মধ্যে কাজ করাও সমর্থন করেন।[১০]

ভারতে কমিউনিস্টদের উপর ষষ্ঠ কংগ্রেসের "ঔপনিবেশিক তত্ত্বে"র প্রতি-ক্রিয়া এবং ভারতে কমিউনিস্টদের ক্রমশ "অতি-বামপন্থী" অবস্থান গ্রহণ

১৯২৮ সালের ২১-২৪ ডিসেম্বর কমিউনিস্টরা যখন কলকাতায় ডব্লিউ. পি. পি.-র সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠান করেন, তখনো তাঁরা ষষ্ঠ কংগ্রেসের সদ্য গৃহীত 'বামপন্থা' অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হননি। ফলে তাঁরা উৎসাহের সঙ্গেই ডব্লিউ. পি. পি.-র সর্বভারতীয় সম্মেলন করে দলগুলিকে বিলুপ্ত করার পরিবর্তে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে "The All-India Workers' and Peasants' Party" গড়ে তোলার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। কংগ্রেসের নেতৃত্ব বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে থাকলেও কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই বর্তমানে কাজ করে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের মুখোশ খুলে দিয়ে বিপ্লবী জনসাধারণকে কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে ডব্লিউ. পি. পি.-র দিকে টেনে আনার সিদ্ধান্তও গৃহীত হলো। এই সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবগুলি সি. পি. জি. বি., মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমর্থন পেল।[১১] অবশ্য কমিউনিস্টরা ডব্লিউ. পি. পি. ছাড়াও স্বাধীনভাবে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টিকে সংগঠিত করার চেষ্টাও চালাচ্ছিলেন। ডব্লিউ. পি. পি.-র সর্বভারতীয় সম্মেলন চলাকালীনই ১৯২৮ সালের ২২ ডিসেম্বর তারিখে মুজফ্ফর আহ্মদ, আব্দুল হালিম প্রমুখ কমিউনিস্ট পার্টি'র সভ্যরা কমিউনিস্ট পার্টি'কে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে অ্যালবার্ট হলেরই কমিটি রুমে আলাদা করে কমিউনিস্ট পার্টি'র একটি সভা করেন।[১২] ১৯২৮ সালেরই ২৬-২৯ ডিসেম্বর কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টি'র জরুরি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে ডব্লিউ. পি. পি.-র সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্ট পার্টি'কে শক্তিশালীরূপে সংগঠিত করার কথা বলা হয় এবং শ্রমিকশ্রেণীকে কমিউনিস্ট পার্টি'তে যোগদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়।[১৩]

কিন্তু কমিণ্টার্ন-এর ষষ্ঠ কংগ্রেসের "ঔপনিবেশিক তত্ত্ব" ভারতের কমিউনিস্টদের হাতে এসে পেঁৗছনোর পরই তাঁদের অবস্থান দ্রুত পাল্টাতে লাগল। ভারতের অত্যুৎসাহী কমিউনিস্টরা এই "ঔপনিবেশিক তত্ত্বে"র এক সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যাখ্যা করে এই 'তত্ত্বে'র 'বামপন্থী' ঝোঁককে আরও বেশি 'বাম' দিকে নিয়ে গেলেন। ১৯৩০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সি. পি. আই.) "*Draft Platform of Action of the Communist Party of India*"[১৪] নামে এক 'তত্ত্ব' গ্রহণ করল। এই 'তত্ত্ব' ছিল বিশেষভাবেই "বাম-সংকীর্ণতা" দোষে দুষ্ট। অত্যন্ত সঠিকভাবেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর তীব্র আঘাত হেনে "*Draft Platform*"-এ বলা হয় যে, ভারতে বিপ্লবের বর্তমান স্তরে সশস্ত্র উপায়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনই কমিউনিস্টদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য—"The complete independence of India by the violent overthrow of British rule."[১৫] কিন্তু একই সঙ্গে "*Draft Platform*" কংগ্রেসের সংস্কারবাদী গান্ধীবাদী নেতৃত্বকে এবং বিশেষ করে কংগ্রেসের 'বামপন্থী' অংশকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে। কংগ্রেসের 'বামপন্থী' অংশের উপর তীব্র আক্রমণ চালিয়ে "*Draft Platform*"-এ লেখা হয়—"The most harmful and dangerous obstacle to the victory of the Indian revolution is the agitation carried on by the 'Left' elements of the National Congress, led by Jawahar Lal Nehru, Bose, Ginwalla and others. Under the cloak of revolutionary phraseology, they carry on the *bourgeois* policy of confusing and disorganising the revolutionary struggle of the masses, and help the Congress to come to an understanding with British imperialism"[১৬]

তৎকালীন সি. পি. আই.-এর এই ক্ষতিকর "বাম-সংকীর্ণতাবাদী" অবস্থান গ্রহণের ফলে ভারতে জাতীয় বৈপ্লবিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক বিশেষ বিরূপ প্রতিফলন পড়ে। জাতীয় আন্দোলনের মূলস্রোত থেকে সি. পি. আই. বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ থেকে গান্ধীর ডাণ্ডি অভিযান শুরুর মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ আইন-অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কয়েকজন কমিউনিস্ট দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তিগতভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করলেও কমিউনিস্ট পার্টি সাধারণভাবে তার 'বাম-সংকীর্ণতাবাদী' অবস্থানের কারণে এই আন্দোলন থেকে সরে থেকেছিল এবং এমনকি সমগ্র আন্দোলনটিকেই "বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী" আন্দোলন বলে অভিহিত করে তার বিরোধিতাও করেছিল।[১৭] এই প্রসঙ্গে Overstreet and Windmiller-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা যেতে পারে—"The Indian Communists turned their backs on the fertile field of Indian nationalism and isolated themselves from the wellspring of Indian political life."[১৮] সমগ্র আইন-অমান্য আন্দোলনটিকেই "বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী" আখ্যা দিয়ে তার থেকে দূরে সরে থাকার এবং এমন-কি বিরোধিতা করার নেতিবাচক ও

ভ্রান্ত নীতি অবলম্বনের ফলে ক্ষতি হলো জাতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের, ক্ষতি হলো কমিউনিস্ট পার্টির, লাভ হলো কংগ্রেসের বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী নেতৃত্বের। কমিউনিস্ট পার্টি এই গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব-প্রদানের সঠিক ঐতিহাসিক কর্তব্যপালনে ব্যর্থ হওয়ার ফলে আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে গেল কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতাদের হাতে এবং তাঁরাও তাঁদের প্রয়োজনমতো এই আন্দোলনের রাশ টেনে ধরতে সমর্থ হলেন।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই প্রেক্ষাপটে বাংলার তৎকালীন কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ও বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি-গঠন-প্রচেষ্টাকে বোঝা দরকার।

ইয়ং কমরেডস্ লীগ—বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ও কমিউনিস্ট পার্টি-গঠনের সংগঠিত সূচনা

১৯২৮ সালের শেষভাগে (মতান্তরে ১৯২৮ সালের গোড়ার দিকে—১ ফেব্রুআরির আগে) ধরণী গোস্বামীর এবং ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজ্যান্ট্স্ পার্টির (ডব্লিউ. পি. পি.) অন্যান্য কয়েকজন তরুণ সদস্যের প্রচেষ্টায় কলকাতায় ইয়ং কমরেডস্ লীগ নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। ধরণী গোস্বামী ইয়ং কমরেডস্ লীগের (ওয়াই. সি. এল.) প্রথম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ফিলিপ স্প্রাট হন এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি। বাংলার ডব্লিউ. পি. পি.-র যুব শাখা হিসাবে একটি গণ-সংগঠনের চরিত্র নিয়ে ইয়ং কমরেডস্ লীগ গঠিত হয়। ওয়াই. সি. এল.-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং বিশেষ করে শ্রমিক পরিবারের যুবক ও তরুণ শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রচার ও প্রসার। বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগে ইয়ং কমরেডস্ লীগের ভূমিকা চারটি বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, ইয়ং কমরেডস্ লীগ বাংলাদেশে কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সংগঠিত করে বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার ব্যাপারে এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয়ত, ইয়ং কমরেডস্ লীগই ছিল বাংলার প্রথম সেতুসদৃশ কমিউনিস্ট সংগঠন, যার মাধ্যমে জাতীয় বিপ্লবীদের প্রথম অংশটি জাতীয় বিপ্লবী 'সন্ত্রাসবাদ'-এর পথ পরিত্যাগ করে কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেন এবং গণ-বিপ্লবের পথ অবলম্বন করেন। তৃতীয়ত, বাংলায় যুব রাজনীতির সংগঠিত সূত্রপাতের ক্ষেত্রেও ওয়াই. সি. এল. পথিকৃৎ-এর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। চতুর্থত, ১৯৩০ সালের জুলাই মাসের ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জের জঙ্গী ও বীরত্বপূর্ণ, কিন্তু বিস্মৃতপ্রায়, কৃষক বিদ্রোহে ওয়াই. সি. এল.-এর সদস্যরাই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[১৯]

বাংলায় শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট : ১৯২৮-১৯৩০

১৯২৮ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে কলকাতায় এবং পার্শ্ববর্তী হাওড়া জেলার বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে, শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের এক প্রবাহ বয়ে যায়। আমি এই শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটগুলির বিস্তারিত বিবরণের

মধ্যে যাচ্ছি না ; তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের এক সম্যক্ চিত্র পাঠকদের সামনে তুলে ধরার জন্য আমি এগুলির কেবলমাত্র উল্লেখ করছি। ১৯২৭ সালের ফেব্রুআরি মাসের খড়্গপুরের বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের শ্রমিক ধর্মঘট দিয়ে এই প্রবাহের সূত্রপাত। তারপর হলো ১৯২৮ সালের ৮ মার্চ থেকে ৯ জুলাই অবধি লিলুয়ার ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কারখানার শ্রমিক ধর্মঘট। ১৯২৮ সালের ৪ থেকে ৯ মার্চ এবং ২৪ জুন থেকে ৫ জুলাই কলকাতায় ঝাড়ুদার ও মেথর ধর্মঘট হয়। ১৯২৮ সালের ৮ থেকে ১৬ এপ্রিল হাওড়ায় ঝাড়ুদার ও মেথর ধর্মঘট হয়। ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে হাওড়ার বার্নস কোম্পানিতে এবং জেসপে শ্রমিক ধর্মঘট চলে। তবে সব-কিছুকে ছাপিয়ে যায় এই সময়কার একের পর এক চটকল ধর্মঘট। ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে এবং তারপর ২৩ এপ্রিল থেকে ১০ মে হাওড়া জেলার চেঙ্গাইলের লাডলো জুট মিলে শ্রমিক ধর্মঘট হয়। ১৯২৮ সালের ১৬ জুলাই থেকে ১৯২৯ সালের ১৬ জানুআরি পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছয় মাস ধরে হাওড়া জেলার বাউড়িয়ার ফোর্ট গ্লস্টার জুট মিলে শ্রমিক ধর্মঘট হয়। একই সময়ে বাউড়িয়ার ফোর্ট গ্লস্টার জুট মিলের শ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থনে হাওড়া জেলার রাজগঞ্জের ন্যাশনাল, সাঁকরাইলের বেলভেডিয়ার এবং মানিকপুরের ডেল্টা জুট মিলে শ্রমিক ধর্মঘট হয়। ১৯২৮ সালেই লাডলো জুট মিলের শ্রমিকরা তৃতীয়বার ধর্মঘট করেন। ১৯২৮ সালের মে মাসে কলকাতার চিৎপুরে ও কাশীপুরে জুট প্রেস ধর্মঘট হয়। ১৯২৯ সালের জানুআরি মাসে কলকাতার ক্লাইভ জুট মিলে ধর্মঘট হয়। ২১ জানুআরি এই ধর্মঘটের পরিসমাপ্তি ঘটে। ঐ সময়েই কলকাতার লরেন্স, হেস্টিংস্ প্রভৃতি জুট মিলেও ধর্মঘট হয়। একই সময়ে ইউনিয়ন সাউথ জুট মিলের শ্রমিকরাও ধর্মঘটে শামিল হন। ১৮ ফেব্রুআরি ১৯২৯ এই ধর্মঘটের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯২৯ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হয় সারা বাংলা চটকল শ্রমিকদের প্রথম সাধারণ ধর্মঘট। এই ধর্মঘট চলে ১৯২৯ সালের ১৮ আগস্ট পর্যন্ত—মোট প্রায় দেড় মাস। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম চার দিন (১-৪ এপ্রিল) কলকাতায় গাড়োয়ান ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘটের প্রভাব পড়ে শিবপুর, সালকিয়া প্রভৃতি হাওড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলেও। ১৯২৮ থেকে ১৯৩০ সাল অবধি এই সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনে ও ধর্মঘটে কমিউনিস্টরা ও কমিউনিস্ট-মতাবলম্বীরা ডব্লিউ. পি. পি.-র সদস্য হিসাবে এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং অনেকক্ষেত্রে নেতৃত্বও প্রদান করেছিলেন।[২০]

"মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা : ১৯২৯" ও নির্বিচারে গ্রেফ্তার

যদিও বাংলাদেশে ১৯২৮-২৯ সালে কমিউনিস্টদের শক্তি ও প্রভাব ছিল সীমিত, তবুও কমিউনিস্ট শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শিশু কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সংগঠনের উপর আঘাত হানল। ১৯২৯ সালের ২০ মার্চ ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট ও অ-কমিউনিস্ট নির্বিশেষে সারা ভারত জুড়ে মোট ৩২ জনকে (প্রথমে ৩১ জনকে এবং পরে

আরও ১ জনকে) গ্রেফ্‌তার করে তাঁদের বিরুদ্ধে "মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা" শুরু করে। দীর্ঘ তিন বছর দশ মাস যাবৎ এই মামলা চলেছিল। বাংলাদেশ থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্য মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও শামসুল হুদা, সি. পি. জি. বি.-র সদস্য ফিলিপ স্প্রাট, "বিশ্বাসের দিক দিয়ে কমিউনিস্ট" ("Communist by Conviction") ধরণী গোস্বামী, গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গোপাল বসাক ও রাধারমণ মিত্র, অ-কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতা শিবনাথ ব্যানার্জী ও কিশোরীলাল ঘোষ প্রমুখ গ্রেফ্‌তার হন। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতার গাড়োয়ান ধর্মঘটে নেতৃত্ব দানের অভিযোগে বঙ্কিম মুখার্জী, আব্দুল হালিম, আব্দুল মোমিন প্রমুখকে পুলিস গ্রেফ্‌তার করে। ১৯৩০ সালেই ব্রিটিশ সরকার Bengal Criminal Law Amendment Act পাস করে সারা বাংলায় নির্বিচারে গ্রেফ্‌তার শুরু করে। তাতে জাতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে আব্দুর রেজ্জাক খাঁ, কালী সেন, জামালুদ্দিন বুখারী প্রমুখ ডব্লিউ. পি. পি.-র এবং ওয়াই. সি. এল.-এর নেতৃস্থানীয় সভ্যরাও গ্রেফ্‌তার হন।

"কলকাতা কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি" গঠন

এই চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন প্রচেষ্টা চলতে থাকল। মূলত দুই দিক থেকে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হলো। একদিকে উদ্যোগ গ্রহণ করলেন ওয়াই. সি. এল.-এর নেতৃবৃন্দ। সুধাংশুকুমার অধিকারী ও ইয়ং কমরেডস্‌ লীগের অন্যান্য নেতাদের প্রচেষ্টায় ১৯৩০ সালেই কলকাতায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র একটি অস্থায়ী কমিটি বা নিউক্লিয়াস্‌ (nucleus) সংগঠিত করা হয়। এই কমিটির নামকরণ করা হয় "অস্থায়ী কলকাতা কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অংশ"। এই "অস্থায়ী কলকাতা কমিটি"র প্রাথমিক সদস্য ছিলেন পাঁচজন—সুধাংশুকুমার অধিকারী, অবনী চৌধুরী, এ. এম. এ. জামান, জগজ্জিত সরকার এবং নদীয়া জেলার একজন কৃষক (তাঁর নাম জানা যায়নি)। বোম্বাইতে সংগঠিত কমিউনিস্ট পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এস. ভি. দেশপাণ্ডের সুপারিশক্রমে সদাশিবম্‌ (ছদ্মনাম) নামে একজন কমরেডও এই "অস্থায়ী কলকাতা কমিটি"র কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩১ সালের জানুআরি মাসে আব্দুল হালিম জেল থেকে ছাড়া পেলে সুধাংশু অধিকারীরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে এই "অস্থায়ী কলকাতা কমিটি" পুনর্গঠনের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে স্থির করেন। কিন্তু এই আলোচনা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই সুধাংশু অধিকারী গ্রেফ্‌তার হন। "অস্থায়ী কলকাতা কমিটি"র সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়।[২১]

অপরদিকে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন কয়েকজন সদ্য কমিউনিস্ট মতাদর্শ-গ্রহণকারী তরুণ। ১৯৩০ সাল থেকেই রণেন সেন, অবনী চৌধুরী (অবনী চৌধুরী পার্টি'গঠনের অপর উদ্যোগটির সঙ্গেও জড়িত ছিলেন এবং সুধাংশু অধিকারীর "অস্থায়ী কলকাতা কমিটি"র অন্যতম সদস্যও ছিলেন), রমেন বসু·

ও অখিল ব্যানার্জী—এই চারজন তরুণ কমিউনিস্ট নতুন করে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি-গঠনের প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু করলেন। ১৯৩১ সালের জানুআরি মাসে আব্দুল হালিম জেল থেকে ছাড়া পেলে পার্টি গঠন প্রচেষ্টা আরো জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯৩১ সালের গোড়ার দিকেই আব্দুল হালিমকে সাধারণ সম্পাদক করে পাকাপাকিভাবে "কলকাতা কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অংশ"—এই নাম দিয়ে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে তখনও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে "কলকাতা কমিটি"র কোনো যোগাযোগই স্থাপিত হয়নি। প্রাথমিকভাবে এই "কলকাতা কমিটি"র সদস্য ছিলেন পাঁচ জন—আব্দুল হালিম (সাধারণ সম্পাদক), রণেন সেন, অবনী চৌধুরী, রমেন বসু ও অখিল ব্যানার্জী। যদিও নাম দেওয়া হয়েছিল "কলকাতা কমিটি", কিন্তু এই কমিটিকেই প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি হিসাবে গণ্য করা হয়, কারণ ক্রমশ পার্টির সভ্যসংখ্যা বর্ধিত হতে থাকায় ১৯৩৪ সালের জানুআরি মাসে "কলকাতা কমিটি"-ই কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, অর্থাৎ "কলকাতা কমিটি" নামের পরিবর্তে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি নামকরণ করা হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির তত্ত্বাবধানে ক্রমে ক্রমে কলকাতা জেলা কমিটি-সহ বিভিন্ন জেলা কমিটি গঠিত হতে থাকে। ১৯৩৫ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির তত্ত্বাবধানে কলকাতা ও হাওড়া উভয় জেলার পার্টি সভ্যদের নিয়ে কালী মুখার্জীকে সাধারণ সম্পাদক করে পৃথক জেলা কমিটি হিসাবে কলকাতা জেলা কমিটি গঠন করা হয়। তারপর ১৯৩৫-৩৬ সালে কলকাতায় ও হাওড়ায় পার্টি সদস্য বাড়তে থাকায় ১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি কলকাতা জেলা কমিটি ভেঙে কলকাতা ও হাওড়ার জন্য দুটি আলাদা জেলা কমিটি গঠন করা হয়। কালী মুখার্জীই কলকাতা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক থাকেন। ১৯৩১ সালের গোড়ার দিকে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টির "কলকাতা কমিটি"র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিমই হলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্টির প্রথম সাধারণ সম্পাদক। ১৯৩৩ সালে হালিমের জায়গায় শ্রমিক কমিউনিস্ট মন্মথ (মণি) চ্যাটার্জী "কলকাতা কমিটি"র সাধারণ সম্পাদক হন এবং সেই হিসাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্টির দ্বিতীয় সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৩৬ সালে মন্মথ চ্যাটার্জীর জায়গায় গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্টির তৃতীয় সাধারণ সম্পাদক হন।[২২]

কমিউনিস্ট পার্টির "কলকাতা কমিটি" ছাড়াও তৎকালীন বাংলাদেশের আরও কয়েকটি বামপন্থী দল বা গোষ্ঠী

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই প্রথম যুগে (১৯২৮-১৯৩৫) কমিউনিস্ট পার্টির "কলকাতা কমিটি" নামক মূল কমিউনিস্ট দলটি ছাড়াও আরো বেশ-কিছু ছোট-বড়ো বামপন্থী দল বা গোষ্ঠী ছিল। এই বামপন্থী দল বা গোষ্ঠীগুলির মূল কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল, যদিও বাংলাদেশের কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে

এদের মধ্যে কয়েকটি দল বা গোষ্ঠী কমিউনিস্ট পার্টির মূল অংশটির থেকেও বেশি শক্তিশালী ছিল। এই সময়কার কমিউনিস্ট আন্দোলনের এটাই অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য যে, এই বামপন্থী দল বা গোষ্ঠীগুলির প্রত্যেকটিই নিজেকে প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি বলে দাবি করত এবং অন্যান্য দলগুলি যথার্থ কমিউনিস্ট নয়, এই কারণে তাদের বিরোধিতা করত। কমিউনিস্ট পার্টির "কলকাতা কমিটি"র পূর্বসূরী দুটি দল ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্ট্‌স্ পার্টি অব বেঙ্গল এবং ইয়ং কমরেডস্ লীগ-এর উল্লেখ আগেই করেছি। এই দল দুটির মধ্যে ডব্লিউ পি. পি. নিজেকে কখনোই কমিউনিস্ট দল বলত না, কিন্তু ওয়াই. সি. এল. নিজেকে কমিউনিস্ট দল বলেই ঘোষণা করত। এই দুটি দল এবং "কলকাতা কমিটি"-কে বাদ দিয়ে তৎকালীন বাংলাদেশের বামপন্থী দল বা গোষ্ঠীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—(১) নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের বেঙ্গল লেবার পার্টি, (২) ইণ্ডিয়ান প্রোলেটারিয়ান রেভলিউশনারি পার্টি (আই. পি. আর. পি.) বা 'গণনায়ক' পার্টি, (৩) সাম্যরাজ পার্টি, (৪) বেঙ্গল কীর্তি-কিষাণ পার্টি (৫) কারখানা গ্রুপ, (৬) লাল নিশান গ্রুপ, (৭) সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কমিউনিস্ট লীগ অব ইণ্ডিয়া, (৮) মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দি রেভলিউশনারি পার্টি অব দি ইণ্ডিয়ান ওয়ার্কিং ক্লাসেস্ (আর. পি. আই. ডব্লিউ. সি.), (৯) যশোর-খুলনা যুব সংঙ্ঘ এবং (১০) অভয় আশ্রয় গ্রুপ বা বেঙ্গল লেবার অ্যাসোসিয়েশন। এই দশটি দল ছাড়াও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে, যদিও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি (সি. এস. পি.) নিজেকে সোশ্যালিস্ট দল বলত, কখনোই কমিউনিস্ট দল বলত না। এগুলি বাদে আরো কিছু ছোট ছোট বামপন্থী গ্রুপ ছিল। তৎকালীন বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই দলগুলির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।[২৩] এই দলগুলির মধ্যে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পার্টি, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পার্টি এবং সি. এস. পি. শেষপর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি থেকে নিজেদের পৃথক্ অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বেঙ্গল লেবার অ্যাসোসিয়েশন বাদে অন্যান্য কমিউনিস্ট দল বা গোষ্ঠীগুলি ১৯৩৫ সাল নাগাদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ঐ দলগুলির অধিকাংশ সদস্যই কমিউনিস্ট পার্টির মূল অংশটিতে যোগ দিয়ে সেটিকেই শক্তিশালী করে তোলেন। বেঙ্গল লেবার পার্টিই ছিল এই দলগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ও শক্তিশালী। শ্রমিকদের উপর বেঙ্গল লেবার পার্টির প্রভাব অনেক সময়েই কমিউনিস্ট পার্টির চেয়েও বেশি ছিল। বেঙ্গল লেবার পার্টির নেতৃত্বাধীন অনেকগুলি ট্রেড ইউনিয়ন ছিল। ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে লেবার পার্টির নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় ক্যালকাটা পোর্ট অ্যাণ্ড ডক ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন নামে পোর্ট ও ডক শ্রমিকদের ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। ১৯৩৪ সালের ২৬ নভেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর, মোট ২১ দিন, ১৪,০০০ ডক শ্রমিক এই ইউনিয়নের নেতৃত্বে ধর্মঘটে শামিল হন। ১৯৩৬ সালের গোড়ার দিকে লেবার পার্টির সমস্ত কমিউনিস্ট সদস্যই ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে আবার তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে এসে বলশেভিক পার্টি গঠন করেন। ১৯৪৪ সালের মে মাসে আবার

বলশেভিক পার্টি'র অধিকাংশ সদস্যই ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্ট পার্টি'তে যোগ দেন।[২৪]

কমিউনিস্ট পার্টির মূল অংশটির সঙ্গে বেঙ্গল লেবার পার্টি-সহ অন্যান্য কমিউনিস্ট দল বা গোষ্ঠীগুলির সহযোগিতা-বিরোধিতার এক মিশ্র সম্পর্ক ছিল। মূল শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য, বা অনেক সময় কংগ্রেস ও গান্ধীবাদের বিরুদ্ধেও লড়াইয়ের জন্য, কমিউনিস্ট পার্টি, লেবার পার্টি ও অন্যান্য দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি-সহ সমস্ত বামপন্থী দলের মিলিত শক্তিতে ১৯৩৪ সালের প্রথমভাগে গঠিত "লীগ এগেন্স্ট্ গান্ধীজ্ম্" (গঠিত হওয়ার সময় নাম ছিল "গান্ধী বয়কট কমিটি")-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রমিক-স্বার্থে ১৯৩৫ সালের জুন মাসে গঠিত ট্রেড ইউনিয়ন রাইট্স্ ডিফেন্স্ কমিটি-র কথা, যাতে কমিউনিস্ট পার্টি, লেবার পার্টি-সহ সব শ্রমিকশ্রেণীর দলের প্রতিনিধিরাই অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবার ইউনিয়ন দখলের লড়াই এই দলগুলির নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মধ্যেই ছিল।[২৫] একে অপরের প্রতি দোষারোপও লেগেই ছিল। যদিও কমিউনিস্ট পার্টি-সহ তৎকালীন সমস্ত বামপন্থী দলেরই প্রেরণার উৎস ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং সোভিয়েত বিপ্লব, তথাপি এই দলগুলির মধ্যে লক্ষ্য, কর্মসূচী, কার্যধারা প্রভৃতি সব বিষয় নিয়েই বিরোধ ছিল, কিন্তু সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ছিল ব্যক্তিত্বের সংঘাত। এই ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং তজ্জনিত সংকীর্ণতাই অনেক সময় এই দলগুলির মিলিত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল।

বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ : ১৯৩১-১৯৩৪

১৯৩১ সালের গোড়ার দিকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র "কলকাতা কমিটি" গঠিত হওয়ার পর থেকেই ক্রমশ তার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি ও শক্তি বৃদ্ধি ঘটছিল। কংগ্রেস আন্দোলন, জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন প্রভৃতির বহু পরীক্ষিত সৈনিক কমিউনিস্ট পার্টিতে এসে যোগ দিতে থাকেন। বিভিন্ন ডিটেন্শন ক্যাম্প-মুক্ত এবং আন্দামান-মুক্ত জাতীয় বিপ্লবীরাই মূলত ত্রিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টি'র সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি ও ,শক্তি বৃদ্ধি ঘটান। তবে সেটা ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা। ১৯৩১ সালের আগস্ট মাসে সোমনাথ লাহিড়ী কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্য হন। ১৯৩১-৩২ সালের মধ্যে মন্মথ চ্যাটার্জী, সত্য ঘোষ, সরোজ মুখোপাধ্যায়, মহম্মদ ইস্মাইল, আব্দুল মোমিন, গেন্দা সিং প্রমুখ কমিউনিস্ট পার্টি'তে যোগ দেন। বঙ্কিম মুখার্জী আরো পরে ১৯৩৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টি'তে যোগ দেন।[২৬] ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কমিউনিস্ট পার্টি'তে কোনোদিন যোগ না দিলেও তিনি ও বঙ্কিম মুখার্জী প্রথম থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি'র সহযোগী ছিলেন। বহু যুবককে কমিউনিস্ট মতাদর্শে দীক্ষা দিয়ে ড. দত্তই কমিউনিস্ট পার্টি'র দিকে টেনে আনেন।

এই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি কাজ করত মূলত শ্রমিকদের মধ্যে এবং কিছুটা

পরিমাণে ছাত্রদের মধ্যে। কৃষকদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি'র কাজ তখনো সেভাবে শুরু হয়নি, যদিও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চলছিল। কমিউনিস্টদের প্রধান কর্মক্ষেত্র তখন ছিল কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী হাওড়া জেলার বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল। হুগলীতে ও বর্ধমানেও আই. পি. আর. পি.-এর সহযোগিতায় কমিউনিস্ট পার্টি' প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছিল। বেশ-কিছু শ্রমিক ও ছাত্র এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্য হন।

যদিও কমিউনিস্ট পার্টি' তখনো (অর্থাৎ ১৯৩২ সালে) নিষিদ্ধ হয়নি, তবুও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দমনপীড়নমূলক নীতির কারণে প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টি'র নামে কাজ চালানো প্রায় অসম্ভব ছিল। তার ওপর "কমিউনিস্ট" ব্যাপারটিতে অনেক সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদেরও আপত্তি ছিল। এই কারণে প্রকাশ্যে কাজ করার উদ্দেশ্যে এবং আরো বেশি সংখ্যক সহানুভূতিসম্পন্নদের পার্টি'র দিকে টেনে এনে তাঁদের কমিউনিস্ট-ভীতি কাটানোর উদ্দেশ্যে ১৯৩২ সালের ফেব্রুআরি মাসে প্রধানত আব্দুল হালিম এবং "কলকাতা কমিটি"র অন্যান্য সদস্যদের প্রচেষ্টায় ওয়ার্কার্স্ পার্টি' অব ইণ্ডিয়া নামে একটি প্রকাশ্য দল গঠন করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্যরা ছাড়াও বেশ কয়েকজন পার্টি'-সমর্থক এই দলের সদস্য হন। এই দল অন্যান্য কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলির কাছেও প্রকাশ্য সংগঠন হিসাবে বেশ গ্রহণযোগ্য হয়। কিছুদিন কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রকাশ্য সংগঠন হিসাবে কাজ করার পর ওয়ার্কার্স্' পার্টি' অব ইণ্ডিয়া ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, কারণ কমিউনিস্টরা স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিস্ট পার্টি'কে সংগঠিত করাকেই প্রথম ও প্রধান কাজ হিসাবে গণ্য করতেন।[২৭]

১৯৩১ সালের শেষদিকে কলকাতার ও পার্শ্ববর্তী হাওড়া জেলা-সহ অন্যান্য জেলার শিল্পাঞ্চলের চটকলগুলির চার লক্ষ শ্রমিক এক ধর্মঘটে শামিল হন। ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বঙ্কিম মুখার্জী, আব্দুল মোমিন এবং কমিউনিস্ট পার্টি'র অন্যান্য নেতারা এই ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন।[২৮] ১৯৩১ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি'র নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ট্রেড ইউনিয়ন ছিল। প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স্' ইউনিয়নের কথা। এই ইউনিয়নের নেতৃত্ব কমিউনিস্ট-অ-কমিউনিস্ট মিলিত হলেও ইউনিয়নের প্রধান শক্তি ছিলেন কমিউনিস্টরা। সোমনাথ লাহিড়ীর প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে ইস্টবেঙ্গল অ্যাণ্ড ইস্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ওয়ার্কার্স্' ইউনিয়ন। নেতৃত্বে ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ কমিউনিস্টরা। এছাড়াও ক্যালকাটা ট্রাম্ওয়েজ্ ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন (প্রধান নেতা ছিলেন কমিউনিস্ট মহম্মদ ইস্‌মাইল), বাস ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন, সিটি মোটর অ্যাণ্ড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন, বেঙ্গল ম্যাচ ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন, মেটিয়াবুরুজ ওয়ার্কার্স্' ইউনিয়ন, কেশোরাম কটন মিলস্ ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন প্রভৃতি ইউনিয়নের প্রধান নেতৃত্ব ছিল কমিউনিস্ট পার্টি'র হাতে, যদিও এই ইউনিয়নগুলিতে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই-এ কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বেঙ্গল লেবার পার্টি'।[২৯]

১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মূলত "কলকাতা কমিটি"র উদ্যোগে সারা ভারতের

কমিণ্টার্ন্-অনুগামী বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি বা গ্রুপগুলিকে নিয়ে কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টি'র সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে "কলকাতা কমিটি"র তরফ থেকে যোগ দেন আব্দুল হালিম, সোমনাথ লাহিড়ী ও রণেন সেন। এছাড়াও ঐ সর্বভারতীয় সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ড. গঙ্গাধর অধিকারী, পূরণচাঁদ যোশী, এস. জি. পাটকর, এম. এল. জয়মন্ত, গুরুদিৎসিং প্রমুখ। ঐ সম্মেলনে অধিকারীর লেখা খসড়া রাজনৈতিক 'থিসিস্'-টি পাস হয় এবং সম্মেলনে যোগদানকারী সকলকে নিয়ে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। অধিকারী পার্টি'র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত 'থিসিস্'-টি কমিণ্টার্ন্-এর কাছে পাঠানো হয়। ১৯৩৪ সালের ২০ জুলাই 'থিসিস্'-টি *Inprecor*-এ প্রকাশিত হয়। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া হয় যে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'কে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং 'থিসিস্'-এর বক্তব্য গ্রহণ করেছে। সারা ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি'কে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করতে "কলকাতা কমিটি" সেই সময় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।[৩০]

এই সমস্তই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ক্রুদ্ধ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। যদিও কমিউনিস্ট পার্টি তৎকালীন গণ আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দেয়নি, তবুও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার শত্রুকে চিনে নিতে কোনো ভুল করেনি। ফলে রাজরোষ নেমে এল কমিউনিস্ট পার্টি'র ওপর। ১৯৩৪ সালের ২৩ জুলাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'কে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার পুরস্কার হিসাবে নিষিদ্ধ ও বে-আইনী সংগঠন বলে ঘোষণা করল।[৩১]

কমিউনিস্ট পার্টি'র কার্যকলাপ : ১৯৩৪-১৯৩৫

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শুধু এতেই সন্তুষ্ট থাকল না। ১৯৩৫ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন বাংলা সরকার একটি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ১৩টি রাজনৈতিক ও শ্রমিক সংগঠনকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করল। নিষিদ্ধ সংগঠনগুলির মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি'র "কলকাতা কমিটি" ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন ছিল।[৩২] কমিউনিস্ট পার্টি গোপন কাজকর্মের ধারায় প্রথম থেকেই অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু নিষিদ্ধ হওয়ার পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টি তার সমস্ত কাজকর্মই গোপনে পরিচালিত করতে বাধ্য হলো। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্যরা শ্রমিকদের সংগঠিত করে আন্দোলন ও ধর্মঘটের পথে টেনে আনার কাজ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক প্রচার চালিয়ে যেতে লাগলেন। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি তার পূর্বেকার সংকীর্ণ মনোভাব অনেকটাই কাটিয়ে ওঠার ফলে তার কাজকর্মও ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। ১৯৩৫ সালের মে মাসে কেশোরাম কটন মিলস্-এর ৫,০০০ শ্রমিক এক ধর্মঘটে শামিল হন। এই ধর্মঘটে মুখ্য ভূমিকা নেন রণেন সেন, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ কমিউনিস্টরা।[৩৩] ১৯৩৫ সালে রাজা পঞ্চম জর্জে'র সিংহাসনে আরোহণের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারত-সহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র জাঁকজমকপূর্ণভাবে Silver

Jubilee উদ্‌যাপন করবে বলে ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট পার্টি'র পক্ষ থেকে এই Silver Jubilee অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ বয়কট করার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানানো হয় এবং এই মর্মে পার্টি'র পক্ষ থেকে বিভিন্ন আক্রমণাত্মক ইস্তাহার প্রকাশ ও বিলি করা হয়।[৩৪]

পট-পরিবর্তনের বছর : ১৯৩৫

১৯৩৫ সালের গোড়া থেকেই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক তার ষষ্ঠ কংগ্রেসের লাইন পরিবর্তন করতে চলেছে, এইরকম ইঙ্গিত ভারতে এসে পেঁছতে থাকে। এই সংক্রান্ত দলিলপত্র বাংলার কমিউনিস্টদের হাতে আসে এবং তাঁরা লাইন পরিবর্তনের ইঙ্গিত নিয়ে আলোচনা শুরু করেন।

International Press Correspondence (*Inprecor*)-এর ৯ মার্চ ১৯৩৫ (Vol. 15, No. 10) সংখ্যায় প্রকাশিত 'Problems of the Anti-Imperialist Struggle in India'—শীর্ষক প্রবন্ধে[৩৫] কংগ্রেসের গান্ধীবাদী নেতৃত্বের, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের ও কংগ্রেসের বামপন্থী অংশের (তখনও এঁদের *"left" national-reformists* হিসাবে অভিহিত করা হচ্ছে) তীব্র সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্টদেরও সমালোচনা করে লেখা হয়—"However, the Communist Party of India in the past committed a number of mistakes and incorrect actions as regards its participation in the anti-imperialist struggle. This could be especially felt at the crucial moment in 1930.......The task of the Communists was not to limit themselves simply to general appeals to fight for an anti-imperialist and anti-feudal revolution, but to go into the midst of the struggling masses, to try and rally them to their side, giving chief prominence to the concrete demands of the struggle against imperialism and putting the tactics of the united front into effect... The inability to link up the most active participation in the struggle against imperialism in the front ranks of the fighting masses with the exposure of national reformism, facilitated the growth of sectarian moods and tendencies, which even today are far from being overcome".[৩৬] ইঙ্গিত ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

১৯৩৫ সালের মে মাসের গোড়ার দিকেই কমিণ্টার্ন-এর তরফ থেকে Piatnitzsky ভারতের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে ভারতের কমিউনিস্টদের উপদেশ দেন যে, তাঁরা যেন কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কংগ্রেসকেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের প্রধান মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করেন এবং তাঁদের গোপন কমিউনিস্ট কাজকর্মের প্রকাশ্য আবরণ

(Cover) হিসাবে কংগ্রেস কমিটিগুলিকে ব্যবহার করেন। বোম্বাই-এর কমিউনিস্টরা সঙ্গে সঙ্গেই এই উপদেশ অনুসারে কাজ করা শুরু করেন। যুক্ত প্রদেশ (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ), পাঞ্জাব, নাগপুর, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলের কমিউনিস্টরাও বোম্বাই-এর কমিউনিস্টদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। কিন্তু বাংলার কমিউনিস্টরা তাঁদের এতদিনকার অনুসৃত তীব্র কংগ্রেস-বিরোধিতা ত্যাগ করে কংগ্রেসে ঢুকে কাজ করার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। এই ব্যাপারে তাঁদের আপত্তি তাঁরা জানাতেও দ্বিধা করেননি। আপত্তি সোমনাথ লাহিড়ীর ছিল, তবে এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আপত্তি ছিল রণেন সেনের।[৩৭] এই পর্বে বাংলার কমিউনিস্টদের কংগ্রেস বিরোধিতা এবং কমিণ্টার্ন্-প্রদত্ত নির্দেশানুযায়ী কংগ্রেসে ঢুকে কাজ করার বিষয়ে অনিচ্ছা ও আপত্তি মূলত দানা বেঁধে উঠেছিল রণেন সেনকে কেন্দ্র করেই। রণেন সেন ও বাংলার অন্যান্য কমিউনিস্টদের পরামর্শক্রমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে সোমনাথ লাহিড়ী বোম্বাইতে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনাকালে কংগ্রেসে প্রবেশের প্রশ্নে সমগ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটিরই আপত্তি জ্ঞাপন করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি এই আপত্তি কমিণ্টার্ন-এর নিকটেও পেশ করেছিল।[৩৮]

বাংলার কমিউনিস্টদের পক্ষ হতে সোমনাথ লাহিড়ীর পাঠানো আপত্তিজ্ঞাপক চিঠি পেয়ে কমিণ্টার্ন্-এর তরফ থেকে Piatnitzsky দ্বিতীয় একটি চিঠিতে সুস্পষ্ট রূপে জানিয়ে দেন যে, এই ব্যাপারে কমিণ্টার্ন্-এর নির্দেশ পালিত না হলে কমিণ্টার্ন্-এর সাহায্য থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন।[৩৯] ফলে কংগ্রেসে প্রবেশের প্রশ্নে বাংলার কমিউনিস্টদের আপত্তির তীব্রতা অনেকাংশেই হ্রাস পায়, যদিও তার রেশ আরও বেশ কিছুদিন বজায় ছিল। অবশ্য জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নও বাংলার কমিউনিস্টদের অবস্থান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস : ১৯৩৫

১৯৩৫ সালের ২৫ জুলাই থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম ও শেষ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় মস্কোতে। এই সপ্তম কংগ্রেসে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জর্জি ডিমিট্রভ তাঁর সুবিখ্যাত '*United Front*' ('যুক্তফ্রন্ট') তত্ত্ব পেশ করেন। ১৯৩৫ সালের ২ আগস্ট তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতায় ডিমিট্রভ খুব পরিষ্কারভাবে বলেন—"In *India* the Communists must support, extend and participate in all anti-imperialist mass activities, not excluding those which are under national reformist leadership. While maintaining their political and organizational independence, they must carry on active work inside the organizations which take part in the Indian National Congress, facilitating the process of Crystallization of a national revolutionary wing among them, for

the purpose of further developing the national liberation movement of the Indian peoples against British imperialism."[৪০] অনেক আলাপ-আলোচনার পর কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস ডিমিট্রভের *'United Front'* ('যুক্তফ্রন্ট') তত্ত্ব গ্রহণ করল। ১৯৩৫ সালের ২০ আগস্ট কমিণ্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হলো। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কাছে কমিণ্টার্নের সুস্পষ্ট নির্দেশ গেল—'যুক্তফ্রন্ট'-এর লাইন গ্রহণ করো, গঠন করো ফ্যাসিবাদবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যাপক 'যুক্তফ্রন্ট'।

১৯৩৫—'যুক্তফ্রন্ট'-এর লাইন গ্রহণ—কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা

'Inprecor'-এ প্রকাশিত 'যুক্তফ্রন্ট' তত্ত্ব ভারতের কমিউনিস্টদের হাতে এসে পেঁছিল ১৯৩৫ সালের শেষদিকে। কমিউনিস্ট পার্টি সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে 'যুক্তফ্রন্ট' তত্ত্ব গ্রহণ করল। সারা ভারতেই কমিউনিস্টরা কংগ্রেসে প্রবেশ করে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন Acting General Secretary সোমনাথ লাহিড়ী কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরি মিটিং ডাকেন। এই মিটিং গোপনে নাগপুরে অনুষ্ঠিত হয়। এই গোপন মিটিং-এ পি. সি. যোশী, অজয় কুমার ঘোষ ও আর. ডি. ভরদ্বাজ (যুক্ত প্রদেশ), এম. এল. জয়মন্ত (নাগপুর), জাম্বেকর (বোম্বাই) এবং পি. সুন্দরায়া (মাদ্রাজ) "যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্ব গ্রহণের পক্ষে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রয়োজনে কংগ্রেসে প্রবেশের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। বহু তর্ক-বিতর্কের ও সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর কেন্দ্রীয় কমিটির ঐ জরুরি গোপন মিটিং-এ কংগ্রেসে প্রবেশ করে এবং কংগ্রেসকেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের মূল ও প্রকাশ্য মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করে কাজ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[৪১] রণেন সেন, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ বাংলাদেশের কমিউনিস্টরাও এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন। সোমনাথ লাহিড়ী, রণেন সেন প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস যোগ দেন এবং কংগ্রেস কমিটির সদস্য হন।[৪২] শুরু হলো বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক নতুন যুগের, এক নতুন অধ্যায়ের।

মূল্যায়ন

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই প্রথম পর্যায়ে (১৯২৮-৩৫) কমিউনিস্টরা বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার ছিলেন। 'বাম-সংকীর্ণতাবাদী' অবস্থান গ্রহণ এবং গোষ্ঠীতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে অন্যান্য সব দল সম্পর্কেই এক নেতিবাচক মনোভাব ছিল দুটি প্রধান ত্রুটি। কিন্তু তাঁদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতায় কোনো খাদ ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কমিউনিস্ট পার্টির এই নিখাদ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতারই পুরস্কার দিয়েছিল পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

সূত্রনির্দেশ :

১. রণেন সেন, 'বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি' গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০-৪৮),' বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, মে, ১৯৮১, পৃ ২৮-২৯ ; লেখকের সঙ্গে রণেন সেনের সাক্ষাৎ-কার—২৮. ৪. ১৯৮৬, ১৫. ১. ১৯৮৭ ; Ranen Sen, 'Communist Movement in Bengal in the Early Thirties,' *Marxist Miscellany*, No. 6, January, 1975, New Delhi, pp. 1-2 ; রণেন সেন, "বাঙলায় ত্রিশ দশকের প্রথমার্ধের কমিউনিস্ট আন্দোলন", 'কমিউনিস্ট,' ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র অর্ধশতক পূর্তি উপলক্ষে সি. পি. আই. দলের পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ ১৬৩ ; ধরণী গোস্বামী, "বাঙলা তথা ভারতে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রসার ও পার্টি গড়ার আদিপর্ব", 'কমিউনিস্ট', কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ ১৪৯ ; ধরণী গোস্বামী, "ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ত্রিশের দশকের এক অধ্যায়", (প্রথম পর্ব), 'পরিচয়', বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ২-৩, শারদীয়, ১৩৮০ বাংলা সন (বা. স.), ১৯৭৩, কলকাতা, পৃ ১৩১ ; অমিতাভ চন্দ্র, "বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি-গঠনের ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগ (১৯৩০-১৯৩৭): হাওড়া জেলা—একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা", 'ইতিহাস-অনুসন্ধান', (দ্বিতীয় খণ্ড), গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ ৩৭৫-৭৬ ; অমিতাভ চন্দ্র, "বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি-গঠনের ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগ (১৯৩০-১৯৪৭): মুর্শিদাবাদ জেলার সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা", 'পদাতিক', চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বইমেলা, জানুআরি, ১৯৮৭, কলকাতা, পৃ ২৩-২৪ ।

২. Gangadhar Adhikari (ed.), *Documents of the History of the Communist Party of India*, (hereafter *Documents* : in a multi-volume project), People's Publishing House, New Delhi ; Vol. II (1923-1925), (Published in 1974), pp. 671-72 ; Vol. III-A (1926), (1978), p. 24 ; Vol. III-B (1927), (1979), pp. 41-42 ; Vol. III-C (1928), (1982), p. 447 ; মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,' (প্রথম খণ্ড) (১৯২০-১৯২৯) এবং (দ্বিতীয় খণ্ড) (১৯২৯-১৯৩৪) (অসম্পূর্ণ), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪, (প্রথম খণ্ড), পৃ ৩৩৭-৫৮ ; Muzaffar Ahmad, *The Communist Party of India and its Formation Abroad*, (Translated from Bengali by Professor Hirendranath Mukherjee), National Book Agency, Calcutta, April, 1962, p. 161 ; Gautam Chattopadhyay. *Communism and Bengal's*

Freedom Movement, Vol. I (1917-29), People's Publishing House, New Delhi, November, 1970, pp. 94-105, 117, 118-23, 177-79, (Appendix D) ; নীলোৎপল দত্ত ও রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে ধরণী গোস্বামীর সাক্ষাৎকার—১৮. ৭. ১৯৮৬ ; সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকারটি নিম্নলিখিত নামে প্রকাশিত হয়—ধরণী গোস্বামী, "শ্রমিকরাও চাইলেন আপস-হীন স্বাধীনতা", 'পরিচয়', বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ১-৩, শারদীয়, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৯৫ বাংলা সন, আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৮৮, কলকাতা, পৃ ১-৮ ; *The Amrita Bazar Patrika*, Calcutta, April 4, 1928, p. 9.

৩. Gangadhar Adhikari (ed.), *Documents of the History of the Communist Party of India*, (hereafter Documents), Voll. III-C (1928), People's Publishing House, New Delhi, December, 1982, *Preface*, (Written by Dilip Bose), p. VI.

৪. *Revolutionary Movement in the Colonies and Semi-Colonies, Thesis adopted by the Sixth Congress of the Communist International : 1928*, (hereafter *Colonial Thesis*), People's Publishing House Ltd., Bombay, First Indian Edition, January, 1948, pp. 1-67. "*Colonial Thesis*"-টি বাংলাতেও প্রকাশিত হয়েছে নিম্নলিখিত নামে—"সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক নীতি এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য, তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে (১৯২৮) গৃহীত থিসিস্", পাঠক উদ্যোগে প্রকাশিত, প্রকাশক : সুশোভন মুখার্জী ,কলকাতা ও হাওড়া, ১৯৮৮, পৃ I-VII এবং ১-৭৬। "*Colonial Thesis*"-টি *International Press* Correspondence (*Inprecor*)-এও প্রকাশিত হয়—*Inprecor, 8 (88)*, 12 December 1928. "*Colonial Thesis*"-এর মূল অংশবিশেষ *Documents*-এও প্রকাশিত হয়—Gangadhar Adhikai (ed.), *Documents*, Volume III-C (1928), Introduction to Part II, pp. 415-20.

৫. *Colonial Thesis, op. cit.*, p. 54.

৬. *Ibid.*, p 55.

৭. *Ibid.*, p. 37.

৮. *Ibid.*, p. 48.

৯. *Ibid.*, p. 54.

১০. Gautam Chattopadhyay, *op. cit.*, pp. 119-22 ; Polit-Bureau, C. C., Revolutionary Communist Party of India (Edited and Published), *Historical Development of Communist Movement in India*, Calcutta, December, 1944, p. 15.

১১. 'Thesis of the Workers' and Peasants' Party of India', *Labour Monthly*, Vol. XI, No. 3, March, 1929, London, p. 160 ; মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, পূর্বোল্লিখিত, (প্রথম খণ্ড), পৃ ৩৫০-৫১ ; Gangadhar Adhikari (ed.), *Documents*, Vol. III-C (1928), pp. 708-781 ; Gautam Chattopadhyay. *op. cit*, pp. 120-22.

১২. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, পূর্বোল্লিখিত, (প্রথম খণ্ড), পৃ ৩৫০।

১৩. Gangadhar Adhikari (ed.), *Documents*, Vol. III-C (1928), pp. 782-81.

১৪. *Draft Platform of Action of the Communist Party of India*—এই তত্ত্বের পূর্ণ বয়ানের জন্য দেখুন—Horace Williamson, *India and Communism*. (With an introduction and explanatory notes by Mahadevaprasad Saha), Editions Indian, Calcutta, 1976, Appendix-II, pp. 315-33 এবং অংশবিশেষের জন্য দেখুন—Horace Williamson, *op. cit*, pp. 165-66. "*Draft Platform*" টি *Inprecor*-এও প্রকাশিত হয়—*Inprecor*, 10 (58), 18 December 1930. "*Draft Platform*" থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতাংশের জন্য দেখুন—Home / poll. / F. No. 7 / 1 / 1936.

১৫. Horace Williamson, *op. cit.*, pp. 165, 319.

১৬. *Ibid.*, pp. 320-21.

১৭. Gangadhar Adhikari, *Communist Party and India's Path to National Regeneration and Socialism*, Communist Party Publication, New Delhi, June, 1964, pp.-64-65 ; Chinmohan Sehanavis, "Meerut Arrests to Imperialist War, (Second Period), (1929-1941)", in the *Guidelines of the History of the Communist Party of India*, Issued by the Central Party Education Department, Communist Party Publication, New Delhi, August, 1974, pp. 34-35.

১৮. Gene D. Overstreet and Marshall Windmiller, *Communism in India*, The Perennial Press, Bombay, 1960, p. 139.

১৯. ধরণী গোস্বামী, "ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ত্রিশের দশকের এক অধ্যায়", (প্রথম পর্ব), 'পরিচয়', বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ২-৩, শারদীয়, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, ১৯৭৩, কলকাতা, পৃ: ১৩১-৩৮ ; নগেন সরকার, "ইয়ং কমরেডস্‌ লীগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ", (ধরণী গোস্বামী সম্পাদিত), 'পরিচয়', বর্ষ ৪৪, সংখ্যা ৪, কার্তিক, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, নভেম্বর, ১৯৭৪, কলকাতা, পৃ ৪৩৮-৫০ ; Dharani Goswami,

"Pages from the Past," *Marxist Miscellany*, No. 1, January, 1970, New Delhi, pp. 31-41 ; লেখকের সঙ্গে ধরণী গোস্বামীর সাক্ষাৎকার —২৮. ১০. ১৯৮৭, ৪. ১১. ১৯৮৭ ; লেখকের সঙ্গে সুধাংশু কুমার অধিকারীর সাক্ষাৎকার—৮. ১২. ১৯৮৭, ২৬. ১. ১৯৮৮ ; লেখকের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের সাক্ষাৎকার—৩০. ৫. ১৯৮৬ ; Satyendra Narayan Mazumdar, *In Search of A Revolutionary Ideology and A Revolutionary Programme : A Study in the Transition from National Revolutionary Terrorism to Communism*, People's Publishing House, New Delhi, December, 1979, pp. 163-68 ; Gangadhar Adhikari (ed.), *Documents*, Vol. III-C (1928), op. cit., Introduction, pp. 95-100 and pp. 294-300 ; অমিতাভ চন্দ্র, "ইয়ং কমরেডস্ লীগ—বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ও কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সংগঠিত সূচনা", 'পদাতিক', পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বইমেলা, জানুআরি, ১৯৮৮, কলকাতা, পৃ ৫৮-৭২ ; Amitabha Chandra, "The Young Comrades' League : A Nucleus of the Future Communist Party and Movement in Bengal", *Socialist Perspective*, A Quarterly Journal of Social Sciences, Vol. 16, No. 4, March, 1989, Calcutta, pp. 227-52.

২০. Home/Poll./F. No. 18/VII/1928 & K. W. XI (September 1928—January 1929), Home/Poll./F. No. 1/1928 (January-December 1928), Home/Poll./F. No. 17/1929 (January-December 1929), and Home/Poll/F. No. 18/II/1930 (January), Home/Poll. F. No. 18/III/1930 (February) and Home/Poll./F. Nos. 18/IV/1930 (March)—18/XIII/1930 (December) ; *The Amrita Bazar Patrika*, Calcutta, April 4, 1928—December 31, 1930 ; মুজফ্ফর আহ্মদ, পূর্বোল্লিখিত, (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ ১১-৪৮ ; Gautam Chattopadhyay, *op. cit.*, pp. 106-17, 136-42 (Appendix A) ; Sukomal Sen, *Working Class of India : History of Emergence and Movement (1830-1970)*, K. P. Bagchi & Company, Calcutta, 1979, pp. 232-78 ; Panchanan Saha, *History of the Working-Class Movement in Bengal*, People's Publishibg House, New Delhi, August, 1978, pp. 74-143 ; আব্দুল মোমিন, 'কলকাতার গাড়োয়ান ধর্মঘটের চারদিন (১-৪ এপ্রিল, ১৯৩০)', মনীষা, কলকাতা, আগস্ট, ১৯৮০, পৃ ১-৭৮ ; আব্দুল মোমিন,

"চটকল শ্রমিকের প্রথম সাধারণ ধর্মঘট (১৯২৯)", 'কালান্তর', কলকাতা, ১০, ১১ ও ১২ আগস্ট ১৯৭০, (ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত); অমিতাভ চন্দ্র (সম্পাদিত), "সুরথ পাছাল-এর স্মৃতিচারণ", (অমিতাভ চন্দ্রের ভূমিকা, টীকা ও মন্তব্য সম্বলিত), 'বারোমাস,' নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শারদীয়, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৮৭, কলকাতা, পৃ ৪৩, ৪৫, ৬৩-৬৪ ; অমিতাভ চন্দ্র, "হাওড়া জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ইতিহাস (১৯৩০-১৯৪৭)," 'পদাতিক,' চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শারদীয়, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, ১৯৮৭, কলকাতা, পৃ ২৩-২৫ ; অমিতাভ চন্দ্র, পূর্বোল্লিখিত, 'ইতিহাস-অনুসন্ধান', (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ ৩৭৭-৭৯ ।

২১. ধরণী গোস্বামী, পূর্বোল্লিখিত, (প্রথম পর্ব), 'পরিচয়,' পৃ ১৩৭-৩৮ ; ধরণী গোস্বামীর সাক্ষাৎকার—২৮, ১০, ১৯৮৭, ৪, ১১, ১৯৮৭ ; সুধাংশু অধিকারীর সাক্ষাৎকার—৮. ১২. ১৯৮৭, ২৬. ১. ১৯৮৮ ; অমিতাভ চন্দ্র, পূর্বোল্লিখিত, 'পদাতিক,' বইমেলা, জানুআরি, ১৯৮৮, পৃ ৭১-৭২ ; Amitabha Chandra, *op. cit.*, *Socialist Perspective*, *March*, *1989*, pp. 245-46.

২২. রণেন সেন, 'বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০-৪৮),' বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, মে, ১৯৮১, পৃ ৩৭-৪১, ১৩০, ১৭০-৭১ ; সরোজ মুখোপাধ্যায় 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা', প্রথম খণ্ড (১৯৩০-১৯৪১), গণশক্তি পত্রিকা দপ্তর, কলকাতা, মে, ১৯৮৫, পৃ ৫১-৫২, ৫৫, ১৭৯-৮০, ২১৩, ২৩১ ; লেখকের সঙ্গে রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—২৮. ৪. ১৯৮৬, ১৫, ১, ১৯৮৭; অমিতাভ চন্দ্র, পূর্বোল্লিখিত, 'ইতিহাস-অনুসন্ধান', (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ ৩৭৬-৭৭, ৩৮৪ ; অমিতাভ চন্দ্র, পূর্বোল্লিখিত, 'পদাতিক', বইমেলা, জানুআরি, ১৯৮৭, পৃ ২৫-২৬ ।

২৩. Intelligence Branch (I.B.), Government of Bengal—File No. 929/35 (Year—1935) ; Intelligence Branch (I.B.), Government of Bengal—File No. 1201/33 (Year—1933) ; Home/Poll./ F. No. 7/20/1934 & K.W., Serial Nos. 1-4 ; Subodh Roy (ed.), *Communism in India* : *Unpublished Documents*, (Vol. I), (1925-34), National Book Agency, Calcutta, 1980, pp. 377-423 ; Panchanan Saha, "The Communist Movement in India : The Formative Period" ; *Problems of National Liberation*, Vol. IV, No. 1, December, 1980, Calcutta, pp. 28-46 ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫৫, ৬১-৬৩ ; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪২, ৪৮-৪৯, ৫৪-৫৬, ৬৭-৬৯ ।

২৪. বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি-সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন—

অমিতাভ চন্দ্র, "বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি-সংগঠন ও রাজনীতি (১৯৩২-১৯৪৪)", ইতিহাস-অনুসন্ধান (তৃতীয় খণ্ড), গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ ৪৫১-৪৬৬। তথ্য-সংকলনের উৎস হিসাবে উক্ত প্রবন্ধের সূত্রনির্দেশ দ্রষ্টব্য। তৎসহ I. B., Government of Bengal—File No. 929/35 ; I. B., Government of Bengal—File No. 1201/33 ; Home/Poll./ F. No 7/20/1934 & K. W., Serial Nos. 1-4.

২৫. I.B., Government of Bengal—File No. 929/35 ; Home/Poll./ F. No. 7/20/1934 & K. W., Serial Nos. 1-4 ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৭৯-৮২ ; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৭৬-৮১।

২৬. সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫১-৫৬ ; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪২, ৪৮-৫০ ; লেখকের সঙ্গে রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—২৮. ৪. ১৯৮৬, ২৭. ১২. ১৯৮৮।

২৭. I.B., File No. 1201/1933 ; Home/Poll./F. No. 7/20/1934 & K.W., Serial Nos. 1-4 ; Subodh Roy, *op. cit.*, pp. 386-93 ; Panchanan Saha, *op. cit.*, *Problems of National Liberation*, (hereafter *P.N.L.*), pp. 32-37 ; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫৫-৫৬ ; রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—২৮.৪.১৯৮৬, ২৭.১২.১৯৮৮।

২৮. রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫৬।

২৯. I.B., Government of Bengal—File No. 929/35 ; Home/Poll./ F. No. 7/20/1934 & K. W., Serial Nos. 1-4 ; Subodh Roy, *op. cit.*, p. 388 ; Panchanan Saha, *op. cit.*, *P.N.L.*, p. 34 ; রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—২৮.৪.১৯৮৬, ২২.১.১৯৮৭, ২৭.১২.১৯৮৮ ; সোমনাথ লাহিড়ী, "সভ্য হবার আগে", 'সোমনাথ লাহিড়ী রচনাবলী, (১৯৩১-৪৫)', (প্রথম খণ্ড), মনীষা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫, পৃ ২৪-২৬।

৩০. রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৬৫-৬৬ ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৭০ ; রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—২৮. ৪. ১৯৮৬, ২৭. ১২. ১৯৮৮।

৩১. I. B., Government of Bengal—File No. 929/35 ; Panchanan Saha, *op. cit.*, *P.N.L.*, p. 46 ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৮৮। সরোজ মুখোপাধ্যায় অবশ্য তারিখ ভুল করে লিখেছেন ২৮ জুলাই। ওটা হবে ২৩ জুলাই।

৩২. I.B., Government of Bengal—File No. 929/35 ; Panchanan Saha, *op. cit.*, *P.N.L.*, p. 46 ; Home/Poll./ F. No. 24/15/1935.

৩৩. I.B., File No. 929/35 ; Sukomal Sen, *op. cit.*, p. 349.

৩৪. I.B., File No. 929/35 ; রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—২৭. ১২. ১৯৮৮।

৩৫. 'Problems of the Anti-Imperialist Struggle in India,' *International Press Correspondence* (*Inprecor*), Vol. 15, No. 10, 9 March 1935, pp. 289-92. *Inprecor* ছাড়াও প্রবন্ধটির পূর্ণ বয়ানের জন্য দেখুন—Home/Poll./F. No. 7/9/1935 ; Subodh Roy (ed.), *Communism in India : Unpublished Documents*, (Vol. II), (1935-1945), National Book Agency, Calcutta, December, 1985, pp. 28-42.

৩৬. *Inprecor*, pp. 290-91 ; Home/Poll./F. No. 7/9/1935 ; Subodh Roy (ed.), op. cit., (1935-1945), p. 35.

৩৭. I. B., File No. 929/1935 ; রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—২৭. ১২. ১৯৮৮., ২২. ৫. ১৯৯০।

৩৮. I. B., File No. 929/1935.

৩৯. I. B., File No. 929/1935.

৪০. Georgi Dimitrov, *Selected Speeches and Articles*, (With an Introduction by Harry Pollitt), Lawrence & Wishart Limited, London, 1951, p. 92 ; George Dimitrov, *Against Fascism and War*, (With a Forward by James West), International Publishers Co., New York, 1986, p. 66 ; Georgi Dimitrov, *United Front of the Working Class Against Fascism—Report to the Seventh World Congress of the Communist International, 1935*, Culture Publishers, Calcutta, May, 1968, (Reprint), p. 66 ; Georgi Dimitrov, 'Fascism and the Unity of the Working Class', (1935), in Gangadhar Adhikari (ed.), *From Peace Front to People's War*, Second England Edition, People's Publishing House, Bombay, June, 1944, p. 68 ; *Inprecor*, Vol. 15, No. 37, 20 August 1935, p. 971.

৪১. রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৮৮-৯১ ; রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—২৭. ১২. ১৯৮৮, ২২. ৫. ১৯৯০ ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৯৫।

৪২. I. B., File No. 929/1935 ; রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—২৭. ১২. ১৯৮৮., ২২. ৫. ১৯৯০।

বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় : ১৯৩৫-১৯৩৯

বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় হিসাবে ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯—এই সময়সীমাকে নির্দিষ্ট করার কারণটি প্রবন্ধের শুরুতেই আলোচনা করে নেওয়া দরকার। যেহেতু যে-কোনও দেশেরই কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্দোলন একদিকে যেমন সেই দেশের জাতীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের অন্যতম অংশ এবং অপরদিকে তেমনই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনেরও অন্যতম অংশ, সেহেতু আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন-সংক্রান্ত ঘটনাপ্রবাহকে বাদ দিয়ে কোনও দেশেরই, এমন কি কোনও দেশের কোনও বিশেষ অঞ্চলেরই, কমিউনিস্ট আন্দোলনের সম্যক্ চিত্রাঙ্কন সম্ভব নয়। বর্তমান নিবন্ধে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন-সংক্রান্ত ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আমি বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় হিসাবে ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯—এই সময়সীমাকে নির্দিষ্ট করেছি। অবশ্য আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গেই জাতীয় ও প্রাদেশিক স্তরে কমিউনিস্ট আন্দোলন-সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনাবলীও এই কালনির্ণয়ে সহায়তা করেছে।

১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ কংগ্রেসে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ঔপনিবেশিক প্রশ্নে এক "বামপন্থী" অবস্থান গ্রহণ করে। ক্রমশ সংশোধিত হতে হতে ১৯৩৫ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম কংগ্রেসে এই "বামপন্থী" অবস্থান সম্পূর্ণ বর্জিত হয়। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ঐ সপ্তম কংগ্রেসেই ডিমিট্রভের "***United Front***" ("যুক্তফ্রন্ট") তত্ত্ব গৃহীত হয়। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পরিবর্তিত লাইনের প্রভাবে ভারতসহ বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিরও লাইন বদলায়। ফলে ১৯৩৫ সাল থেকেই বাংলার তথা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়।

১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল ইউরোপের মাটিতে। এই বিশ্ব-যুদ্ধের ছোঁয়া লাগল ভারতে। যুদ্ধকালীন সময়েও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের "যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্ব অপরিবর্তিত ছিল, অপরিবর্তিত ছিল ভারতসহ বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির "যুক্তফ্রন্ট" লাইন। কিন্তু যুদ্ধ সৃষ্টি করেছিল নতুন ধরনের চাপ, সৃষ্টি করেছিল নতুন ধরনের জটিলতা। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই এই যুদ্ধকে সম্পূর্ণভাবে "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ" হিসাবে অভিহিত করে এবং সর্বতোভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরোধিতা করতে থাকে। ফলস্বরূপ বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির উপর নেমে আসে চরম সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাস ও নিষ্পেষণ। "সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধে"র যুগে বাংলাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির সম্ভবত সর্বাধিক শিকার হন কমিউনিস্টরা। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপের পর্যালোচনা পার্টির ইতিহাসের ভিন্ন পর্যায়ভুক্ত এবং ফলে পৃথক্ এক নিবন্ধের বিষয়বস্তু। সেই কারণেই এই নিবন্ধে বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার ছেদ টানব ১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাতের ঠিক আগেই।

সুতরাং ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯—বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই দ্বিতীয় পর্যায় ছিল "যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্বের বাস্তব রূপায়ণের যুগ। একই সঙ্গে এই যুগ ছিল বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির ও আন্দোলনের বিকাশের যুগ। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মূল স্রোতে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ আন্দোলনকেও শক্তিশালী করে তোলে, কমিউনিস্ট পার্টিরও শক্তিবৃদ্ধি ঘটায়। এই পর্যায়েই বিভিন্ন ছোট ছোট কমিউনিস্ট গ্রুপের ও বামপন্থী দলের সদস্যদের স্বীয় গ্রুপের ও দলের স্বাধীন অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান পার্টিকে শক্তিশালী করে তোলে। এই পর্যায়েই বেঙ্গল লেবার পার্টির কমিউনিস্ট সদস্যরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধি ঘটান। কমিউনিস্টরা "যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্বকে বাস্তব রূপদানের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে (সি. এস. পি.) ও কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কাজ করতে থাকেন। এই পর্যায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সদ্য আন্দামান-মুক্ত, জেল-মুক্ত ও বিভিন্ন ডিটেনশন্ ক্যাম্প্-মুক্ত জাতীয় বিপ্লবীদের একটা বড় অংশের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। পূর্বতন জাতীয় বিপ্লবীদের যোগদানের ফলে কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি ও জনসাধারণের চোখে মর্যাদাবৃদ্ধি উভয়ই ঘটে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এই যুগে কমিউনিস্ট পার্টির কাজের বিস্তৃতি ঘটে। পার্টির সদ্যগঠিত জেলা কমিটিগুলির অধিকাংশেরই দায়িত্বে ছিলেন পার্টিতে যোগদানকারী, এই জাতীয় বিপ্লবীরা। জেলায় জেলায় পার্টিকে বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে এঁদের অবদানই সবচেয়ে বেশী। এই সময়েই বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা প্রভৃতি গণ-সংগঠন ও শ্রেণী-সংগঠন গড়ে ওঠে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসেরও কাজের বিস্তৃতি ঘটে এই যুগে। এই সবকটি গণ-সংগঠন ও শ্রেণী-সংগঠনেই অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন কমিউনিস্টরা। অ-কমিউনিস্টদের সঙ্গে একযোগে কমিউনিস্টরা এই সংগঠনগুলি পরিচালনা করতেন এবং শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের নিজস্ব দাবিদাওয়াভিত্তিক আন্দোলনে ও বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন।

বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির ও আন্দোলনের এই পর্যায় সম্পর্কে ভবানী সেনের মন্তব্য : "১৯৩৭-এর আগে পর্যন্ত পার্টি ছিল অল্পসংখ্যক কমরেডের সমষ্টি যারা পরস্পরের কমরেড আবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গও বটে। তাই তখনকার পার্টি যেন এক পরিবারের লোক—পারিবারিক চক্র। এখন বিভিন্ন দল থেকে নতুন নতুন সভ্য, বিভিন্ন অভিযান থেকে নতুন নতুন উপাদান পেয়ে পার্টি অনেক বড় হয়ে উঠতে লাগল—পারিবারিক বা ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার বন্ধন দিয়ে তাকে আর বেঁধে রাখা যায় না। অথচ পার্টির ভেতরে রাজনৈতিক ঐক্য তখনও দৃঢ়সংবদ্ধ হয়নি। কাজেই পার্টির মধ্যে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা তখনও আসেনি।...সংগঠনের এই আদিম অবস্থা পার্টির রাজনীতিক প্রভাব ও সংগঠন বাড়ার শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়াল। তখন পার্টি-সংগঠনের দিক থেকে শুরু হল চক্রস্তর থেকে পার্টিস্তরে উঠবার জন্য সংগ্রাম।"[১] ভবানী সেন এই পর্যায়কে চিহ্নিত করেছেন চক্র স্তর থেকে পার্টি

স্তরে উত্তরণের পর্যায় হিসাবে। তাঁর মতে প্রকৃতপক্ষে এই উত্তরণ ঘটল ১৯৩৮ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসের মধ্যে।[২]

বর্তমান নিবন্ধে উল্লিখিত সবকটি বিষয়ই আমি ছুঁয়ে যাব। স্থানসংক্ষেপের কারণে এই নিবন্ধের পরিসরে বিষয়গুলির বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হবে না। স্থানসংক্ষেপের কারণেই আমার আলোচনা হবে মূলত কলকাতাভিত্তিক, জেলাগুলির উল্লেখ থাকবে প্রসঙ্গক্রমে। এই একই কারণে এই নিবন্ধের মূল অভিনিবেশ হবে এই পর্যায়ের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি। শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা আলোচনাপ্রসঙ্গে ছুঁয়ে যাব, ইচ্ছা থাকলেও বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হবে না।

১৯৩৫—"যুক্তফ্রন্ট"-এর লাইন গ্রহণ—কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত

১৯৩৫ সালের শেষদিকে ভারতের কমিউনিস্টদের হাতে এসে পৌঁছল ***Inprecor***-এ প্রকাশিত "যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্ব। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন **Acting General Secretary** সোমনাথ লাহিড়ীর ডাকে কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরী মিটিং গোপনে অনুষ্ঠিত হয় নাগপুরে। বহু তর্ক-বিতর্কের ও সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর কেন্দ্রীয় কমিটি "যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্ব অনুযায়ী কংগ্রেসে প্রবেশ করে এবং কংগ্রেসকেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের মূল ও প্রকাশ্য মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করে কাজ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে। বাংলাদেশের কমিউনিস্টরাও এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন। সোমনাথ লাহিড়ী, রণেন সেন প্রমুখ বাংলার কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসে যোগ দেন এবং কংগ্রেস কমিটির সদস্য হন।[৩] সূচনা হয় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের—"যুক্তফ্রন্ট" যুগের।

দত্ত-ব্রাডলি থিসিস ঃ ১৯৩৬

১৯৩৬ সালের ২৯ ফেব্রুআরি ***Inprecor***-এ প্রকাশিত হল গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির (সি. পি. জি. বি.) দুই নেতৃস্থানীয় সদস্য রজনী পাম দত্ত ও বেন ব্রাডলির লেখা **'The Anti-Imperialist People's Front'**—নামক প্রবন্ধ, যা সাধারণভাবে **'Dutt-Bradlev Thesis'** ('দত্ত-ব্রাডলি থিসিস') নামে সুপরিচিত।[৪] সপ্তম কংগ্রেসে গৃহীত ডিমিট্রভের "যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্বের ভিত্তিতে কিভাবে ভারতে কমিউনিস্টরা এই **"United National Front"** ("যুক্ত জাতীয় ফ্রন্ট") গড়ে তুলবেন, সেই আলোচনাই ছিল 'দত্ত-ব্রাডলি থিসিস'-এর বিষয়বস্তু। 'থিসিস'-এ বলা হল ভারতের কমিউনিস্টদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ভিত্তিতে কংগ্রেসের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সভা, যুব সংগঠন প্রভৃতি সমস্ত গণসংগঠনের ঐক্যভিত্তিক ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী "যুক্তফ্রন্ট" গড়ে তোলা।[৫] 'থিসিস্'-এ আরও বলা হল কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী, ট্রেড ইউনিয়নিস্ট, কমিউনিস্ট এবং বামপন্থী কংগ্রেসী সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে এক ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী

সংগ্রাম গড়ে তোলা। বলা হল কংগ্রেসের সংবিধান, নীতি, সংগঠন ও নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্য এই সম্মিলিত শক্তিগুলির প্রচেষ্টা চালানো উচিত। আরও বলা হল বর্তমান কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত র‍্যাডিক্যাল শক্তিগুলির সম্মিলিত প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি (সি. এস. পি.) এই ব্যাপারে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।[৬] কংগ্রেসের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে 'দত্ত-ব্রাডলি থিসিস'-এ বলা হয়—**"The National Congress can play a great and a foremost part in the work of realising the Anti-Imperialist Poeple's Front. It is even possible that the National Congress, by the further transformation of its organisation and programme, may become the form of realisation of the Anti-Imperialist People's Front ; for it is the reality that matters, not the name."**[৭]

'দত্ত-ব্রাডলি থিসিস'-এ নির্দেশিত "যুক্তফ্রন্ট" সম্পর্কে **Overstreet and Windmiller-**এর মন্তব্যের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে—**"This meant an alliance (that is, a united front from above) with the Congress Socialist Party, and penetration (that is, a united front from below) of the Indian National Congress as a whole."**[৮]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এই পর্যায়ের কাজকর্মের রূপরেখা নির্ধারণ করে দিল 'দত্ত-ব্রাডলি থিসিস'। কমিউনিস্ট পার্টি ক্রমশ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে আরম্ভ করল ; কমিউনিস্টদের সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী মানসিকতার বিরূপতাও ক্রমশ কাটতে আরম্ভ করল। ফলস্বরূপ কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধি ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিস্তার ঘটতে থাকল। কিন্তু একই সঙ্গে কংগ্রেস সম্পর্কে অহেতুক মোহের এবং কমিউনিস্ট পার্টির পরবর্তীকালের বিভিন্ন সময়ে "দক্ষিণপন্থী" বিচ্যুতির মূলও নিহিত ছিল এই 'দত্ত-ব্রাডলি থিসিসে'ই। এই পর্যায়ের কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মে এর প্রতিফলনও পড়তে দেখা যায়।

"যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশে কমিউনিস্টদের কাজকর্ম

"যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্ব ও 'দত্ত-ব্রাডলি থিসিস' অনুযায়ী বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে ও কংগ্রেসে যোগ দেন এবং অনেক ক্ষেত্রে কংগ্রেসের মধ্যপদে ও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির উচ্চ পদেও আসীন হন। সি.পি. আই. ও সি.এস. পি. মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, বেশ কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতা সি. এস. পি.-র সদস্য হবেন এবং দায়িত্বশীল পদ গ্রহণ করবেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের কয়েকজন প্রভাবশালী কমিউনিস্ট নেতা সি. এস. পি.-তে যোগ দেন এবং ১৯৩৭ সালে শিবনাথ ব্যানার্জি, গুণদা মজুমদার প্রমুখ সোস্যালিস্টদের সঙ্গে দুই কমিউনিস্ট নেতা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও নৃপেন চক্রবর্তী সি এস পি-র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন।[৯] ১৯৩৮ সালের জানুআরি-ফেব্রুআরি মাসে অনুষ্ঠিত হরিপুরা

কংগ্রেসে বঙ্কিম মুখার্জী, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, সোমনাথ লাহিড়ী, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির (এ. আই. সি. সি.) সদস্য নির্বাচিত হন।[১০] কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্কিম মুখার্জী ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির (বি. পি. সি সি.) সহ-সভাপতি এবং পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী ও কমল সরকার ছিলেন সহ-সম্পাদক।[১১] তাঁরা ছাড়াও বি. পি. সি. সি.-র কার্যনির্বাহক কমিটিতে, বি. পি. সি. সি.-তে এবং বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটিতেও অন্যান্য কমিউনিস্টরা স্থান পেয়েছিলেন।

"যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্ব ও 'দত্ত-ব্রাডলি থিসিস' অনুসারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পলিট-ব্যুরোর পক্ষ থেকে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুআরি মাসে **'For the United National Front'** নামে এক বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[১২] এই প্রস্তাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় ঐক্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বামপন্থী ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও সি. পি. আই.-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মূলত জোর দেন ঐক্যবদ্ধ জাতীয় নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর। সি. পি. আই.-এর বঙ্গীয় প্রাদেশিক নেতৃত্ব সাধারণভাবে এই লাইন অনুসরণ করে চললেও ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনের সময় বামপন্থী ঐক্যের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে সি. পি. আই.-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক নেতৃত্বের মতপার্থক্য দেখা যায়। প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।

জাতীয় বিপ্লবীদের, বিভিন্ন বামপন্থী দলের ও লেবার পার্টির সদস্যদের সি. পি. আই.-তে যোগদান

কমিউনিস্ট মতাদর্শ-গ্রহণকারী জাতীয় বিপ্লবীদের একটা বড় অংশ ১৯৩৫ সালের ২৬ এপ্রিল আন্দামানের সেলুলার জেলে গোপনে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন কমিটি গঠন করেন। পয়লা মে সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়।[১৩] মোটামুটি একই সময়ে বিভিন্ন জেলে ও বন্দীশিবিরেও অনুরূপ কমিউনিস্ট কনসলিডেশন গঠিত হয়। ১৯৩৫-৩৬ সালে বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী ছাড়া পেলেও প্রধানত ১৯৩৭ সাল থেকেই সাজাপ্রাপ্ত ও বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি শুরু হয়। বন্দীমুক্তি চলে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত। মুক্তিপ্রাপ্ত জাতীয় বিপ্লবীদের একটা বড় অংশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যেই বিভিন্ন জেলায় পার্টি বিস্তৃত হয় এবং অবিভক্ত বাংলা-দেশের প্রায় সমস্ত জেলায় পূর্ণাঙ্গ পার্টি কমিটি অথবা নিদেনপক্ষে পার্টি সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়। সদ্য গঠিত এই কমিটিগুলির অধিকাংশেরই দায়িত্বে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানকারী এই জাতীয় বিপ্লবীরা।[১৪]

ইণ্ডিয়ান প্রোলেটারিয়ান রেভলিউশনারী পার্টি, যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘ, সাম্যরাজ পার্টি প্রভৃতি বামপন্থী দলের অস্তিত্ব এই পর্যায়ে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং এই দলগুলির অধিকাংশ সদস্যই ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে পার্টির শক্তিবৃদ্ধি ঘটান।

এই পর্যায়ের একটি বড় ঘটনা বেঙ্গল লেবা'র পার্টি'র কমিউনিস্ট সদস্যদের কমিউনিস্ট পার্টি'তে যোগদান। ১৯৩৬ সালের গোড়ার দিকে বেঙ্গল লেবার পার্টি'র সমস্ত কমিউনিস্ট সদস্যই ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্ট পার্টি'তে যোগ দেন। লেবার পার্টি'কে অবশ্য তুলে দেওয়া হয়নি। স্থির হয়, বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্যরা লেবার পার্টি'কেই প্রকাশ্য **platform** বা **legal cover** হিসাবে ব্যবহার করবেন। এই মিলনের ফলে লেবার পার্টি'র নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার কমিউনিস্ট পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন, প্রমোদ সেন ও কমল সরকার হন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সদস্য এবং নন্দলাল বসু হন কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য। কিন্তু এই মিলন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মূল রাজনৈতিক মতাদর্শগত ও বিশ্লেষণগত মতপার্থক্য এবং তার সঙ্গে খুঁটিনাটি সাংগঠনিক বিরোধ ক্রমশ ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকায় নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বাধীন সমগ্র লেবার পার্টি' গ্রুপটিই ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে কমিউনিস্ট পার্টি' ছেড়ে বেরিয়ে এসে বলশেভিক পার্টি' অফ ইণ্ডিয়া নামে একটি নতুন পার্টি' গঠন করেন। ১৯৪৪ সালের মে মাসে আবার বলশেভিক পার্টি'র অধিকাংশ সদস্যই ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্ট পার্টি'তে যোগ দেন।[১৫]

কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলন

১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টি'র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির প্রথম সম্মেলন গোপনে অনুষ্ঠিত হয় বেহালার বুড়ো শিবতলায়। গোপনে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার স্বাভাবিক কারণ হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি' তখন বে-আইনী। এই সম্মেলনে শ্রমিক কমিউনিস্ট মন্মথ (মণি) চ্যাটার্জীর জায়গায় গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির দ্বিতীয় সম্মেলন চন্দননগরে গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দেন। তখন বাংলায় ২৫০ জন পার্টি'সভ্য ছিলেন। এই সম্মেলনে নৃপেন চক্রবর্তী প্রাদেশিক পার্টি'র সম্পাদক নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ১৯৩৯ সালেরই শেষভাগে গ্রেপ্তার হওয়া পর্যন্ত তিনিই ছিলেন প্রাদেশিক সম্পাদক। ১৯৩৫ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির তত্ত্বাবধানে গঠিত কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক হন কালী মুখার্জী। ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় প্রাদেশিক পার্টি' সম্মেলনের আগেই কলকাতা জেলা কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে পুনর্গঠিত হয়। কালী মুখার্জীর জায়গায় সরোজ মুখোপাধ্যায় এই কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন।[১৬]

কমিউনিস্ট শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৩৫ সাল থেকে বলা যেতে পারে বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি' ও আন্দোলন তার শৈশবাবস্থা কাটিয়ে উঠে সবে শক্তি সঞ্চয় করছে, কিন্তু তা তখনও এত শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি যা একক ক্ষমতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে পারে। কিন্তু তার শত্রুকে চিনে নিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কোনও ভুল হয়নি। ১৯২৯ সালের "মীরাট

কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা"-সূত্রে কমিউনিস্টদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১৯৩৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৩৫ সালে বাংলা সরকার কমিউনিস্ট পার্টি'র "কলকাতা কমিটি", তার নিয়ন্ত্রণাধীন কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন ও সমস্ত কমিউনিস্ট-মতাবলম্বী সহযোগী সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ১৯৩৬ সালের ২৪ নভেম্বর কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৩৬ জন কমিউনিস্টকে গ্রেপ্তার করে তাঁদের বিরুদ্ধে "কলকাতা কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা" শুরু করে। একই সময়ে আরও ১৪ জন কমিউনিস্টকে গ্রেপ্তার করে তাঁদের বিরুদ্ধে "চেতলা (কলকাতা) রেড গার্ড কেস" শুরু করা হয়। এই দুই মামলায় মোট ৩২ জন কমিউনিস্টের সাজা হয়। ১৯৩৮ সালের প্রথম দিকে তাঁরা সকলেই জেল থেকে ছাড়া পান।[১৭]

জাতীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত এই সময়ের ব্রিটিশ সরকারের গোপন দলিলে দেখা যায় যে, সরকার যাঁরা বিদেশী শাসন এই কারণে ব্রিটিশ সরকারের উৎখাত চান (অর্থাৎ জাতীয় বিপ্লবীদের), তাঁদের থেকেও যাঁরা ধনতান্ত্রিক শাসন এই কারণে সরকারের উৎখাত চান (অর্থাৎ কমিউনিস্টদের) বড় বিপদ বলে মনে করছে এবং শেষোক্তদের (কমিউনিস্টদের) বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করছে।[১৮]

কমিউনিস্ট-আতঙ্ক প্রচারের কাজটি সুচারুরূপে করা হত কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী ***"The Statesman"*** ও অন্যান্য সংবাদপত্রের তরফ হতে। বর্তমান নিবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আমি ১৯৩৬ সালের ১২ জুন ***"The Statesman"*** পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কমিউনিস্ট জুজুর ভয় দেখানো রিপোর্টের উল্লেখ করছি। রিপোর্টটির শিরোনামটিই ছিল আতঙ্ক-উদ্রেককারী—***"Red" Agents in Indian Villages : Recruits From Terrorists · Grave Situation : Armed Uprising Aimed.***[১৯] এই সম্পর্কে অধিকতর মন্তব্য সম্ভবত নিষ্প্রয়োজন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কোনও আশু পরিকল্পনা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, কমিউনিস্টরা এই পর্যায়ে এই ধরনের কোনও প্রচারের কাজেও লিপ্ত ছিলেন না।

বাংলাদেশে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ ঃ ১৯৩৫-১৯৩৯

বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই দ্বিতীয় পর্যায়ে কমিউনিস্টদের কাজকর্মের কোনও বিস্তারিত বিবরণে যাচ্ছি না, কারণ সেটি একটি পৃথক নিবন্ধের বিষয়বস্তু হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এই নিবন্ধের পরিসরে আমি কেবলমাত্র এই পর্যায়ে (১৯৩৫-১৯৩৯) বাংলায় কমিউনিস্টদের কাজকর্মের একটি রূপরেখা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। (১) ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করা এবং এই দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ছিল কমিউনিস্ট কর্মসূচীর অন্তর্গত। (২) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রের (**Federation**) বিরোধিতা এবং ১৯৩৫ সালের "দাস সংবিধান" (**"Slave**

Constitution") বাতিল করার এবং সংবিধান পরিষদ (**Constituent Assembly**) গঠন করার দাবি জানানো ছিল কমিউনিস্টদের এই পর্যায়ের অন্যতম প্রধান কাজ।[২০] (৩) গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার এবং সমস্ত রকমের "কালা কানুন" বাতিল করার দাবিতে লড়াইয়ের সামনের সারিতে ছিলেন কমিউনিস্টরা। (৪) বিনাবিচারে আটক ও সাজা-প্রাপ্ত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের এবং অন্তরীণাবদ্ধ সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে ব্যাপক গণ-আন্দোলনেও কমিউনিস্টদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। (৫) ফ্যাসিবাদের ও যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা এবং তীব্র ফ্যাসিবিরোধিতা ও যুদ্ধ-বিরোধিতা ছিল কমিউনিস্টদের এই যুগের কাজকর্মের অন্যতম প্রধান অঙ্গ।[২১] (৬) ভারতের অন্যান্য স্থানের মত বাংলাদেশেও এই যুগে শ্রমিক আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন এই পর্যায়ের বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনের ও ধর্মঘটের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল ১৯৩৭ সালের ২৬ ফেব্রুআরি থেকে ১০ মে অবধি ৭৪ দিন ব্যাপী দ্বিতীয় সারা বাংলা চটকল শ্রমিক ধর্মঘট। এই যুগের সমস্ত শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটেই কমিউনিস্টদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।[২২] (৭) ১৯৩৬ সালের ১৬-১৭ আগস্ট তারিখে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সংগঠনী কমিটি ১৯৩৭ সালের ২৭-২৮ মার্চ বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়েরে প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার রূপ নেয়। কৃষক আন্দোলনে আসে এক নতুন জোয়ার। এখানেও কমিউনিস্টদের দেখা যায় অগ্রণী ভূমিকায়।[২৩] (৮) ১৯৩৬ সালের ১২ অক্টোবর বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা ছাত্র আন্দোলনেও নতুন করে প্রাণসঞ্চার করে। ছাত্র ধর্মঘট হয়ে ওঠে ছাত্র আন্দোলনের প্রধানতম অঙ্গ। এখানেও প্রথম সারিতে দেখি কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মীদের।[২৪]

জাতীয় ঐক্য, না বামপন্থী ঐক্য : ১৯৩৯

১৯৩৯ সালের কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনের জন্য সুভাষচন্দ্র বসুকে সভাপতি (তখন বলা হত রাষ্ট্রপতি) পদে পুনর্নির্বাচিত করার জন্য কমিউনিস্টরাই প্রথম দাবি জানান ***"National Front"*** পত্রিকার মাধ্যমে।[২৫] ১৯৩৯ সালের ২৯ জানুআরি কমিউনিস্ট পার্টিসহ সমস্ত বামপন্থীদের সম্মিলিত প্রার্থী সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতি (রাষ্ট্রপতি) হিসাবে পুনর্নির্বাচিত হন।[২৬] ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষ বসুর বিরুদ্ধে আনীত পন্থ-প্রস্তাবের বিরোধিতায় কমিউনিস্টরা সামিল হন।[২৭] কিন্তু পন্থ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হবে, না কংগ্রেস সোস্যালিস্টদের মত নিরপেক্ষ থাকা হবে, সেই নিয়ে কমিউনিস্টদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। সি. পি. আই. পলিটব্যুরো প্রথমে সি. এস. পি.'র মত নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু অজয় ঘোষ, সোলি বাটলিওয়ালা এবং সোমনাথ লাহিড়ী, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রমুখ বাংলার প্রতিনিধিদের চাপে কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরী মিটিং ডাকা হয়। ঐ কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং-এ পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্ত বাতিল করে পন্থ-প্রস্তাবের বিরোধিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই ব্যাপারে

সর্বাধিক আগ্রহী ছিলেন বাংলার কমিউনিস্টরা।[২৮] এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা দরকার যে, পন্থ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ভরদ্বাজ, আশরফ প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতারা যে বক্তৃতা দেন, তার থেকে বঙ্কিম মুখার্জী ও নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের ভাষণের সুর ছিল আলাদা। ভরদ্বাজ, আশরফ প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতারা পন্থ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তৃতা দিলেও ঐক্যবদ্ধ জাতীয় নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের বিশেষ বিরূপ সমালোচনা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু বঙ্কিম মুখার্জী ও নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার তাঁদের বক্তৃতায় বামপন্থী ঐক্যের উপর বিশেষ জোর দিয়ে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। ফলস্বরূপ কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের তরফ থেকে তাঁদের তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং তাঁদের বিরুদ্ধে "বাম-সংকীর্ণতার" ও "ঐক্য-বিরোধিতার" অভিযোগ আনা হয়।[২৯]

প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ***National Front*** **(Vol. II, No. 6, March 19, 1939)** পত্রিকায় প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টি'র দুই পলিটব্যুরো সদস্য পি. সি. যোশী ও অজয় কুমার ঘোষের প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি। উদ্ধৃতাংশ বাংলার দুই কমিউনিস্ট নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও বঙ্কিম মুখার্জীর বক্তৃতা ও অবস্থান সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টি'র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহনকারী। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের বক্তৃতা প্রসঙ্গে যোশীর মন্তব্য : **"N. Dutt Mazumdar thought the Old Guard were the Francoes of India.………It was the most sectarian speech of the session, both in approach and content…………One could not imagine a more irresponsible and disruptive speech. Communists have two voices—Bharadwaj and Dutt Mazumdar—which is the real one ? Asked anti-unity elements from among the Socialists. One cannot imagine a comrade doing greater damage to the cause than Dutt Mazumdar."**[৩০] সাধারণ সম্পাদক যোশীর লেখাতেই কমিউনিস্টদের মধ্যে "ত্রিপুরী সঙ্কটে"র পরিপ্রেক্ষিতে দুই পরস্পরবিরোধী মতের অস্তিত্বের স্বীকৃতি মেলে। বঙ্কিম মুখার্জীর বক্তৃতা সম্পর্কে যোশী মন্তব্য করেন : **"Bankim Mukerji spoke as a Left factionalist and not as a serious Bolshevik who had to stand out as a unifier."**[৩১] এই প্রসঙ্গে অজয় ঘোষ লেখেন : **"Comrades Bankim Mukherjee and Dutt Mazumdar forgot our basic slogans of unity, ………and made speeches attributing motives to the Right wing leadership. Their speeches both in content and approach were sectarian and failed to strike the note of unity.**[৩২]

৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সেই পর্যায়ের আলোচনা এই প্রবন্ধের পরিধিভুক্ত নয়।

মূল্যায়ন

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৩৫-১৯৩৯) ছিল "যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্বের বাস্তব রূপায়ণের পর্যায়, কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধির ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিস্তারের পর্যায়, জাতীয়তাবাদী মানসিকতায় কমিউনিস্ট পার্টি ক্রমশ গ্রহণ-যোগ্য হয়ে ওঠার পর্যায়। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টি স্বীকৃতি লাভ করল। কিন্তু এই দ্বিতীয় পর্যায়েই সূত্রপাত ঘটল কংগ্রেস সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির অত্যধিক আস্থার ও অহেতুক মোহের। এই আস্থা-মোহের মাত্রাধিক্যের মধ্যেই নিহিত ছিল পরবর্তীকালের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হওয়া "দক্ষিণ-পন্থী-সংস্কারবাদী" বিচ্যুতির বীজ। দ্বিতীয় পর্যায়ের কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মও এই বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। ঐক্যবদ্ধ জাতীয় নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কংগ্রেস-মোহের এবং পরিণতিতে "দক্ষিণ" ঝোঁকের শিকার হয়ে পড়েছিলেন। তুলনামূলকভাবে কংগ্রেস সম্পর্কে মোহমুক্ত বাংলার কমিউনিস্টরা কংগ্রেসকেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রধান মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করলেও "বিকল্প বামপন্থী নেতৃত্বে"র প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করে বামপন্থী ঐক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় নেতৃত্ব অথবা বামপন্থী ঐক্যভিত্তিক "বিকল্প বামপন্থী নেতৃত্ব"—এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বাংলার কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অবশ্য শেষপর্যন্ত দলীয় শৃঙ্খলার প্রয়োজনে বাংলার কমিউনিস্টরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মত মেনে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্য ও ঐক্যবদ্ধ জাতীয় নেতৃত্বের লাইনই অনুসরণ করেন। ফলে তীব্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার পরিপূরক হিসাবে বামপন্থী ঐক্যভিত্তিক "বিকল্প বামপন্থী নেতৃত্ব" গড়ে তোলা সম্ভবপর হল না।

সূত্রনির্দেশ

১. ভবানী সেন, রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট, ১৯৪৩ সালের ১৮-২১ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত তৃতীয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের শাখা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলনে পঠিত ও সম্মেলনে গৃহীত, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের শাখা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির তরফে নিরঞ্জন সেন কর্তৃক আরও কয়েকটি দলিলসহ বাংলায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯৪৩, পৃ ৭-৮, (প্রথম প্রবন্ধ)। উদ্ধৃতাংশে বানান আমি মূলানুগ রেখেছি। উদ্ধৃতাংশে ব্যবহৃত শব্দের বানানের সঙ্গে এই নিবন্ধের অন্যত্র ব্যবহৃত একই শব্দের বানানের পার্থক্য আছে।

২. তদেব, পৃ ৯।

৩. I. B., File No. 929/35 ; রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—২৭. ১২. ১৯৮৮, ২২.৫.১৯৯০।

৪. R. Palme Dutt and Ben Bradley, *The Anti-Imperialist People's Front*, pp. 1-8 ; R. Palme Dutt and Ben Bradley, 'The Anti-Imperialist People's Front', *Inprecor*, Vol. 16, No. 11, 29 February 1936, pp. 297-300 ; *The Communist*, the Official Organ of the Communist Party of India, (Section of the Communist International). Vol. I, No. 7, March, 1936, Calcutta and Bombay, pp. 23-30.

৫ Ibid., p 4 ; *Inprecor*, p 298 ; *The Communist*, p 25.

৬. Ibid., p 7 ; *Inprecor*, p 299 ; *The Communist*, p 28.

৭. Ibid., p 3 ; *Inprecor*, p 298 ; *The Communist*, p 25.

৮. Gene D. Overstreet and Marshall Windmiller, *Communism in India*, The Perennial Press, Bombay, 1960, p 161.

৯. লেখকের সঙ্গে রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—২. ৫. ১৯৮৬, ১৫. ১. ১৯৮৭ ; লেখকের সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার—৩. ৯. ১৯৮৬।

১০. *National Front*, Vol. II, No. 1, February 12, 1939, Bombay, p 9 ; রণেন সেন, বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০-'৪৮), বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, মে, ১৯৮১, পৃ ১০৫ ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, প্রথম খণ্ড (১৯৩০-১৯৪১), গণশক্তি পত্রিকা দপ্তর, কলকাতা, মে, ১৯৮৫, পৃ ১২৪ ; লেখকের সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার—৩. ৯. ১৯৮৬ ; হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তরী হতে তীর, মনীষা, কলকাতা, মে, ১৯৮৬, পৃ ২৮৩, ২৯০।

১১. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৯০।

১২. 'For the United National Front,' Statement of the Politbureau, Central Committee, Communist Party of India, *The Communist*, Vol. I, No. 15, March, 1937, pp. 1-6 ; T. G. Jacob and P. Bandhu. 'Introduction—Communist Party of India and India's Independence Struggle During the Second World War,' in P. Bandhu and T. G. Jacob (ed.), *War and National Liberation : C. P. I. Documents : 1939-1945*, Odyssey Press, New Delhi, October, 1988, p. XVI.

১৩. নলিনী দাস, স্বাধীনতা-সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বন্দী, মনীষা, কলকাতা, জানুআরি, ১৯৭৪, পৃ ১৪৭।

১৪. সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৩৮-৪১, ১৭৮-৮৩, ২১০, ২৩১ ; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১০০-০১ ; লেখকের সঙ্গে রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—২৮. ৪. ১৯৮৬, ২. ৫. ১৯৮৬, ৬. ৫. ১৯৮৬, ৮. ৫. ১৯৮৬।

১৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন—অমিতাভ চন্দ্র, 'বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি—সংগঠন ও রাজনীতি (১৯৩২-১৯৪৪),' ইতিহাস—অনুসন্ধান, (তৃতীয় খণ্ড), গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কে. পি. বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ ৪৫১-৬৬।

১৬. সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৮৯, ৯৬, ১৩০-৩১, ১৭৯, ২১৩, ২৩১ ; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১২৯-৩০ ; রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—২৮. ৪. ১৯৮৬, ১৫. ১. ১৯৮৭ ; লেখকের সঙ্গে সুধাংশু দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার—১০. ১. ১৯৮৭।

১৭. সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৯৬-৯৭ , রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১০৫।

১৮. Home / Poll. / F. No. 22 / 100 / 1935.

১৯. *The Statesman*, Calcutta, Friday, June 12, 1936, p 2 ; Home / Poll / F. No. 7 / 11 / 1936.

২০. *National Front*, Special A. I. C. C. Number, Vol. I, No. 31, September 18, 1938, Bombay, pp 1, 4; *National Front*, Vol. 1, No. 49, January 22, 1939, p 1 ; Bandhu and Jacob (ed.), op. cit., p XVI.

২১. *To All Anti-Imperialist Fighters : Gathering Storm*, Published by the Central Committee, Communist Party of India, (Section of Comintern), December, 1936, pp 1-16.

২২. Sukomal Sen, *Working Class of India : History of Emergence and Movement (1830—1970)*, K. P. Bagchi and Company, Calcutta, 1979, pp. 348-71 ; Panchanan Saha, *History of the Working-class Movement in Bengal*, People's Publishing House, New Delhi, August, 1978, pp 142-77.

২৩. মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৮২, পৃ ৬৭-১০২।

২৪. গৌতম চট্টোপাধ্যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ, চারুপ্রকাশ, কলকাতা, মার্চ, ১৯৮০, পৃ ৩৬-৫০ ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১০৪।

২৫. *National Front*, Vol. 1, No. 35, October 16, 1938, p 4.

২৬. *National Front*, Vol. 1, No. 51, February 5, 1939, p 1.

২৭. Jaiprakash Narayan and P. C. Joshi, 'On Tripuri,' *National Front*, Vol. II, No. 6. March 19, 1939, p 89.

২৮. রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১১৩-১৪ ; রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—২৮. ৪. ১৯৮৬, ২৭. ১২. ১৯৮৮, ২২. ৫. ১৯৯০ ; লেখকের সঙ্গে গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার—১২. ৬. ১৯৮৬।

২৯. P. C. Joshi, 'Tripuri,' and Ajoy Kumar Ghosh, 'Communists At Tripuri,' *National Front*, Vol. II, No. 6, March 19, 1939, pp 96-97, 100 (Joshi), and p. 101 (A. K. Ghosh) ; Special Branch (S. B.), Government of Bengal—File No. S. R. 506/1939 (Part I).

৩০. P. C. Joshi, 'Tripuri', *National Front*, Vol. II, No. 6, March 19, 1939, p. 97.

৩১. idid., p. 100.,

৩২. A. K. Ghosh., 'Communists At Tripuri', *National Front*, Vol. II, No. 6, March 19, 1939, p. 101.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি : সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪১) : কলকাতা মহানগরী—একটি সমীক্ষা

৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো ইউরোপের মাটিতে। এই বিশ্বযুদ্ধের ছোঁয়া লাগলো ভারতে। বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম পক্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রভুসুলভ মনোবৃত্তি থেকে ভারতীয় জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কোনওরকম পরামর্শ না করে এবং এমনকি ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভাকেও পাশ কাটিয়ে ভারতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে নিলো নিজেদের পক্ষে। স্বাভাবিকভাবেই ভারতবাসী উত্তাল হলো বিক্ষোভে। বিক্ষুব্ধ জনমতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখেই কংগ্রেসসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অনৈতিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের খেয়ালখুশিমত ভারতকে যুদ্ধে সামিল করার বিরোধিতা করে যুদ্ধবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করলো। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের ঐতিহ্য ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থান থেকেই, তীব্র ফ্যাসি-বিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে সম্পূর্ণভাবে "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ" হিসাবে অভিহিত করে এবং ভারতকে অন্যায়ভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে নেওয়ার বিরোধিতা করে সর্বতোভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরোধিতা করতে থাকে। অবশ্য ১৯৪১ সালের ২২ জুন নাৎসী জার্মানি দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধ-সম্পর্কিত অবস্থানের মৌলিক পরিবর্তন হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্বে অর্থাৎ "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ" (১৯৩৯-১৯৪১)-এর যুগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যকলাপের এক কলকাতা মহানগরীভিত্তিক সমীক্ষাই আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। মূল বিষয়বস্তুতে প্রবেশের পূর্বে কলকাতা মহানগরীতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার ও বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা প্রয়োজন।

পূর্বকথা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রকৃত তারিখ হিসাবে কোন্‌টিকে ধরা হবে সেই নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয় বিদেশের মাটিতে, তাশকন্দে, ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর এবং স্বদেশের মাটিতে, কানপুরে, ১৯২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর। বাংলাদেশে বিশের দশকেই ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্ট মতাবলম্বন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ গ্রহণ, কমিউনিস্ট কার্যকলাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার সূত্রপাত হওয়া সত্ত্বেও সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ও স্থায়ীভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার প্রতিষ্ঠা হলো ১৯৩১ সালের গোড়ার দিকে। তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার নাম ছিল "কলকাতা কমিটি,

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অংশ", যদিও প্রকৃতপক্ষে তখনও "কলকাতা কমিটি"র সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কোনও যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি।

সমগ্র ত্রিশের দশক ধরেই ক্রমশ কমিউনিস্ট পার্টি'র সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কংগ্রেস আন্দোলন, জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন প্রভৃতির বহু পরীক্ষিত সৈনিক কমিউনিস্ট পার্টি'তে এসে যোগ দিতে থাকেন। বিভিন্ন ডিটেন্‌শন্ ক্যাম্প-মুক্ত এবং আন্দামান-মুক্ত জাতীয় বিপ্লবীরাই মূলত কমিউনিস্ট পার্টি'র সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধি ঘটান। সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ১৯৩৪সালের জানুআরি মাসে "কলকাতা কমিটি" বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটিতে রূপান্তরিত হয়, অর্থাৎ "কলকাতা কমিটি" নামের পরিবর্তে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি নামকরণ করা হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন জেলা কমিটি গঠিত হতে থাকে। ১৯৩৫ সালে কলকাতা ও হাওড়া জেলায় পার্টি সভ্যসংখ্যা অল্প থাকায় কালী মুখার্জীকে সম্পাদক করে কলকাতা ও হাওড়ার পার্টি সভ্যদের নিয়ে কলকাতা ও হাওড়া জেলার জন্য মিলিতভাবে একটিই জেলা কমিটি গঠন করা হয়—নাম দেওয়া হয় "কলকাতা জেলা কমিটি"। তারপর ১৯৩৫-৩৬ সালে কলকাতায় পার্টি সদস্য বাড়তে থাকায় ১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি কলকাতা জেলা কমিটি ভেঙে কলকাতা ও হাওড়ার জন্য দুটি আলাদা জেলা কমিটি গঠন করা হয়। কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক থাকেন কালী মুখার্জী। ১৯৩৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি'র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির দ্বিতীয় গোপন প্রাদেশিক সম্মেলন হয় চন্দননগরে। এই সম্মেলনের আগেই কলকাতা জেলা কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে পুনর্গঠন করা হয়। কলকাতা-২৪পরগণা-খিদিরপুর-মেটিয়াবুরুজসহ বিস্তীর্ণ এলাকা এই কমিটির অধীনে আসে। একদিকে কাঁচরাপাড়া থেকে বজবজ এবং অপরদিকে বেলেঘাটা থেকে মেটিয়াবুরুজ—এই বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে কলকাতা জেলা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন কালী মুখার্জীর জায়গায় সরোজ মুখার্জী। ১৯৪০ সালে কলকাতা জেলা কমিটি আবার ভেঙে কলকাতা ও ২৪ পরগণার জন্য দুটি পৃথক জেলা কমিটি গঠন করা হয়।[১] সমগ্র ত্রিশের দশকেই এবং চল্লিশের দশকেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র এবং বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান ও রাজনীতি

১৯৩৪ সালের ২৩ জুলাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'কে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার পুরস্কার হিসাবে নিষিদ্ধ ও বেআইনী সংগঠন বলে ঘোষণা করে।[২] সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বেআইনী ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টি তার কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে। মুক্ত জাতীয় বিপ্লবীরা কমিউনিস্ট পার্টি'তে যোগ দেওয়ায় পার্টি'র শক্তিবৃদ্ধি ও মর্যাদাবৃদ্ধি উভয়ই হয়। ১৯৩৫ সালের আগস্ট মাসে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে গৃহীত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সাধারণ সম্পাদক জর্জি

ডিমিট্রভের "*United Front*" ("যুক্তফ্রন্ট") তত্ত্ব অনুযায়ী এবং ১৯৩৬ সালের ২৯ ফেব্রুআরি ***International Press Correspondence (Inprecor)***-এ প্রকাশিত রজনী পাম দত্ত ও বেন ব্রাডলি-র লেখা ***"The Anti-Imperialist People's Front"*** তত্ত্ব অনুযায়ী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পূর্বের সংকীর্ণতাবাদী অবস্থান পরিত্যাগ করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মূল স্রোতের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করে। বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে ও কংগ্রেসে যোগ দেন এবং অনেকক্ষেত্রে কংগ্রেসের মধ্য পদে ও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির উচ্চ পদেও আসীন হন। "যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্ব গ্রহণের পর থেকেই সি. পি. আই. সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় ঐক্যের উপর বিশেষ জোর দিতে থাকে। বামপন্থী ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও সি. পি. আই. মূলত জোর দেয় ঐক্যবদ্ধ জাতীয় নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনের জন্য সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেস সভাপতি (তখন বলা হতো রাষ্ট্রপতি) পদে পুনর্নির্বাচিত করার জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম দাবি জানায় তাদের মুখপত্র ***"National Front"*** পত্রিকার মাধ্যমে।[৩] ১৯৩৯ সালের ২৯ জানুআরি কংগ্রেস সভাপতি (রাষ্ট্রপতি) নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টিসহ সমস্ত বামপন্থীদের সম্মিলিত প্রার্থী হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজী ও দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীদের মনোনীত প্রার্থী ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়াকে ১৫৮০-১৩৭৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হন।[৪] ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে আনীত পন্থ-প্রস্তাবের বিরোধিতায় কমিউনিস্টরা সামিল হন।[৫] কংগ্রেস দক্ষিণপন্থীদের নিরবচ্ছিন্ন বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৯ সালের ২৯ এপ্রিল কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন।[৬] ১৯৩৯ সালের ৩ মে সুভাষ বসু ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন।[৭] কমিউনিস্টরা এই সময় অবধি বিভিন্ন প্রশ্নে সুভাষ বসুকে সমর্থন করলেও ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেননি, যদিও একসঙ্গে আন্দোলন করেছেন। ৯ জুলাই সুভাষ বসুর নেতৃত্বাধীনে বামপন্থী সমন্বয় কমিটি (যার মধ্যে কমিউনিস্টরাও ছিলেন) "সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস" পালন করেন। দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে অনিবার্য সংঘাতের পরিণতি হিসাবে সুভাষ বসুর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ১২ আগস্ট ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠকে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে সুভাষচন্দ্র বসুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ থেকে এবং কংগ্রেসের সমস্ত পদ থেকে অপসারিত করা হয় এবং ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাস থেকে তিন বছরের জন্য সুভাষ বসুর পক্ষে কংগ্রেসের কোনও পদ গ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।[৮] কংগ্রেস থেকে প্রায় বিতাড়িত অপমানিত সুভাষ বসু কংগ্রেসের বামপন্থীদের এক অংশ নিয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করলেন এবং কংগ্রেসের বাইরে এক পৃথক বামপন্থী দল হিসাবে ফরওয়ার্ড ব্লককে সংগঠিত করলেন। সুভাষ বসুর এই কাজ কিন্তু কমিউনিস্টদের অনুমোদন পেল না। কমিউ-নিস্টরা ঐক্যবদ্ধ জাতীয় নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে কংগ্রেসে

থেকে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সুভাষচন্দ্রের প্রতি দক্ষিণপন্থীদের ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করলেও সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লককে পৃথক দল হিসাবে সংগঠনের সিদ্ধান্তের সমালোচনা ও বিরোধিতা করেন।[৯] এটাই ছিল সি. পি. আই.-এর তৎকালীন **"যুক্তফ্রন্ট"** রাজনীতির বাস্তব ও ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক। এই রকম এক পরিস্থিতিতে শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—প্রথম পর্যায়

"সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ" : ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯—২২ জুন ১৯৪১—কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যকলাপ—কলকাতা

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর নাৎসী জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে এবং ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স দীর্ঘদিন অনুসৃত নাৎসীতোষণ নীতি পরিত্যাগ করে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে সেইদিন থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অধীনস্থ দেশ ভারতকেও নিজেদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বলে ঘোষণা করে। জোর করে ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে নেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভারতীয় জনগণ ও নেতৃবৃন্দ। আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আসন্ন যুদ্ধের বিরোধিতা করতে থাকে এবং ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে নেওয়ার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টা সম্বন্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করতে থাকে, যার প্রমাণ পাওয়া যায় ***"National Front"***-এর পাতায় এবং কমিউনিস্ট পার্টি-প্রকাশিত বিভিন্ন লেখায় ও ইস্তাহারে এবং কমিউনিস্ট নেতাদের বক্তৃতায়। ***"National Front"*** পত্রিকার (কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র) ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সংখ্যার **"India must resist war"** শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়—**"But India's determination to resist War must not be slackened……And as long as there is a single Congressman** (মনে রাখতে হবে, তখন কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের মধ্যেই ছিলেন—প্রবন্ধকারের সংযোজন), **as long as there are millions of our Countrymen full of hatred against Imperialism war-resistance must continue."**[১০] ১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার সুদৃঢ় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থান থেকেই, তীব্র ফ্যাসিবিরোধী ও নাৎসীবিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে সম্পূর্ণভাবে "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ" হিসাবে চিহ্নিত করে এবং ভারতকে প্রভুসুলভ মনোবৃত্তি থেকে অন্যায়ভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে নেওয়ার বিরোধিতা করে সর্বতোভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরোধিতা করতে থাকে। বর্তমান নিবন্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই প্রথম পর্যায়ে ভারতের কমিউনিস্ট

পার্টির যুদ্ধ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী ও অবস্থান বিশ্লেষিত হবে এবং কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধ-বিরোধী বিভিন্ন কার্যকলাপ ও আন্দোলনের এক কলকাতাভিত্তিক আলোচনা করা হবে।

"এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ—এই যুদ্ধে কোনও সহযোগিতা নয়"—কমিউনিস্ট পার্টি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই প্রথম পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টির মূল রাজনৈতিক স্লোগান্ ও বক্তব্যই ছিল—

"এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ—এই যুদ্ধে কোনও সহযোগিতা নয়"—

"ইয়ে লড়াই সাম্রাজশাহী,
হম না দেঙ্গে এক পাই,
না এক পাই, না এক ভাই।"
("এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, এই যুদ্ধে একটি
পয়সাও নয়, একজন ভাইও নয়।")[১১]

পার্টি মুখপত্র ***"National Front"*** পত্রিকার ৮ অক্টোবর ১৯৩৯ সংখ্যায় এই যুদ্ধকে **"The Second Imperialist War"** আখ্যা দিয়ে লেখা হলো—

"No. This is not a war for democracy. It is the second imperialist war, the heir and the successor of the first of 1914-18.[১২]

কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে বিভিন্ন যুদ্ধ-বিরোধী পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা ও ইস্তাহার প্রকাশ করা হতে থাকে। এগুলির প্রত্যেকটিরই মূল সুর ছিল যুদ্ধবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ফ্যাসিবিরোধী। কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ স্তরের তাত্ত্বিক নেতা ডঃ গঙ্গাধর অধিকারীর লেখা **"The Second Imperialist War"** বইটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ এই বইটিতে কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধ-সম্পর্কিত তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরা হয়েছে। অধিকারীর লেখা এই বইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে "দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ" আখ্যা দিয়ে স্লোগান্ তোলা হয়—**"Convert Imperialist War into a Democratic War."**[১৩] বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকারের আদেশে নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।[১৪]

"সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যুদ্ধের সংকটকে ব্যবহার করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-সংগ্রামেব মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পথে অগ্রসর হও।" কমিউনিস্ট পার্টি

১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধ-বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষভাবে জোর দেয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যুদ্ধের সংকটকে ব্যবহার করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-সংগ্রামের মাধ্যমে

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রশ্নটির উপর। পার্টি ভারতজোড়া তীব্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করার পক্ষে দেশব্যাপী প্রচার অভিযান চালাতে থাকে।

১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র পলিটব্যুরোর পক্ষ থেকে এক বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবটির নাম ছিল—***"Statement of the Polit-Bureau on C.P.I. Policy and Tasks in the period of war*।"** প্রস্তাবটিতে যুদ্ধ এবং যুদ্ধকালীন সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার, কংগ্রেস নেতৃত্ব, কংগ্রেস দল এবং আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র মূল্যায়ন এবং যুদ্ধকালীন সময়ে দলের ভূমিকা প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। প্রস্তাবটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে "দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ" হিসাবে অভিহিত করে যুদ্ধকালীন সময়ে যুদ্ধের সংকটকে পরিপূর্ণ ব্যবহার করে দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-সংগ্রাম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের কথা বলা হয়। সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটির অপর একটি মুখপত্র ***"The Communist"*** পত্রিকার নভেম্বর ১৯৩৯ সংখ্যায় (দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা) প্রকাশিত হয়।[১৫] যুদ্ধ সম্পর্কে এবং যুদ্ধকালীন সময়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টি'র দৃষ্টিভঙ্গীর ও বিশ্লেষণের এক সম্যক চিত্র তুলে ধরার জন্য (আমি) উক্ত রাজনৈতিক প্রস্তাবের অংশবিশেষ (আমার) এই প্রবন্ধটিতে উদ্ধৃত করছি।

রাজনৈতিক প্রস্তাবটির শুরুতেই বলা হয়—**The war that is raging in Europe today is not a war of democracy against fascism. It is an imperialist war—the second imperialist war, the heir and successor of the last Great War of 1914-18."**[১৬] রাজনৈতিক প্রস্তাবটির একটি পরিচ্ছেদের শিরোনামায় স্লোগান তোলা হয়—**"Revolutionary Fight for Peace —Transform Imperialist War into Civil War—Defend the Soviet Union."**[১৭] প্রস্তাবে লেনিনীয় পদ্ধতিতে "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ"কে 'গৃহযুদ্ধে' পরিণত করার আহ্বান জানানো হয়, আহ্বান জানানো হয় 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে'র পরিস্থিতিতে জাতীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চরম ও চূড়ান্ত আঘাত হানার। প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশে **"National Political Tasks"** শিরোনামায় বলা হয়—**'Revolutionary utilisation of the war crisis for the achievement of national freedom—this is the central task before the national forces in the new period."**[১৮] প্রস্তাবে **"The Revolutionary Perspective"** শিরোনামায় বলা হয়—**"Thus opens up the perspective of transformation of imperialist war into war of national liberation.**

This perspective must be brought before the entire national movement.·········Capture of powar is an *immediately realisable*

goal—a goal for which preparations must be begun in right earnest."[১৯] প্রস্তাবে স্লোগান তোলা হয়—"Give Proletarian Impress to the National Struggle."[২০] প্রস্তাবে কংগ্রেস নেতৃত্বের আপসকামী ও দোদুল্যমান চরিত্রের তীব্র সমালোচনা করা হয়—"·········the dominant leadership of the Congress does not want to use the weapon of mass struggle; it wants to utilise the war crisis for striking a hard bargain with imperialism without struggle."[২১] যদিও দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণআন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গোপন আপসরফায় আগ্রহী, তবুও সংগ্রামটা করতে হবে কংগ্রেসের ভেতরে থেকেই, কংগ্রেসের বাইরে গিয়ে নয়, বা কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে নয়, বরঞ্চ কংগ্রেসকেই সমগ্রভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণআন্দোলনের পথে টেনে আনতে হবে—"All our anti-war activities to-day (during the period of the continuance of the stalemate), viz., protest strikes, local anti-war actions, demonstrations, mass distribution of literature, anti-war propaganda must have as their main objective, the creation of such powerful anti-war sentiment among the people in general and the masses of Congressmen in particular as would move the Congress itself towards struggle."[২২] "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে"র যুগে কমিউনিস্ট পার্টি'র মূল কাজ হচ্ছে দেশব্যাপী গণআন্দোলনকে একটি বৈপ্লবিক চরিত্র প্রদান করা এবং সেটা করতে হবে কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই—"Henceforth our chief task shall be to give the mass movement revolutionary content and form······We shall be able to direct the movement into revolutionary channels only in the measures in which we have embedded ourselves in the Congress and have won confidence of the masses of Congressmen by our leadership of the existing forms of struggle decided upon by the Congress."[২৩] কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করলেও রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে কংগ্রেসের কোনও সমালোচনা করেনি, বরং বারংবার কংগ্রেসের সাংগঠনিক ঐক্যের উপর জোর দিয়েছে এবং কংগ্রেসত্যাগীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছে। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি'র অন্যতম প্রধান আহ্বান ছিল—গান্ধীবাদী অহিংসার সংস্কারকামী চালচিত্র ভেঙ্গে দিতে হবে, কংগ্রেসকে কিছুতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসরফা করতে দেওয়া চলবে না।

"সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে"র যুগে ১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪১ সালের ২২ জুনের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটি ও বিভিন্ন প্রাদেশিক কমিটির তরফ থেকে আরও বহু প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং আরও বহু পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা ও ইস্তাহার প্রকাশিত হয়।

সবকটি প্রস্তাব, পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা ও ইস্তাহারেরই মূল বক্তব্য ছিল "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে"র তীব্র বিরোধিতা এবং যুদ্ধকালীন সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিগত সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনকে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সুতীব্র করে তোলার কথা বলা এবং এই জন্য জাতীয় নেতৃত্বের বিভিন্ন ত্রুটিবিচ্যুতি এবং সংস্কারমুখী আপসকামিতা সত্ত্বেও সংগ্রামের প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় নেতৃত্বের ও জাতীয় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ। যেহেতু ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে পার্টি পলিটব্যুরো কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রস্তাবটির মূল সুর পরবর্তী সবকটি প্রস্তাব, পত্র-পত্রিকা ও ইস্তাহারেই অক্ষুণ্ণ ছিল, সেইহেতু সেগুলির উল্লেখ করে ও সেগুলি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে (আমার) প্রবন্ধকে আর অনাবশ্যক দীর্ঘায়ত করছি না।

তবুও কমিউনিস্ট পার্টি'র তরফ থেকে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত দুটি পুস্তিকা বা দলিলের অন্তত উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। একটি পুস্তিকা ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়—নাম ছিল **"*The Proletarian Path—Inside The National Front*". "*The Proletarian Path*"** দলিলটির লেখক ছিলেন সম্ভবত অজয় কুমার ঘোষ এবং দলিলটি পি. সি. যোশী (পার্টি'র তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক), গঙ্গাধর অধিকারী, অজয় কুমার ঘোষ এবং আর. ডি. ভরদ্বাজ—এই চার সদস্যের সর্বোচ্চ সংস্থা পলিটব্যুরো কর্তৃক গৃহীত হয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির নামে প্রকাশিত হয়। **"*The Proletarian Path*"** দলিলটির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একদিকে যুদ্ধ-বিরোধিতার ও যুদ্ধকালীন সময়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই **"বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল"** (**"Revolutionary Seizure of State Power"**) করার কথা বিশেষ জোরের সঙ্গে ও গুরুত্ব সহকারে বলা হয় ও তার রূপরেখা নির্ধারণের চেষ্টা করা হয় এবং অপরদিকে **"প্রামাণিক ভারতকেন্দ্রিক কমিউনিজম"** (**"Authentic Indo-Centric Communism"**)-এর উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় অর্থাৎ কমিউনিজমের যান্ত্রিক প্রয়োগ নয়, সঠিক চিন্তাভাবনার মাধ্যমে ভারতের বাস্তব আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণভাবে কমিউনিস্ট তত্ত্ব প্রয়োগ করার কথা এবং কমিউনিস্ট পার্টি'র কর্মপ্রণালী স্থির করার কথা বলা হয়।[২৪]

অপর পুস্তিকাটিও ১৯৪০ সালের মার্চ মাসেই প্রকাশিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত এই পুস্তিকাটি ছিল পি. সি. যোশী, গঙ্গাধর অধিকারী ও অজয় কুমার ঘোষের কয়েকটি প্রবন্ধের সমাহার—নাম ছিল **"*Unmasked—Parties & Politics —Communists Call a Conference—To Discuss War & India's Independence*".** এই পুস্তিকার প্রবন্ধগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি'র তরফ থেকে তৎকালীন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পার্টি'র রাজনৈতিক বিচার বিশ্লেষণ ও কর্মসূচীর সমীক্ষা করা হয় এবং বামপন্থীদের অনৈক্যের মূল কোথায়, তা ব্যাখ্যা করা হয়। প্রবন্ধগুলির সুর ছিল অত্যন্ত আক্রমণাত্মক। এই দলিলের প্রবন্ধগুলিতে কংগ্রেস নেতা গান্ধীজী, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট

পার্টি নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ, লীগ অব্ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন (১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে নাম হয় র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পীপ্‌ল্‌'স্‌ পার্টি)-এর নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর তীব্র ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা করা হয়। বলা হয়, মুখে যতই আন্দোলনের কথা বলুন, এঁদের কেউই প্রকৃত অর্থে যুদ্ধের সুযোগে স্বাধীনতার জন্য ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তুলবেন না।[২৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে রামগড়ে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সময় রামগড়েই সুভাষচন্দ্র বসু পাল্টা **"Anti-Compromise Conference"** বা "আপস-বিরোধী সম্মেলন" করেন। কমিউনিস্টরা সুভাষচন্দ্র বসুর "আপস-বিরোধী সম্মেলনে" যোগ না দিয়ে মূল কংগ্রেস অধিবেশনেই যোগ দেন।[২৬]

কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধ-বিরোধিতার নীতি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম কিভাবে বাস্তবায়িত করেছিল

যুদ্ধ-বিরোধিতার নীতি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম বাস্তবায়িত করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর জোর দিয়েছিল।

(১) কমিউনিস্ট পার্টি সারা ভারতে ব্যাপক যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার অভিযান চালিয়েছিল। সর্বত্র প্রচার অভিযানে কমিউনিস্ট পার্টির স্লোগান ছিল—"এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ—এই যুদ্ধে কোনও সহযোগিতা নয়—যুদ্ধে একটি পয়সাও নয়, একজন ভাইও নয়।"

(২) যুদ্ধ-বিরোধী ব্যাপক প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্ট পার্টি আপসহীন, তীব্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করার পক্ষে ভারতজোড়া প্রচার চালাতে থাকে।

(৩) কমিউনিস্ট পার্টি এই সময়ে বিশেষভাবে জোর দিয়েছিল **"আঞ্চলিক সংগ্রাম"** (**"Local Struggles"**) ও **"আংশিক সংগ্রাম"** (**"Partial Struggles"**) গড়ে তোলবার উপর, যাতে এই সংগ্রামগুলিকেই ভারতব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত করা যায়।

(৪) কমিউনিস্ট পার্টি সারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ-বিরোধী শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘট ও যুদ্ধ-বিরোধী সাধারণ ধর্মঘট করার চেষ্টা চালাতে থাকে এবং এই ধরনের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতে থাকে। "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে"র বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রামী ভূমিকায় নামাবার কর্মসূচী অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে বোম্বাইয়ের ৯০,০০০ সুতাকল শ্রমিক ১৯৩৯ সালের ২ অক্টোবর একদিনের একটি প্রতীক যুদ্ধ-বিরোধী ধর্মঘটে সামিল হন—কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে অনুষ্ঠিত এই ধর্মঘটই ছিল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকালীন সময়ে সারা বিশ্বে যুদ্ধ-বিরোধী প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট। ভারতের বিভিন্ন স্থানে কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে আরও বহু যুদ্ধ-বিরোধী শ্রমিক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়।

(৫) যুদ্ধকালীন সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি জোরদার শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায় এবং নিজস্ব অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য শ্রমিক-কৃষককে লড়াই করতে ও শ্রমিকদের ধর্মঘট করতে উৎসাহিত করতে থাকে।

(৬) রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রচার অভিযান চালাতে থাকে এবং আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করতে থাকে।

(৭) এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, "*The Proletarian Path*" দলিলে **"সশস্ত্র গণ-উত্থানে"**র কথা এবং **"বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে"**র কথা বলা হলেও বাস্তবে পার্টির পক্ষ থেকে ভারতে কোথাও সে-ধরনের কোনও প্রচেষ্টা চালানো হয়নি, সে-ধরনের প্রচেষ্টা চালানোর মত শক্তিও পার্টির তখন ছিল না। পুরো ব্যাপারটা প্রচারের স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল।[২৭]

যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার অভিযান সংগঠিত করা এবং যুদ্ধকালীন সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালানোর চেষ্টার অভিযোগে বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির উপর নেমে এল চরম সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাস। ব্রিটিশ চণ্ডনীতির শিকার হলেন কমিউনিস্টরা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকেই তৎকালীন প্রধান বিপদ বলে চিহ্নিত করে ১৯৪০সালের ১৫ মার্চ সরকারি ঘোষণাপত্র জারি করলো যে "সরকার ভারতরক্ষা আইনে সর্বত্র কমিউনিস্টদের গ্রেফ্‌তারের নির্দেশ দিয়েছে, কারণ কমিউনিস্টরা বিপ্লবী প্রচার ও অন্যান্য কার্যকলাপের মাধ্যমে ভারতের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করছে ও যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে প্রাণপণে ব্যাহত করছে।" কয়েক মাসের মধ্যেই সারা ভারতে ৫০০-রও উপর কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মী গ্রেফ্‌তার হলেন, কিন্তু কমিউনিস্টরা গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা এড়িয়ে আত্মগোপন করে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন।[২৮]

"সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে"র যুগে কমিউনিস্ট পার্টির ক্রিয়াকলাপ—কলকাতা—৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯—২২ জুন ১৯৪১ : কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার অভিযান ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়া

১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি ও তার অন্তর্ভুক্ত কলকাতা জেলা কমিটিসহ বিভিন্ন জেলা কমিটি এই যুদ্ধকে "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ" আখ্যা দেয় এবং ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসের পার্টি পলিটব্যুরো কর্তৃক গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাব অনুসারে সর্বতোভাবে যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরোধিতা করে কলকাতাসহ বাংলার সর্বত্র তাদের শক্তি অনুযায়ী তীব্র যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার অভিযান শুরু করে এবং যুদ্ধ-বিরোধী ও স্বাধীনতা-অভিমুখী আন্দোলন শুরু করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। অবশ্য এই স্তরে যুদ্ধ-বিরোধিতা প্রকৃত আন্দোলনের পরিবর্তে প্রচার অভিযানের মধ্যেই অধিকতর সীমাবদ্ধ ছিল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি এবং কলকাতা জেলা কমিটিসহ অন্যান্য জেলা কমিটির তরফ থেকে একের পর এক যুদ্ধ-বিরোধী পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা ও ইস্তাহার প্রকাশিত হতে থাকে। প্রতিটিতেই যুদ্ধ-উদ্যোগকে সম্পূর্ণ বানচাল করে দেওয়ার কথা বলা থাকে এবং থাকে আশু সংগ্রাম শুরু করার আহ্বান। এই ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় নেতাদের তুলনায় বাংলার কমিউনিস্ট নেতৃত্বের আগ্রহ ছিল আরও বেশী এবং মনোভাবও ছিল

আরও বেশী জঙ্গী। এমনকি নিজেদের চেষ্টায় অন্তত কলকাতাসহ বাংলার জায়গায় জায়গায় যুদ্ধ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করার ভাবনাচিন্তাও বাংলার কমিউনিস্ট নেতারা করছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে মোহমুক্ত বাংলার কমিউনিস্টরা বারংবার সুভাষচন্দ্র বসুকে সংগ্রাম শুরু করতে বলেন এবং সুভাষ বসুর সঙ্গে একযোগে বাংলায় যুদ্ধ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ-গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুমতিও চেয়েছিলেন।[২৯] কিন্তু ব্যাপারটা ভাবনাচিন্তার স্তরেই আবদ্ধ রইল। কমিউনিস্ট পার্টি'র সর্বভারতীয় নেতৃত্ব কংগ্রেসের ভেতরে থেকেই, কংগ্রেসের নামে এবং কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে নিয়েই আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন, কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে নিজেদের উদ্যোগে নয়। সুতরাং পার্টি'র সর্বভারতীয় নেতৃত্বের সুস্পষ্ট নির্দেশের অভাবে ও নিজেদের শক্তির অভাবে বাংলার কমিউনিস্টদের পক্ষে নিজেদের চেষ্টায়, এমনকি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তাঁর সঙ্গেও, আন্দোলন শুরু করে দেওয়া সম্ভব হয়নি,[৩০] যদিও আন্দোলনের ডাক দেওয়া অব্যাহত ছিল।

সুতরাং কলকাতায় তথা সারা বাংলায় (এমনকি সারা ভারতেও) "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে"র যুগে কমিউনিস্ট পার্টি'র যুদ্ধ-বিরোধিতার মূল অস্ত্র ছিল ব্যাপক যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার এবং যুদ্ধ-বিরোধী পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা ও ইস্তাহার প্রকাশ। অবশ্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে কমিউনিস্ট পার্টি'র ডাকে এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন যুদ্ধ-বিরোধী শ্রমিক ধর্মঘট হয় যার মধ্যে সর্বপ্রথমটির উল্লেখ আগেই করেছি। এই প্রসঙ্গে কলকাতার আলোচনায় পরে আসছি।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার একদিন আগে কমিউনিস্ট নেতা মহম্মদ ইসমাইল কর্তৃক প্রকাশিত "*The Comrade*" সাপ্তাহিকের ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সংখ্যায় "Let India unite for her historic task of non-violent resistance to war" শীর্ষক প্রবন্ধে আশু যুদ্ধের চরিত্র বিশ্লেষণ করে যুদ্ধ-বিরোধিতার আহ্বান জানানো হয়। সংখ্যাটি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।[৩১] এখানে (আমি) কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত যে-কটি পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা ও ইস্তাহারের উল্লেখ করবো, তার সবকটিই ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টি'র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির তরফ থেকে **"সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও কমিউনিস্ট পার্টি'র ঘোষণা"** নামে একটি বাংলা পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। পুস্তিকাটিতে **"সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রতিরোধের"** ও **"স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে"**র আহ্বান জানানো হয়।[৩২] বেঙ্গল সেণ্ট্রাল জুট মিল মজদুর ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট, কমিউনিস্ট নেতা ও এম. এল. এ. বঙ্কিম মুখার্জীর স্বাক্ষরিত **"যুদ্ধের বাজারে চটকল শ্রমিকের সংগঠন, দাবি-ও-লড়াই"** শীর্ষক ইস্তাহার প্রকাশিত হলো ১৯৩৯ সালের অক্টোবরে। ইস্তাহারে চটকল শ্রমিকদের সংগঠিত হতে এবং দাবি আদায়ের জন্য লড়াইয়ে নামতে আহ্বান জানানো হলো।[৩৩] "নভেম্বর বিপ্লব" দিবসে কমিউনিস্ট পার্টি'র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির তরফ থেকে **"জমি, খাদ্য ও বস্ত্র এবং স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ শুরু করা"**র এবং **"ভারতে**

বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া"র আহ্বান জানিয়ে ইস্তাহার প্রকাশ করা হলো—নাম "যুদ্ধের সময় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ কর"।[৩৪] ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টি'র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির গোপন বাংলা মুখপত্র হিসাবে নবপর্যায়ে "বলশেভিক" প্রকাশিত হলো। প্রকাশিত প্রথম দুটি সংখ্যাই চরম "রাজদ্রোহিতা"র অভিযোগে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। নবপর্যায়ের "বলশেভিক" পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালের · নভেম্বর—সংখ্যাটি ছিল বিশেষ "নভেম্বর বিপ্লব" সংখ্যা। এই সংখ্যায় "মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পরিণতিতে জাতীয় সংগ্রামের পথে অগ্রসর হও" ("Move forward in the national struggle, Consequent on the resignation of the Ministries") শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির তরফ থেকে জনগণের কাছে আহ্বান রাখা হয়—"সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা কর" এবং "রাজনৈতিক ধর্মঘটের পথে অগ্রসর হও—যুদ্ধ-বিরোধী সংগ্রামকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে পরিণত কর।"[৩৫] "বলশেভিক" পত্রিকার প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালের ৩০ নভেম্বর। এই সংখ্যায় "নিষ্ক্রিয়তার অবসান হোক" ("Inactivity must end") শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির তরফ থেকে কংগ্রেস দক্ষিণপন্থী ও কংগ্রেস বামপন্থী উভয়েরই সমালোচনা করে এবং কংগ্রেসের সংগ্রাম-বিরোধী মনোভাবের তীব্র নিন্দা করে জনগণের কাছে "আশু খাজনা-বন্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার এবং দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট করার জন্য দেশে জাতীয় বৈপ্লবিক পরিস্থিতি গড়ে তোলার" আহ্বান জানানো হয় এবং "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক" আওয়াজ তোলা হয়।[৩৬] ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টি'র কলকাতা জেলা কমিটির তরফে প্রকাশিত হলো বাংলা ইস্তাহার—"যানবাহন শ্রমিকদের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টি'র ডাক"। ইস্তাহারে বলা হলো—যেহেতু "যানবাহন শ্রমিকরাই হচ্ছে এই দেশে ব্রিটিশ শাসনের মেরুদণ্ড", সেহেতু তারাই পারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চরম আঘাত হানতে, ব্রিটিশ যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে স্তব্ধ করে দিতে। ইস্তাহারে আহ্বান জানানো হলো—"সমস্ত মানুষের মধ্যে সব জায়গায় বৈপ্লবিক পরিস্থিতি তৈরি কর। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হও।"[৩৭] ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির তরফে প্রকাশিত হল আর একটি ইস্তাহার—"চটকলের মজুর ভাই-বোনেরা—যুদ্ধের সময় তোমাদের সব দাবি আদায় কর এবং লাল ঝাণ্ডার তলায় লড়াই কর।" ইস্তাহারে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য এবং যুদ্ধ-বিরোধিতার উদ্দেশ্যে চটকল শ্রমিকদের সংগ্রাম শুরু করার আহ্বান জানানো হয়।[৩৮]

১৯৪০ সালের ২৬ জানুয়ারি "স্বাধীনতা দিবস" পালনের আহ্বান জানিয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির তরফ থেকে দুটি ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। প্রথমটির নাম ছিল "২৬ জানুয়ারি, শুক্রবার—স্বাধীনতা দিবস—কমিউনিস্ট পার্টি'র ঘোষণা"

এবং দ্বিতীয়টির নাম ছিল "স্বাধীনতা দিবস এবং বাংলাদেশের প্রত্যেক নরনারীর কাছে কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন"। দুটি ইস্তাহারেরই মূল বক্তব্য ছিল —"সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ প্রতিহত কর", "যুদ্ধ-বিরোধী জাতীয় সংগ্রাম গড়ে তোল", "বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসকে নিষ্ক্রিয় হতে দেওয়া চলবে না", "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ধ্বংস হোক", "অর্ডিন্যান্স-রাজ নিপাত যাক", "আপস চাই না, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাও" প্রভৃতি।[৩৯] ১৯৪০ সালের জানুআরি মাসেই কমিউনিস্ট পার্টি'র কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ হতে দুটি ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। প্রথমটির ভাষা ছিল ইংরেজি—নাম ছিল *"Communist Party's Call to the Students"* এবং দ্বিতীয়টির ভাষা ছিল বাংলা—নাম ছিল "ছাত্রদের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টি'র আহ্বান" (*"Communist Party's Call to the Students"*)। দুটি ইস্তাহারেরই মূল বক্তব্য ছিল—"বাংলা সরকার যুদ্ধের সুযোগে দেশবাসীর সমস্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতা কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র করেছে। তার বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকেই সংগ্রামী প্রতিরোধের পথে এগিয়ে আসতে হবে। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব আপসের পথে পা বাড়িয়েছেন, আর ফরওয়ার্ড ব্লক গরম গরম বুলি ছাড়লেও কার্যক্ষেত্রে কিছুই করছেন না। ছাত্রদেরই তাই ছড়িয়ে পড়তে হবে কারখানার গেটে, বস্তিতে, গ্রামে সর্বত্র—সংগঠিত করতে হবে ধর্মঘট ও মিছিল, বানচাল করে দিতে হবে দমননীতির রাজত্বকে—প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার।[৪০] ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে কমিউনিস্ট পার্টি'র কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ হতে আর একটি ইস্তাহার প্রকাশিত হয়—"জাহাজী, পোর্ট ও ডক মজুরদের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বান"। এই ইস্তাহারে জাহাজী, পোর্ট ও ডক মজুরদের কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চরম আঘাত দেওয়ার আবেদন জানানো হয় এবং বলা হয় তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলন শুরু করতে। ইস্তাহারে "ভারত সরকারের কালা অর্ডিন্যান্স বাতিল করার" দাবি জানানো হয় এবং "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করে ও ব্রিটিশ শাসনকে ধ্বংস করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার" আহ্বান জানানো হয়।[৪১] এর পরেও ১৯৪১ সালের ২২ জুন পর্যন্ত "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে"র যুগে যুদ্ধ-বিরোধিতা করে এবং যুদ্ধকালীন সময়ে দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দেশব্যাপী রাজনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির ও কলকাতা জেলা কমিটির তরফে আরও বহু পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা ও ইস্তাহার প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। (আমি) সেগুলির উল্লেখ করে প্রবন্ধের আয়তন আর বর্ধন করছি না।

কমিউনিস্ট পার্টি শুধু আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল, আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেছিল, কিন্তু স্থানীয় ভিত্তি ছাড়া ও আংশিক স্তর ছাড়া এবং কিছু কিছু কল-কারখানা

ছাড়া কোথাও আন্দোলন শুরু করেনি। শুরু করার প্রস্তুতিও পার্টির তরফ থেকে বিশেষ নেওয়া হয়নি। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার শত্রুকে চিনে নিতে কোনও ভুল করেনি। ১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে কুখ্যাত ভারত রক্ষা আইন (*Defence of India Act*) জারি করে।* সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্ট পার্টির উপর দমননীতির আঘাত লাগতে আরম্ভ করে। ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাস থেকে ব্রিটিশ সরকার বামপন্থীদের উপর সংগঠিত আক্রমণ শুরু করে। সর্বপ্রথম আক্রমণ নেমে আসে কমিউনিস্টদের উপর। কলকাতা, বোম্বাই, লাহোর, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে কমিউনিস্টদের গ্রেফ্‌তার করা, এইসব জায়গা থেকে কমিউনিস্টদের উপর বহিষ্কার আদেশ প্রভৃতি শুরু হয়ে যায়। ১৯৪০ সালের ১৫ মার্চ সরকারি ঘোষণাপত্রে ভারতের সর্বত্র ভারত রক্ষা আইনে কমিউনিস্টদের গ্রেফ্‌তারের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই ঘোষণাপত্রের উল্লেখ আগেই করেছি। এর আগেই ১৯৪০ সালের ফেব্রুআরি মাসে শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ১৯৪০ সালের ফেব্রুআরি মাসেই বাংলা সরকার মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সোমনাথ লাহিড়ী (অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য), পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী (কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তৎকালীন সহ-সম্পাদক), ভবানী সেন প্রমুখ প্রাদেশিক স্তরের শীর্ষস্থানীয় কমিউনিস্ট নেতার উপর এবং চতুর আলি (ট্রাম শ্রমিক), মহম্মদ হারিস প্রমুখ শ্রমিক কমিউনিস্টদের উপর যুদ্ধ-বিরোধিতার ও শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টার অভিযোগে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারি করে। রণেন সেন প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতার উপর ১ মে'র মধ্যে কলকাতা ছাড়ার আদেশ হয় এবং কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা ও খড়্গপুরে ঢোকা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৪০ সালের ফেব্রুআরি মাসে যখন বাংলার কমিউনিস্ট নেতাদের ওপর কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল থেকে বহিষ্কার আদেশ জারি হয়, তখন কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পূরণ চাঁদ যোশী কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন। সরকারি আদেশে যোশীও কলকাতা থেকে বহিষ্কৃত হন। ব্যাপক ধরপাকড়ও শুরু হয়ে যায়, যার মূল শিকার ছিলেন কমিউনিস্টরা। ১৯৩৯ সালেই কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক নৃপেন চক্রবর্তী গ্রেফ্‌তার হন। ১৯৪০ সালের ২০ ফেব্রুআরি ভারত রক্ষা আইনে কালী মুখার্জী, সমর মুখার্জী ও ডঃ কেশব সরকারকে যুদ্ধ-বিরোধী প্রচারের অভিযোগে গ্রেফ্‌তার করা হয়। সমর মুখার্জী চৌদ্দ মাস জেলে আবদ্ধ থাকেন, কালী মুখার্জী জেল ও গৃহান্তরণ মিলিয়ে প্রায় পাঁচ বছর। ফেব্রুআরি মাসে যে কমিউনিস্ট নেতাদের উপর বহিষ্কার আদেশ জারি হয়েছিল, তাঁরা সকলেই সেই আদেশ লঙ্ঘন করে গোপনে থেকে কলকাতায় পার্টির কাজ চালাতে থাকেন। বহিষ্কার আদেশ লঙ্ঘন করার অভিযোগে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও সোমনাথ লাহিড়ী কারারুদ্ধ হন। ছ' মাস কারাদণ্ড ভোগ করে ছাড়া পেয়ে লাহিড়ী ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ নদীয়া জেলায় চলে যান

এবং নবদ্বীপকে আশ্রয় করে গোপনে কলকাতায় পার্টি'র কাজ চালাতে থাকেন। কয়েক মাসের মধ্যেই ময়মনসিংহ যাবার পথে ব্যবস্থার একটা গোলমালের ফলে প্রাদেশিক সম্পাদক পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী গ্রেফ্তার হন। তাঁর জায়গায় সন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত মুজফ্ফর আহ্মদ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক হন। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আরও বহু দমনপীড়নমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়, যাতে তাঁরা স্বাধীনভাবে কাজ চালাতে না পারেন। সবচেয়ে বেশী দমন-পীড়ন চলে শ্রমিক নেতাদের উপর, যাঁদের একটা বড় অংশই ছিলেন কমিউনিস্ট। অধিকাংশ কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতাই কারারুদ্ধ হন, নতুবা বিধিনিষেধের বেড়াজালে অন্তরণাবদ্ধ বা কর্মস্থল (এক্ষেত্রে কলকাতা) থেকে বহিষ্কৃত হন। তবুও সমস্ত বাধাবিপত্তির মোকাবিলা করে, গ্রেফ্তারী পরোয়ানা এড়িয়ে আত্মগোপন করে কমিউনিস্টরা যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার, পার্টি-গড়ার কাজ, শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ ও সংগ্রামের প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে লাগলেন।[৪২]

শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিক ধর্মঘট

যুদ্ধ-বিরোধিতার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো যুদ্ধ-বিরোধী রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট এবং যুদ্ধ-বিরোধী রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ শ্রমিক ধর্মঘট। ১৯৩৯ সালের ২ অক্টোবর কমিউনিস্ট পার্টি'র ডাকে বোম্বাইয়ের ৯০,০০০ সুতাকল শ্রমিক একদিনের যে প্রতীক ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন, সেটা ছিল যুদ্ধ-বিরোধী শ্রমিক ধর্মঘটের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া ভিত্তিক আন্দোলনের, বিশেষ করে মহার্ঘ ভাতার দাবিতে আন্দোলনের সঙ্গে যুদ্ধ-বিরোধিতাকে মিশিয়ে শ্রমিক ধর্মঘট কমিউনিস্ট পার্টি'র ডাকে ভারতের অন্যান্য জায়গায় ইতিমধ্যেই হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৪০ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে মহার্ঘ ভাতার দাবিতে বোম্বাইয়ের ১,৫০,০০০ সুতাকল শ্রমিকের এক বিশাল ধর্মঘটের।[৪৩] বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির ও কলকাতা জেলা কমিটির তরফে এই ধরনের যুদ্ধ-বিরোধী রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের ও শ্রমিক ধর্মঘটের কথা বলে ও প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা ও ইস্তাহার প্রকাশ অব্যাহত থাকলেও এবং এই মর্মে প্রচুর বক্তৃতা করা হলেও বাস্তবে কলকাতায় বা বাংলা-দেশের কোথাও এই "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে"র যুগে কোনও রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ যুদ্ধ-বিরোধী সাধারণ ধর্মঘট ও শ্রমিক ধর্মঘট হয়নি এবং এই ধরনের ধর্মঘটের কোনও প্রস্তুতিও কমিউনিস্ট পার্টি'র তরফ থেকে নেওয়া হয়নি। এর কারণ হিসাবে প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা রণেন সেন তাঁর সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেন, "বোম্বাই শহরে সমস্ত সুতাকলগুলি অবস্থিত হওয়ায় তাদের মধ্যে সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কাজ করার যে সুবিধা ছিল, সেটা কলকাতায় না থাকায় ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১-এর মধ্যে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে'র যুগে বোম্বাইয়ের মত এইরকম কোনও যুদ্ধ-বিরোধী রাজনৈতিক ধর্মঘট কলকাতায় বা বাংলায় কোথাও হয়নি।"[৪৪] কারণ হিসাবে এটা আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

কলকাতায় এই ধরনের ব্যাপক যুদ্ধ বিরোধী কোনও ধর্মঘট করার মত সাংগঠনিক শক্তি তখন কমিউনিস্ট পার্টির ছিল না এবং কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে এককভাবে এই ধরনের রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করে দেওয়ার কোনও লাইন তখন কমিউনিস্ট পার্টির সর্ব-ভারতীয় স্তরেও গৃহীত হয়নি, আর কংগ্রেস নেতৃত্ব তখন এই ধরনের যুদ্ধ-বিরোধী কোনও সংগ্রামের কথা ভাবছেনই না।

কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধ-বিরোধিতাটা ছিল আন্তরিক ও খাঁটি, অভাবটা ছিল শক্তির। সচেতন রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ যুদ্ধ-বিরোধী কোনও রাজনৈতিক ধর্মঘট এই সময়ের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে না হলেও, কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধের পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণীকে অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া আদায়ের লড়াইতে নামতে ও এই সমস্ত দাবিতে ধর্মঘট করতে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছে। কলকাতার ও বাংলার অন্যান্য জায়গায় "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে"র যুগে এই রকম অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া-ভিত্তিক বেশ কিছু শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছে, যার প্রতিটিতেই কমিউনিস্টদের উৎসাহী অংশগ্রহণ ছিল। আমার আলোচনা কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ।

এই প্রসঙ্গে আমি প্রথমেই উল্লেখ করবো ১৯৪০ সালের মার্চ মাসের কলকাতা কর্পোরেশন ধর্মঘটের। "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ"-কালীন যুগে কলকাতায় ও বাংলার অন্যান্য জায়গায় যে-সমস্ত শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট হয়, তার মধ্যে এটিই ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ১৯৪০ সালের ২৬ মার্চ কলকাতা কর্পোরেশন-এর শ্রমিকরা মহার্ঘ ভাতার দাবিতে ও অন্যান্য অনেক দাবি নিয়ে ধর্মঘট শুরু করেন। প্রথমে কর্পোরেশন-এর ঝাড়ুদার ও মেথররা ধর্মঘটে সামিল হন। অন্যান্য অংশের শ্রমিকরাও এবার তাঁদের সঙ্গে ধর্মঘটে যোগ দেন। মোট ধর্মঘটী কর্পোরেশন শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০,০০০। ২৬ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত ধর্মঘট চলে। ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর ব্যাপক দমনপীড়ন চালানো হয়, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকদের কোনও দমনপীড়নই টলাতে পারে না। তখনও কর্পোরেশন শ্রমিকদের কোনও ইউনিয়ন গড়ে ওঠেনি। এই কর্পোরেশন শ্রমিক ধর্মঘটের প্রধান নেত্রী ছিলেন ব্যারিস্টার ও তৎকালীন কলকাতা কর্পোরেশন-এর নির্দল কাউন্সিলার বেগম সাকিনা ফারুক সুলতানা মোয়াজ্জেদা (সাকিনা বেগম নামেই সমধিক পরিচিত)। এই ধর্মঘটে কমিউনিস্টরা সাকিনা বেগমের সঙ্গে একযোগে নেতৃত্ব দেন। মহার্ঘ ভাতার দাবিতে এই ধর্মঘট সফল হয়। ২ এপ্রিল চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ৩ এপ্রিল ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। ধর্মঘটের সাফল্য শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের দিকে নিয়ে যায়। দশ হাজার সদস্য বিশিষ্ট শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়—নাম হয় ক্যালকাটা কর্পোরেশন্ ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন। ইউনিয়নের সভাপতিপদে আসীন হন সাকিনা বেগম, সহ-সভাপতি শিবনাথ ব্যানার্জী এবং সাধারণ সম্পাদক হন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জী। সাকিনা বেগম ও শিবনাথ ব্যানার্জী বাদে বঙ্কিম মুখার্জী, হৃষিকেশ ব্যানার্জী, দেবেন্দ্রবিজয় সেনগুপ্ত, বীরেন রায় প্রমুখ ইউনিয়নের অন্য সব নেতারাই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। কিন্তু মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির চুক্তি কার্যকর না করার কারণে,

চুক্তি কার্যকর করার দাবিতে ১৯৪০ সালের ২৬ আগস্ট থেকে কর্পোরেশন-এর শ্রমিকরা দ্বিতীয়বার ধর্মঘট করেন। এই ধর্মঘটে ইউনিয়ন প্রথম থেকেই নেতৃত্ব দেয়। প্রবল অত্যাচার চালিয়ে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এই দ্বিতীয় ধর্মঘটটি ভেঙে দেয়। ৫ সেপ্টেম্বর শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে বাধ্য হন। বহু ধর্মঘটী শ্রমিককে ছাটাই করা হয়।[৪৫]

কলকাতা কর্পোরেশন-এর শ্রমিকদের এই ধর্মঘট ছাড়াও এই সময়ের মধ্যে আরও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য শ্রমিক ধর্মঘট ও সংগ্রাম হয়। তার মধ্যে চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট ও সংগ্রামের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৩৭ সালের দ্বিতীয় সারা বাংলা চটকল শ্রমিক ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে ঐ বছরেই চটকল শ্রমিকদের নিজস্ব, ঐক্যবদ্ধ জঙ্গী সংগঠন বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন-এর জন্ম হয়। কমিউনিস্ট-প্রভাবিত এই ইউনিয়নের সভাপতি হন বঙ্কিম মুখার্জী ও সাধারণ সম্পাদক হন আব্দুল মোমিন। এই ইউনিয়নের নেতৃত্বে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন চটকলে বিভিন্ন অর্থনৈতিক দাবির ভিত্তিতে জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট হয়, যাতে প্রধান অংশগ্রহণকারী ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীরা।[৪৬] ১৯৪০ সালেই কলকাতাসহ বাংলার বিভিন্ন চটকলে মহার্ঘ ভাতার দাবিতে ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘটের এক জোয়ার আসে। ধর্মঘটের মাধ্যমে চটকল শ্রমিকরা দশ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি আদায়ে সমর্থ হন। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে বিভিন্ন চটকলের শ্রমিক মহার্ঘ ভাতার দাবিতে, যুদ্ধকালীন ভাতার দাবিতে, যুদ্ধকালীন ভাতা হিসাবে ২৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির দাবিতে, যুদ্ধ-তহবিলে দেওয়ার জন্য শ্রমিকদের প্রাপ্য বেতন থেকে বাধ্যতামূলকভাবে চাঁদা কেটে নেওয়ার বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য এরকম কিছু অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে একের পর এক ধর্মঘটে সামিল হন। "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে"র যুগে এই সমস্ত চটকল ধর্মঘটের প্রধান সংগঠক ছিলেন কমিউনিস্টরা। এই সময়ের মধ্যেই কলকাতার বিভিন্ন চটকলে, যেমন, বরানগর জুট মিলস্, অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্, হেস্টিংস জুট মিলস্, অ্যাণ্ড্রু ইউল জুট মিলস্, গগলভাই জুট মিলস্, লরেন্স জুট মিলস্, হুকুমচাঁদ জুট মিলস্, ক্যালকাটা জুট মিলস্ এবং আরও কয়েকটি চটকলে, বিশেষ উল্লেখযোগ্য শ্রমিক ধর্মঘট হয়। চরম নিপীড়নের সম্মুখীন হয়েও ধর্মঘটী শ্রমিকরা মাথা উঁচু রাখেন। এই সমস্ত চটকল ধর্মঘটগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য-সমর্থকদের মতই সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিলেন লেবার পার্টির কমিউনিস্টরা, যাঁরা ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে এসে পৃথক শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হিসাবে বলশেভিক পার্টি গঠন করেন।[৪৭]

শ্রমিক-আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং শ্রমিক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় অন্যান্য শিল্পে ও কলকারখানাতেও। উল্লেখ করা দরকার জঙ্গী ট্রাম-শ্রমিক আন্দোলনের কথা। মহম্মদ ইসমাইল, গোপাল আচার্য, নরেন সেন, ধীরেন মজুমদার, চতুর আলি প্রমুখ কমিউনিস্টদের প্রচেষ্টায় সংগঠিত ট্রাম-শ্রমিকদের নিজস্ব সংগঠন ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ১৯৩৮ সাল থেকেই অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠে ট্রাম-শ্রমিকদের আন্দোলনে

নতুন জোয়ার নিয়ে আসে। ১৯৪০-৪১ সালে ট্রাম-শ্রমিক আন্দোলনে তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৪২ সালের ২ মে ক্যালকাটা ট্রাম্‌ওয়েজ্‌ ওয়ার্কার্স্‌ ইউনিয়নের নেতৃত্বে ট্রাম-শ্রমিক ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘট চলে ২৩ মে পর্যন্ত।[৪৮]

"সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে"র যুগে ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে কলকাতা মহানগরীতে অনুষ্ঠিত আরও কয়েকটি শ্রমিক ধর্মঘটের উল্লেখ করছি। ১৯৩৯ সালের শেষদিকে কলকাতার ফ্রেঞ্চ মোটর কোম্পানির শ্রমিকরা বিভিন্ন অর্থনৈতিক দাবিতে ধর্মঘট করেন। সুভাষচন্দ্র বসু এক বিবৃতিতে বলেন—"শ্রমিকদের দাবিগুলি ন্যায়সঙ্গত, আমি পুলিসের জুলুম ও হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করি।" ৬ জন শ্রমিক গ্রেফ্‌তার হন। ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবিতে, শ্রমিকদের দাবির সমর্থনে সুভাষ বসু জনগণের কাছে আন্দোলনের ডাক দেন। তাঁকে কমিউনিস্টরা সমর্থন করেন।[৪৯] টিটাগড় চটকলে শ্রমিক ধর্মঘট হয়। কলকাতায় মোমিনপুরে বামার লরি কোম্পানিতে, বালিগঞ্জে হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক স্টীল্‌ কোম্পানিতে (পরে নাম হয় ভার্তিয়া ইলেকট্রিক স্টীল্‌ কোম্পানি), বেরুক কমেন্‌স্‌-এ (পরে নাম হয় হিন্দুস্থান ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন্‌) এবং ম্যাকিণ্টস্‌ বার্ণ্‌-এ শ্রমিকরা ৫ দফা অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য লড়াই চালান এবং ধর্মঘটে সামিল হন। শ্রমিকদের এই সমস্ত লড়াই-এ ও ধর্মঘটে গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলী, প্রতাপ সিং, নীরেন দত্ত, রবি রায় প্রমুখ কমিউনিস্টরা নেতৃত্ব দেন। বামার লরিতে ও হুকুমচাঁদে (পরবর্তীকালে ভার্তিয়া) শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন রণেন সেন। অজয় দাসগুপ্ত, জলিমোহন কাউল প্রমুখ তরুণ কমিউনিস্ট কর্মীরা এই সমস্ত শ্রমিক লড়াই-এ অংশগ্রহণ করেন।[৫০]

এই সময়কার রেল-শ্রমিক আন্দোলনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের অন্যান্য জায়গার মত কলকাতাতেও রেল-শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক সংগ্রামের প্রস্তুতি চলতে থাকে। সোমনাথ লাহিড়ী, সরোজ মুখার্জী, জ্যোতি বসু প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতারা রেল-শ্রমিক আন্দোলনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৫১] উল্লেখ করা যেতে পারে এই সময়কার কলকাতার বন্দর শ্রমিক ধর্মঘটের, যে ধর্মঘটে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ছিল।[৫২] ১৯৪১ সালে কলকাতার চীনা জুতা কারখানার দু'হাজার শ্রমিকের ধর্মঘটও উল্লেখযোগ্য। তাছাড়াও ঐ সময়কার বেঙ্গল কেমিক্যালস্‌-এর শ্রমিক ধর্মঘট ও টালিগঞ্জের জয় এন্‌জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌-এর শ্রমিক ধর্মঘটের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে।[৫৩] এই সমস্ত ধর্মঘট প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক কারণে সংগঠিত ও সংঘটিত হলেও এবং স্বল্পস্থায়ী হলেও কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এই সমস্ত ধর্মঘটের মাধ্যমেই সাধ্যমত করা হয়।

কৃষক আন্দোলন

"সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে"র যুগে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে কমিউনিস্ট পার্টি জঙ্গী কৃষক আন্দোলনে প্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছে এবং আন্দোলনের ব্যাপ্তি লাভে

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু কলকাতা কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্র না হওয়ায় সেই আলোচনা এই প্রবন্ধের পরিধিভুক্ত নয়।

ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র ধর্মঘট

সমকালীন ছাত্র আন্দোলনেও কমিউনিস্টদের ভূমিকা ও অবদান উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাপর্বে বাংলার ছাত্র আন্দোলনের ও ছাত্র ফেডারেশনের মুখ্য অবদান হলো সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির বর্শাফলককে অন্তত সাময়িককালের জন্যও ভোঁতা করে দিতে পারা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী হুকুম জারি করেছিল যে, তাদের অনুমতি না নিয়ে কোনও সভা, মিছিল, এমনকি সংগঠনের কমিটি সভাও করা যাবে না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ১৯৪০ সালের ২৬ জানুআরি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ইংরেজের ফতোয়া ও নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ছাত্র ধর্মঘট, মিছিল ও সমাবেশ করবে। কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইংরেজ সরকারের আদেশ অমান্য করতে দেশবাসীকে সুস্পষ্ট-ভাবে নিষেধ করলেন। বে-আইনী ঘোষিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস সভাপতির নির্দেশ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলো। কমিউনিস্ট পার্টি'র কলকাতা জেলা কমিটি "ধর্মঘট ও মিছিলের মাধ্যমে দমননীতির রাজত্বকে বানচাল করার" জন্য ছাত্রদের কাছে আহ্বান জানিয়ে ১৯৪০ সালের জানুআরি মাসে দুটি ইস্তাহার প্রকাশ করলো। ইস্তাহার দুটির উল্লেখ আগেই করেছি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনও, তার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামে, "ইংরেজের বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে, ধর্মঘট করে, মিছিল করে, অর্ডিন্যান্স্ রাজকে চূর্ণ করে করে ২৬ জানুআরি স্বাধীনতা দিবস পালন করার" আহ্বান জানিয়ে ইস্তাহার বিলি করে।[৫৪]

১৯৪০ সালের ২৫ জানুআরি বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে, পুলিসের বেষ্টনী ভেদ করে, **"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক"** আওয়াজ তুলে বিশাল মিছিল বের করে শহর পরিক্রমা করেন। পরদিন ২৬ জানুআরি কয়েক হাজার ছাত্রের বিরাট জনসভায় কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংগ্রামকে অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে ভাষণ দেন। তাঁর নামে গ্রেফ্তারী পরোয়ানা জারি হওয়ায় তিনি আত্মগোপন করেন। বহু কমিউনিস্ট ও অ-কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা গ্রেফ্তার, বহিষ্কৃত ও অন্তরীণ হন। অনেকে আত্মগোপন করেন।[৫৫]

১৯৪০-এর জুলাই মাস থেকে কলকাতার ছাত্ররা এক বিরাট আন্দোলনে সামিল হন। সেই আন্দোলনের সূচনা করেন সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৪০ সালের ১ জুলাই কলকাতার অ্যালবার্ট হলে এক বিরাট ছাত্র-জনসভায় সুভাষ বসু হলওয়েলের স্মৃতিস্তম্ভটি কলকাতার বুক থেকে অপসারণের জন্য আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। ২ জুলাই থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে হলওয়েলের স্মৃতিস্তম্ভটি অপসারণের জন্য আন্দোলন শুরু হয়। ৫ জুলাই সুভাষচন্দ্রকে পুলিস গ্রেফ্তার করে। তার প্রতিবাদে ও বর্বর দমন-

নীতির নিন্দা করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম ছাত্র লীগের যৌথ আহ্বানে কলকাতায় ও শহরতলিতে ব্যাপক ছাত্র ধর্মঘট ও হরতাল প্রতিপালিত হয়। ১০ জুলাই থেকে ছাত্র ফেডারেশনের ও মুস্‌লিম ছাত্র লীগের উদ্যোগে আন্দোলন ব্যাপকতর রূপ ধারণ করে। পুলিসের অত্যাচারও তীব্র হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত সরকার নীতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় ও হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণের প্রতিশ্রুতি দেয়।[৫৬] কমিউনিস্ট পার্টি পার্টিগতভাবে এই আন্দোলনে যোগ না দিলেও কমিউনিস্ট ছাত্রনেতারা ও উৎসাহী ছাত্রকর্মীরা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন ও নেতৃত্ব দেন।

১৯৪০ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসেও কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ব্যাপক ছাত্র ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র ১৯৪১ সাল ধরেই প্রধানত দমননীতির বিরুদ্ধে ও বন্দীমুক্তির দাবি জানিয়ে বাংলাদেশে প্রবল ছাত্র আন্দোলন চলতে থাকে, যার কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা। দেওলি বন্দী শিবিরে অনশন ধর্মঘটরত রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে কলকাতায় ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘট হয়। কানপুরে ও গৌহাটিতে ছাত্রদের উপর লাঠি চালনার প্রতিবাদেও কলকাতায় ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এম. ফারুকি কলকাতার আশুতোষ কলেজে বক্তৃতা দেওয়ার সময় পুলিসের হাতে গ্রেফ্‌তার হন। প্রতিবাদে সারা কলকাতায় এবং বাংলার অন্যান্য জেলাতেও ব্যাপক ছাত্র ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল প্রধানত ছাত্র ফেডারেশন এবং কমিউনিস্ট ছাত্রনেতারা আর ছাত্রকর্মীরা এই সমস্ত ছাত্র আন্দোলনে ও ছাত্র ধর্মঘটে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ"-কালীন সন্ত্রাসের নীতিকে উপযুক্ত মোকাবিলা করে ছাত্রদের এই আন্দোলন ও সংগ্রামগুলি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।[৫৭]

সাংস্কৃতিক আন্দোলন

১৯৪০ সালের শেষদিকে কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মীদের ও কমিউনিস্ট পার্টি-সমর্থক ছাত্রদের প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে ইউথ কালচারাল ইন্‌স্টিটিউট্ (ওয়াই. সি. আই.) নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে ওঠে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন জলিমোহন কাউল। কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগী সাংস্কৃতিক সংস্থা ওয়াই. সি. আই. পার্টি-লাইন অনুসরণ করে প্রধানত নাটক এবং গান প্রভৃতি Performing Arts-এর মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও যুদ্ধবিরোধী প্রচার চালাতে থাকে। এই নাটকগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। এক হিসাবে ওয়াই. সি. আই. ছিল ১৯৪৩ সালের মে মাসে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার সফল পথিকৃৎ।[৫৮]

পার্টি-সংগঠন

১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো, তখন কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন নৃপেন চক্রবর্তী। ১৯৩৯ সালেই তিনি গ্রেফ্‌তার হয়ে যাওয়ায় তাঁর জায়গায় পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী প্রাদেশিক কমিটির

সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৪০ সালে পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীও গ্রেফ্‌তার হওয়ায় তাঁর জায়গায় সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক হন। "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে"র যুগের এবং "জনযুদ্ধে"র আংশিক যুগে তিনিই ছিলেন প্রাদেশিক সম্পাদক। ১৯৪৩ সালের ১৮-২১ মার্চ কলকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন্ হলে (ভারত সভা হলে) কমিউনিস্ট পার্টি'র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির তৃতীয় (প্রথম প্রকাশ্য) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জায়গায় ভবানী সেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৫৯] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা দরকার, ১৯৪১ সালে হিজলি জেল থেকে রাতের অন্ধকারে পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্তী চার সারি কাঁটা তারের উঁচু বেড়া ডিঙিয়ে, সান্ত্রীদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে যান এবং পরবর্তীকালে ধরাও পড়েন না।[৬০]

১৯৩৮ সালে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টি'র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির দ্বিতীয় গোপন সম্মেলনের আগেই নির্বাচনের মাধ্যমে কলকাতা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন কালী মুখার্জীর জায়গায় সরোজ মুখার্জী। "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ" যখন শুরু হলো, তখন সরোজ মুখার্জীই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি'র কলকাতা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক। ১৯৪২ সালে সরোজ মুখার্জীর জায়গায় কুমুদ বিশ্বাস কলকাতা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৪২ সালেই কুমুদ বিশ্বাসের জায়গায় রণেন সেন স্বল্পকালের জন্য সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৪৩ সালের জানুআরি মাসে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট্-এর তিনতলার লাইব্রেরি হলে কলকাতা জেলা কমিটির প্রকাশ্য সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে কুমুদ বিশ্বাস পুনরায় কলকাতা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তখন কলকাতা জেলা পার্টি'র সদস্য ছিলেন ১৯৩ জন। "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে"র যুগে সরোজ মুখার্জীই কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পার্টিকে পরিচালিত করেন।[৬১]

১৯৪০ সালে কলকাতা জেলা পার্টি'র অন্যতম প্রভাবশালী নেতা ও দক্ষ সংগঠক ফণী দত্ত ***"India Marches On"*** শীর্ষক এক পুস্তিকায় এবং আরও দুটি পুস্তিকায় পার্টি লাইনের কঠোর সমালোচনা করে তাঁর নিজস্ব থিসিস দেন। "পানিনি" এই ছদ্মনাম নিয়ে তিনি পার্টি কর্মীদের মধ্যে এই থিসিস প্রচার করেন এবং পার্টি'র মধ্যে একটি নিজস্ব গোষ্ঠী গঠন করেন। এই থিসিসের মাধ্যমে "পানিনি" পার্টি'র কিছু সদস্যকে প্রভাবিত করতে পারেন। ফলে "পার্টি-বিরোধিতা"র অভিযোগে প্রাদেশিক কমিটি ফণী দত্ত সহ কয়েকজনকে পার্টি থেকে ১৯৪০ সালেই বহিষ্কার করে।[৬২]

১৯৪০-৪১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি'র কলকাতা জেলা কমিটির সাংগঠনিক অবস্থা ঠিক কিরকম ছিল এবং কাজকর্মের ধরনই বা কি ছিল, সে সম্পর্কে একটি সম্যক চিত্র পাওয়া যায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির ১৯৪১ সালের ৭ এপ্রিল প্রকাশিত এক "রিপোর্টে"। এই রিপোর্টের অংশবিশেষ সরোজ মুখোপাধ্যায়ের বই-এর "প্রথম খণ্ডে" মুদ্রিত হয়েছে। কলকাতা জেলা পার্টির অবস্থা বর্ণনা করে "রিপোর্টে" লেখা

হয়—"শিল্পাঞ্চল সম্বলিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জেলাকে কেন্দ্র করে কলকাতা জেলা পার্টির অবস্থান। এই জেলার পার্টির রাজনৈতিক গুরুত্ব সমধিক। কিন্তু এই জেলার বহু কর্মী গ্রেফ্‌তার হয়ে গেছেন, বহু নেতাকে কলকাতা শিল্পাঞ্চল থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। ফলে কলকাতা জেলার পার্টি সংগঠন বিশেষভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে জেলা কেন্দ্র পুলিশের নজরের মধ্যে আসার পর থেকে জেলা কেন্দ্র অচল হয়ে পড়ে। ...ঐ বছরের অক্টোবর মাসেই একটি জেলা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু কলকাতা জেলার রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাজকর্ম প্রাদেশিক কেন্দ্র থেকেই পরিচালনা হতো। কলকাতা জেলা কেন্দ্রটি একটি নিছক যোগাযোগ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।...কলকাতা জেলায় কোন স্থায়ী জেলা কমিটি গঠন করা যাচ্ছে না। তাই প্রাদেশিক কমিটির নির্দেশে কলকাতাকে ছয়টি অঞ্চলে (জোনে) ভাগ করে ছয় জনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁরা হলেন জেলা কমিটির প্রতিনিধি ও সংগঠক—ডি. সি. আর.। প্রত্যেককে নিজ নিজ এলাকার পার্টি সেলগুলিকে গোপনে পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।...

...কলকাতার ১৪ জন পার্টি সভ্যকে প্রাদেশিক কমিটি কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্প এলাকার কাজে নিযুক্ত করে দেয়।..."[৬৩]

১৯৪৩ সালের ১৮—২১ মার্চ কলকাতার ভারত সভা হলে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির তৃতীয় (প্রথম প্রকাশ্য) সম্মেলনে গৃহীত ভবানী সেনের **"রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্টে"**ও এই সাংগঠনিক দুর্বলতার স্বীকৃতি মেলে। ঐ **"রিপোর্টে"** ভবানী সেন পার্টির ১৯৪০-৪১-এর যুগের দুটি প্রধান সাংগঠনিক বিচ্যুতির ও দুর্বলতার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "প্রথমতঃ আমরা বামপন্থী জাতীয়তাবাদীর মত ফাঁকা আন্দোলন করে বেড়াই, পার্টি গড়ি না। সুভাষবাবুর রাজনৈতিক পন্থাকে পরাস্ত করবার জন্য আমরা সুভাষবাবুর মতই ফাঁকা আন্দোলনের রাস্তা নিয়েছি। আমাদের সংগঠনের পন্থা বামপন্থী জাতীয়তাবাদের মত। সভাসমিতি ও হরতাল চালিয়ে জেলে যাচ্ছি অথবা বেআইনী ইস্তাহার বিলি ক'রে জেলে যাচ্ছি, বিপ্লবী কায়দা আয়ত্ত করতে পারছি না, ধরছি সত্যাগ্রহের মত রাস্তা। দ্বিতীয়তঃ বেআইনী অবস্থায় অনেক ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও আমরা পার্টিকে পুনঃসংগঠিত করার জন্য পার্টি ইউনিটগুলির মধ্যে নিয়মিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারিনি। অত্যন্ত জরুরী কাজেও গাফিলতি করা আমাদের একটা মজ্জাগত অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।"[৬৪] ভবানী সেনের এই **"রিপোর্টে"** আবার পার্টি সংগঠনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, এমনকি প্রয়োজনবোধে আন্দোলনের থেকেও। পার্টির তৎকালীন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশীও পার্টি-সংগঠনের উপরই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। সে সম্পর্কে সমালোচনা করে চল্লিশ দশকের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অরুণ বোস তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন—"Joshi was making a fetish of organization, when he made it a pre-condition of revolution, when

both mattered, and had to go together. Despite his undoubted flair for organization, he seemed to put 'Organization in Command' when both Organization and Politics had to be in Command.'[৬৫]

পার্টির মধ্যে এই দুই সাংগঠনিক বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয় এবং দুর্বলতাগুলি দূর করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন ইউনিটে নিয়মিত সার্কুলার পাঠানো এবং বিভিন্ন ইউনিট থেকে নিয়মিত রিপোর্ট পাবার মোটামুটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির তৈরী স্টাডি কোর্স নিয়ে ট্রেনিং ক্লাস খোলা হয়। এই ট্রেনিং ক্লাসে বিভিন্ন জেলা ইউনিটের নেতৃস্থানীয় সংগঠক ও কর্মীদের নিয়ে এসে শিক্ষা দেওয়া হত। পার্টি কর্মীরা আণ্ডারগ্রাউণ্ড অ্যাজিটেশনের ধরনও ক্রমশ আয়ত্ত করতে শিখলেন। পার্টি সংগঠনে তখন থেকেই ক্রমে ক্রমে দুর্বলতা ও অচলাবস্থা কাটতে আরম্ভ করল। পার্টি খাড়া হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কঠোরতম আঘাত সহ্য করেও।[৬৬]

এর মধ্যেই এসে পড়লো ২২ জুন ১৯৪১—সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নাৎসী জার্মানির ঘৃণ্য আক্রমণ। শুরু হলো কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধ-সম্পর্কিত অবস্থানের মৌলিক পরিবর্তন। সে আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের পরিধিভুক্ত নয়।

মূল্যায়ন

"সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে"র যুগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সীমিত শক্তি নিয়েও আন্তরিকভাবে ও সর্বতোভাবে যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছে। ডাক দিয়েছে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে স্বাধীনতার জন্য দেশব্যাপী সংগ্রাম গড়ে তোলার। "*The Proletarian Path*" দলিলের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি **"বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল"** করার কথাও বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছে। দলিলটির মৌলিকতা হল ভারতের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্বাধীন মূল্যায়ন এবং সেই অনুযায়ী ভারতের বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি গড়ে তোলার চেষ্টা। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই রয়ে গেল তত্ত্বের স্তরে সীমাবদ্ধ, বাস্তব ও ব্যবহারিক প্রয়োগ আর হল না। জাতীয় সংগ্রাম কংগ্রেস বা অন্যান্য বামপন্থী দল গড়ে তুলল না, কমিউনিস্ট পার্টিও গড়ে তুলল না। এর জন্য কংগ্রেস, অন্যান্য বামপন্থী দল, কমিউনিস্ট পার্টি সকলেই দায়ী। একদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বের কঠোর সমালোচনা করা হলেও কংগ্রেস সংগঠন সম্পর্কে অত্যধিক আস্থা ও কংগ্রেসকেই সংগ্রামের পথে টেনে আনতে হবে, কারণ কংগ্রেস ব্যতীত জাতীয় সংগ্রাম গড়ে তোলা সম্ভব নয়, এইরকম একটি মনোভাব ও অবস্থান এবং অপরদিকে অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিকে তীব্র সমালোচনা এবং তাদের প্রতি অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীই কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে, তার তীব্র যুদ্ধ-বিরোধিতা সত্ত্বেও, স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রাম গড়ে

তোলবার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টি'র সভ্যসংখ্যাজনিত শক্তির অভাবকেও এর সঙ্গে যোগ করা দরকার।

কমিউনিস্ট পার্টি'র তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশীর দুটি পরবর্তীকালীন প্রাসঙ্গিক মন্তব্য পর্যালোচনার মাধ্যমে বর্তমান প্রবন্ধে যতি টানা যেতে পারে। যোশী লিখেছেন:

"We had no illusions that a single party like ours could start a national struggle. All our attention was directed to create the general *atmosphere* in the country and those *conditions* among the sections of the people we led that might help the Congress to take the lead."[৬৭]

যোশীর বক্তব্য অনুযায়ী সি. পি. আই. নিজস্ব ক্ষমতায় জাতীয় সংগ্রাম শুরু করতে পারবে, এরকম কোনও "illusions" বা মোহ তাঁদের ছিল না। যোশীর এই অকপট স্বীকারোক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই প্রশ্ন জাগে, তবে কি "*The Proletarian Path*" যোশীর ভাষায় এই "illusions"-ই সৃষ্টি করেনি? কারণ "*The Proletarian Path*" ডাক দিয়েছিল "সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানে"র, ডাক দিয়েছিল "বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে"র।[৬৮] কিন্তু গান্ধী-নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেস যে এমন কোনও সংগ্রাম শুরু করবে না, যার পরিণতি হচ্ছে "সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান" বা "বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল", এ কথা যোশী-নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি'র অজানা ছিল না। এই সংগ্রামবিমুখতার কারণেই কমিউনিস্ট পার্টি এই যুগে কংগ্রেস নেতৃত্বের যথেষ্ট সমালোচনাও করেছিল। কিন্তু সব সত্ত্বেও দেখা গেল, কমিউনিস্ট পার্টি একদিকে "সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান" ও "বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল"-এর ডাক দিয়েছে, আর অপরদিকে কংগ্রেস জাতীয় সংগ্রাম শুরু করবে ও সেই সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে, এই বিশ্বাসে অবিচল থেকেছে। এই দুই পরস্পরবিরোধী নীতির কোনও প্রকৃত সহাবস্থান কি সম্ভব ছিল?

স্বাভাবিকভাবেই আশাভঙ্গের, বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা সহ্য করতে হয়েছে যোশী-নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টিকে। "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে"র যুগে কোনও প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-সংগ্রামের ডাক কংগ্রেস দেয়নি। ক্ষুব্ধ, বেদনাহত পি. সি. যোশী অত্যন্ত সঠিকভাবেই অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন গান্ধী-নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসকে: "The result of your policy in this period meant that India had lost a great opportunity of striking for Indian freedom and world peace;..."[৬৯] যোশীর অভিযোগের সারবত্তা সমস্ত সংশয়-সন্দেহের ঊর্ধ্বে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিও এই "স্বর্ণ সুযোগ" অপচয়ের দায়িত্ব সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পারে কি?

সূত্রনির্দেশ :

১. সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, প্রথম খণ্ড (১৯৩০-১৯৪১), গণশক্তি পত্রিকা দপ্তর, কলকাতা, মে, ১৯৮৫, পৃ ৫১-৫২, ১৭৯-৮০, ২১৩ ; রণেন সেন, বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০-'৪৮), বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, মে, ১৯৮১, পৃ ২৮-২৯, ৩৮-৪১, ১৭০-৭১ ; লেখক কর্তৃক গৃহীত রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—২৮. ৪. ১৯৮৬, ১৫. ১. ১৯৮৭ ; Ranen Sen, 'Communist Movement in Bengal in the Early Thirties', *Marxist Miscellany*, No. 6, January, 1975, New Delhi, p. 4 ; রণেন সেন, 'বাঙলায় ত্রিশ দশকের প্রথমার্ধের কমিউনিস্ট আন্দোলন', কমিউনিস্ট, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অর্ধশতক পূর্তি উপলক্ষে সি. পি. আই. দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ ১৬৪-৬৫ ; ধরণী গোস্বামী, 'ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ত্রিশের দশকের এক অধ্যায়', (প্রথম পর্ব), পরিচয়, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ২-৩, শারদীয়, ১৩৮০ বাংলা সন (বা স), ১৯৭৩, কলকাতা, পৃ ১৩৭-৩৮ ; ধরণী গোস্বামী, 'ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ত্রিশের দশকের এক অধ্যায়', (দ্বিতীয় পর্ব), পরিচয়, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৫, অগ্রহায়ণ, ১৩৮০ বা স, ডিসেম্বর, ১৯৭৩, কলকাতা, পৃ ৪৯৯-৫১১ ; অমিতাভ চন্দ্র, 'বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি-গঠনের ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগ (১৯৩০-১৯৩৭) : হাওড়া জেলা—একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা', ইতিহাস-অনুসন্ধান (দ্বিতীয় খণ্ড), গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কে. পি. বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ ৩৭৫-৭৭, ৩৮৪ ; অমিতাভ চন্দ্র, 'বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি-গঠনের ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগ (১৯৩০-১৯৪৭) : মুর্শিদাবাদ জেলার সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা', পদাতিক, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বইমেলা, জানুআরি, ১৯৮৭, কলকাতা, পৃ ২১-২৬ ; অমিতাভ চন্দ্র, 'হাওড়া জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ইতিহাস (১৯৩০-১৯৪৭)', পদাতিক, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শারদীয়, ১৩৯৪ বা স, ১৯৮৭, কলকাতা, পৃ ২৯-৩০ ।

২. Panchanan Saha, 'The Communist Movement in India : The Formative Period', *Problems of National Liberation*, Vol. IV, No. 1, December, 1980, Calcutta, p. 46 ; *Ganashakti*, Notebook, Ganashakti Patrika Daptar, Calcutta, 1987 ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৮৮। সরোজ মুখোপাধ্যায় অবশ্য তাঁর লেখায় তারিখ ভুল করেছেন। ভুলক্রমে তিনি লিখেছেন কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৩৪

সালের ২৮ জুলাই নিষিদ্ধ হয়। এটা ভুল, কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৩৪ সালের ২৩ জুলাই নিষিদ্ধ হয়।

৩. *National Front*, Vol. I, No. 35, October 16, 1938, Bombay, p. 4.

৪. *National Front*, Vol. I, No. 51, February 5, 1939, Bombay, p. 1.

৫. Jaiprakash Narayan and P. C. Joshi, 'On Tripuri', *National Front*, Vol. II, No. 6, March 19, 1939, Bombay, p. 89.

৬. Ajoy Kumar Ghosh, 'Calcutta A. I. C. C. Session', *National Front*, Vol. II, No. 14, May 14, 1939, Bombay, p. 224; শ্রীজ্ঞান হালদার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি, ইউনিভার্সিটি লীডারশিপ প্রোগ্রাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৮৬, পৃ ১২।

৭. L. P. Sinha, *The Left-Wing in India (1919-47)*, New Publishers, Muzaffarpur, April, 1965, p. 462.

৮. নেপাল মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৯৪ বা স, ১৯৮৭, পৃ ১৪৯ ; L. P. Sinha, op. cit., p. 470. L. P. Sinha তাঁর বইতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের তারিখ উল্লেখ করেছেন ৯ আগস্ট ১৯৩৯।

৯. Gautam Chattopadhyay, *Subhas Chandra Bose and Indian Communist Movement—A Study of Co-operation and Conflict*, People's Publishing House, New Delhi, April, 1987, p. 12.

১০. Editorial—'India must resist war', *National Front*, Vol. II, No. 29, September 3, 1939, Bombay, p. 460.

১১. লেখক কর্তৃক গৃহীত চিন্মোহন সেহানবীশের সাক্ষাৎকার—১৪. ৬. ১৯৮৬.

১২. *National Front*, Vol. II, No. 31, October 8, 1939, Allahabad, p. 482.

১৩. Gangadhar Adhikari, *The Second Imperialist War*, p. 9, Home / Poll. / F. No. 37 / 43 / 1939.

১৪. Home / Poll. / F. No. 37/43/1939.

১৫. প্রস্তাবটির সম্পূর্ণ বয়ানের জন্য দেখুন—'Statement of the Polit-Bureau on C. P. I. Policy and Tasks in the Period of War', *The Communist*, Organ of the Central Committee of the Communist Party of India (Section of the Comintern),

Vol. II, No. 1, November, 1939, Calcutta and Bombay, pp. 9-21 ; Home / Poll. / F. No. 7/6/1939 ; Subodh Roy (ed.), *Communism in India : Unpublished Documents*, (Vol. II), (1935-1945), National Book Agency, Calcutta, December, 1985, pp. 114-39 ; P. Bandhu and T. G. Jacob (ed.), *War and National Liberation : C. P. I. Documents : 1939-1945*, Odyssey Press, New Delhi, October, 1988, pp. 1-28. এছাড়াও প্রস্তাবিত অংশবিশেষ যে সমস্ত বইতে মুদ্রিত হয়েছে, সেগুলিরও উল্লেখ করলাম— P. C. Joshi, *Communist Reply to Congress Working Committee's Charges*, (Part One), People's Publishing House, Bombay, December, 1945, pp. 35-39 ; Gene D. Overstreet and Marshall Windmiller, *Communism in India*, The Perennial Press, Bombay, 1960, pp. 177-78 ; L. P. Sinha, op. cit., pp. 496-97 ; Gautam Chattopadhyay, op. cit., pp. 13-14.

১৬. *The Communist*, op. cit., p. 9 ; Subodh Roy (ed.), op. cit., p. 114 ; Bandhu and Jacob (ed.), op. cit., p. 2.

১৭. *The Communist*, p. 11 ; Subodh Roy (ed.), p. 120 ; Bandhu and Jacob (ed.), p. 8.

১৮. *The Communist*, p. 13 ; Subodh Roy (ed.), p. 123 ; Bandhu and Jacob (ed.), p. 11.

১৯. *The Communist*, p. 14 ; Subodh Roy (ed.), p. 125 ; Bandhu and Jacob (ed.), pp. 13-14.

২০. *The Communist*, p. 17 ; Subodh Roy (ed.), p. 131 ; Bandhu and Jacob (ed.), p. 20.

২১. *The Communist*, p. 15 ; Subodh Roy (ed.), p. 127 ; Bandhu and Jacob (ed.), p. 16.

২২. *The Communist*, p. 16 ; Subodh Roy (ed.), p. 130 ; Bandhu and Jacob (ed.), pp. 18-19.

২৩. *The Communist*, p. 18 ; Subodh Roy (ed.), pp. 132-33 ; Bandhu and Jacob (ed.), pp. 21-22.

২৪. *The Proletarian Path—Inside the National Front*, Published by the Central Committee of the Communist Party of India, (Section of the Communist International), March, 1940, pp. 10. দলিলটির মূল বক্তব্য সংগৃহীত হয়েছে নিম্নলিখিত সূত্রগুলি থেকে—

Arun Bose, 'Reminiscences of Struggle—I', *Miscellany*, *The Sunday Statesman*, April 24, 1988, Calcutta, pp. 11-13 ; Arun Bose, 'Reminiscences of Struggle-II', *Miscellany*, *The Sunday Statesman*, May 1, 1988, Calcutta, pp. 11-14 ;
লেখক কর্তৃক গৃহীত অরুণ বোসের সাক্ষাৎকার—৪.৬.১৯৮৮, ৭.৬.১৯৮৮, ১০.৬.১৯৮৮, ২০.৬.১৯৮৮। এই চারদিনের মধ্যে বিশেষভাবে ৭.৬.১৯৮৮ তারিখের সাক্ষাৎকারে অরুণ বোস *The Proletarian Path*-এর মূল বক্তব্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

২৫. *Unmasked—Parties & Politics—Communists Call a Conference—To Discuss War & India's Independence*, Essays By : G. Adhikari, A K. Ghosh and P. C. Joshi, Published by the Communist Party of India, Bombay, March, 1940.
এই গুরুত্বপূর্ণ দলিলটি প্রকৃতপক্ষে পাঁচটি পৃথক প্রবন্ধের সংকলন—(i) P. C. Joshi, 'War Unveils All Parties', An Introductory Article, pp. viii ; (ii) G. Adhikari, 'Gandhism—A Review', pp. 24 ; (iii) A. K. Ghosh, 'From Socialism To Gandhism—Congress Socialist Party and The War', pp. 20 ; (iv) A. K. Ghosh, 'Roy—A Masked Compromiser', pp. 21-31 ; and (v) P. C. Joshi, 'Whom, How and Why Does Bose Fight ?', pp. 26.
দলিলটির গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষের বঙ্গানুবাদের জন্য দেখুন—সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৫৪-৫৬।

২৬. Chinmohan Sehanavis, 'Meerut Arrests to Imperialist War', (Second Period), (1929—1941), in the *Guidelines of the History of the Communist Party of India*, Issued by the Central Party Education Department, Communist Party Publication, New Delhi, August, 1974, p. 60.

২৭. P. C. Joshi, *Communist Reply*, op. cit., pp. 39-40 ; Overstreet and Windmiller, op. cit., pp. 177-78, 182-83 ; L. P. Sinha, op. cit., pp. 495-96 ; Shashi Bairathi, *Communism and Nationalism in India : A Study in Interrelationship : 1919-1947*, Anamika Prakashan, New Delhi, 1987, pp. 174-76 ; Arun Bose, op, cit., *Miscellany*, *The Sunday Statesman*, May, 1988, pp. 11-12 ; গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা, মনীষা, কলকাতা, জুন, ১৯৮৭, পৃ ১৮ ; শ্রীজ্ঞান

হালদার, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৮ ; অমলেশ ত্রিপাঠী, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস (১৯০৮—১৯৪৭)', (পর্ব ২৮), দেশ, বর্ষ ৫৫, সংখ্যা ৪৭, ৮ আশ্বিন, ১৩৯৫ বা. স., ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮, কলকাতা, পৃ ৯২ ; লেখক কর্তৃক গৃহীত অরুণ বোসের সাক্ষাৎকার—৭. ৬. ১৯৮৮ ; লেখক কর্তৃক গৃহীত রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—৮. ৫. ১৯৮৬ ; লেখক কর্তৃক গৃহীত গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার—১৩. ৪. ১৯৮৭ ; Chinmohan Sehanavis, op. cit., *Guidelines*, p 59.

২৮. গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৮ ; লেখক কর্তৃক গৃহীত রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—৮. ৫. ১৯৮৬ ; লেখক কর্তৃক গৃহীত গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার—১৩. ৪. ১৯৮৭ ; P. C. Joshi, *Communist Reply*, op. cit., pp. 39-40 ; Overstreet & Windmiller, op. cit., pp. 183-84 ; Shashi Bairathi, op. cit., p. 180 ; L. P. Sinha, op. cit., p. 502 ; Chinmohan Sehanavis, op. cit., *Guidelines*, pp. 59-60.

২৯. Shashi Bairathi, op. cit., pp. 176-77 ; Home/Poll./F. Nos. 7/7/1939 and 7/6/1939 ; Special Branch (S. B.), Government of Bengal—File Nos. S. R. 506/1940 (Part-II) and S. R. 506/1939 (Part-I).

৩০. Bairathi, op. cit., p. 177 ; Home/Poll./F. Nos. 7/7/1939 and 7/6/1939 ; S. B., File Nos. S. R. 506/1940 (Part-II) and S. R. 506/1939 (Part-I).

৩১. Home/Poll./F. No. 37/36/1939.

৩২. Home/Poll./F. No. 37/37/1939. File-এ "*Imperialist War and the Communist Party's Declaration*" নামে পুস্তিকাটির ইংরেজি অনুবাদ আছে, মূল বাংলা পুস্তিকাটি নেই। Home/Poll./File-গুলিতে সর্বক্ষেত্রেই মূল বাংলা পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা ও ইস্তাহারের ইংরেজি অনুবাদ আছে। ফলে উদ্ধৃত অংশের বঙ্গানুবাদ সর্বক্ষেত্রেই লেখকের।

৩৩. *Organization, Demand and Struggle of Mill Workers in the War Market*, Home/Poll./F. No. 37/38/1939.

৩৪. *During the War Fight for Independence, Proclamation of Communist Party on November Revolution Day*, Home/Poll./F. No. 37/40/1939.

৩৫. Home/Poll./F. No. 37/16/1940.

৩৬. Home/Poll./F. No. 37/19/1940.

৩৭. *The Call of the Communist Party to the Transport Workers*, Home/Poll./F. No. 37/1/1940.

৩৮. *Brother and Sister Workers of Jute Mills—Realize all your demands during the War and Fight under the Red Flag*, Home/Poll./F. No. 37/25/1940.

৩৯. Home/Poll./F. No. 37/31/1940—(i) *26th January, Friday—Independence Day—Declaration of the Communist Party* and (ii) *Independence Day and Appeal of the Communist Party to every man and woman of Bengal*.

৪০. Home/Poll./F. No. 37/27/1940.

৪১. *Communist Party's Call to Seamen, Port and Dock Workers*, Home/Poll./F. No. 37/36/1940.

৪২. Home/Poll./December 13, 1942/Progs., 103-58 ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, প্রথম খণ্ড (১৯৩০-১৯৪১), গণশক্তি পত্রিকা দপ্তর, কলকাতা, মে, ১৯৮৫, পৃ ১৪৮, ১৫০-৫১, ১৬৬, ১৭৫, ১৯৯, ২০৩ ; রণেন সেন, বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০-'৪৮), বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, মে, ১৯৮১, পৃ ১১৬, ১২০-১২১ ; ভবানী সেন, রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট, ১৯৪৩ সালের ১৮-২১ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত তৃতীয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের শাখা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলনে পঠিত ও সম্মেলনে গৃহীত, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের শাখা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির তরফে নিরঞ্জন সেন কর্তৃক আরও কয়েকটি দলিল সহ বাংলায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯৪৩, পৃ ২৫-২৭, (প্রথম প্রবন্ধ) ; Panchanan Saha, *History of the Working Class Movement in Bengal*, People's Publishing House, New Delhi, August, 1978, p. 178 ; লেখকের সঙ্গে রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—৮. ৫. ১৯৮৬ ; লেখকের সঙ্গে সমর মুখার্জীর সাক্ষাৎকার—৬. ৬. ১৯৮৬, ১৬. ৭. ১৯৮৭ ; লেখকের সঙ্গে কালী মুখার্জীর সাক্ষাৎকার—২৫. ৮. ১৯৮৬।

৪৩. Chinmohan Sehanavis, op. cit., *Guidelines*, p. 59 ; B. P. Sinha, op. cit, pp. 495-96 ; শ্রীজ্ঞান হালদার, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৮।

৪৪. লেখকের সঙ্গে রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—২১. ১. ১৯৮৭।

৪৫. লেখকের সঙ্গে বীরেন রায়ের সাক্ষাৎকার—২. ৮. ১৯৮৬, ৬. ৮. ১৯৮৬, ২৫. ২. ১৯৮৭—বিশেষতঃ ৬. ৮. ১৯৮৬ ; মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, 'কলকাতায় ধাঙড় ধর্মঘট এবং প্রভাবতী দাশগুপ্ত ও সাকিনা বেগম (১৯২৮ ও ১৯৪০)',

ইতিহাস-অনুসন্ধান, (দ্বিতীয় খণ্ড), গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কে. পি. বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ ৩০৯-১৩; Sukomal Sen, *Working Class of India : History of Emergence and Movement : 1830-1970*, K. P. Bagchi & Company, Calcutta, 1979, p. 386; মনোরঞ্জন রায়, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও শ্রমিক আন্দোলন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, জুলাই, ১৯৮৭, পৃ ৫২; Chinmohan Sehanavis, op. cit., *Guidelines*, p. 59.

৪৬. অমিতাভ চন্দ্র (সম্পাদিত), 'সুরথ পাছাল-এর স্মৃতিচারণ', (অমিতাভ চন্দ্রের ভূমিকা, টীকা ও মন্তব্য সম্বলিত), বারোমাস, নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শারদীয়, ১৩৯৪ বা স, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৮৭, কলকাতা, পৃ ৪৮, ৫৮, ৬৬; Sukomal Sen, op. cit., p. 359; Panchanan Saha, op. cit., p. 163.

৪৭. Sukomal Sen, op. cit., p. 386; Panchanan Saha, op. cit., p. 180; মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫৯-৬০; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৬৫; অমিতাভ চন্দ্র, 'বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি —সংগঠন ও রাজনীতি (১৯৩২-১৯৪৪)', ইতিহাস-অনুসন্ধান, (তৃতীয় খণ্ড), গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কে. পি. বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ ৪৬১; লেখকের সঙ্গে নন্দলাল বসুর সাক্ষাৎকার—১২. ৮. ১৯৮৭।

৪৮. Panchanan Saha, op. cit., p. 180; লেখকের সঙ্গে গোপাল আচার্যের সাক্ষাৎকার—১. ৫. ১৯৮৬, ২৭. ১২. ১৯৮৬; লেখকের সঙ্গে রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—২১. ১. ১৯৮৭; লেখকের সঙ্গে সুধাংশু দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার—১০. ১. ১৯৮৭।

৪৯. সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৬৪।

৫০. সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৬৫; রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—২১. ১. ১৯৮৭; অজয় দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার—১. ১. ১৯৮৭; জলিমোহন কাউলের সাক্ষাৎকার—২৮. ১২. ১৯৮৬।

৫১. সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৬০-৬২, ১৬৮-৬৯।

৫২. শ্রীজ্ঞান হালদার, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৮।

৫৩. মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৬০।

৫৪. Home/Poll./F. No. 37/27/1940; গৌতম চট্টোপাধ্যায়, স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ, চারুপ্রকাশ, কলকাতা, মার্চ, ১৯৮০, পৃ ৪৯-৫০; গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার—৮. ৪. ১৯৮৭, ১৩. ৪. ১৯৮৭।

৫৫. গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫০-৫১; গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের

সাক্ষাৎকার—৮. ৪. ১৯৮৭, ১৩. ৪. ১৯৮৭ ; সুবোধ দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার—২৬. ১. ১৯৮৭, ৯. ৪. ১৯৮৭ ।

৫৬. গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫১-৫৩ ; গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার—১৩. ৪. ১৯৮৭ ।

৫৭. গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫৩-৫৪ ; গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার—১৩. ৪. ১৯৮৭ ।

৫৮. জলিমোহন কাউলের সাক্ষাৎকার—২৮. ১২. ১৯৮৬, ১২. ৩. ১৯৮৭ ; সুধী প্রধানের সাক্ষাৎকার—১৪. ৪. ১৯৮৭ ; চিন্মোহন সেহানবীশের সাক্ষাৎকার—১৪. ৬. ১৯৮৬ ।

৫৯. সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৬৬, ১৭৫ ; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১২৯-৩০ ; রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—৮. ৫. ১৯৮৬, ১৫. ১. ১৯৮৭ ; সুধী প্রধানের সাক্ষাৎকার—১৪. ৪. ১৯৮৭, ১৬. ৪. ১৯৮৭ ।

৬০. রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৪-২৫ ; রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—১৫.১. ১৯৮৭ '

৬১. সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৭৯-৮০, ২১৩ ; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৭০-৭১ ; রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—৮.৫.১৯৮৬, ১৫.১.১৯৮৭ ; অজিত রায়ের সাক্ষাৎকার—৯.১.১৯৮৭ ; সুধাংশু দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার—১০.১. ১৯৮৭ ; অজয় দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার—৩.২.১৯৮৭ ।

৬২. ভবানী সেন, রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৪-৩৬, (প্রথম প্রবন্ধ) ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৬৬ ।

৬৩. বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির রিপোর্ট, ৭ এপ্রিল, ১৯৪১ । রিপোর্টটির জন্য দেখুন —সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৯৩-৯৪ ।

৬৪. ভবানী সেন, রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৮-২৯, (প্রথম প্রবন্ধ) ।

৬৫. Arun Bose, op. cit., *Miscellany*, *The Sunday Statesman*, May 1, 1988, p. 12.

৬৬. ভবানী সেন, রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৯, (প্রথম প্রবন্ধ) ।

৬৭. P. C. Joshi, *Communist Reply*, op. cit., p. 40.

৬৮. *The Proletarian Path*, op. cit., pp. 10.

৬৯. P. C. Joshi, *Communist Reply*, op. cit., p. 41.

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজম

জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজম : মধ্যবর্তী কয়েকটি স্তর

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য তিনটি ধারা হল : (১) কংগ্রেস আন্দোলন, (২) সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন ও (৩) কমিউনিস্ট আন্দোলন। আমি এই প্রবন্ধে কমিউনিস্ট আন্দোলন বলতে কেবলমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত আন্দোলনকেই বোঝাচ্ছি না, কথাটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে কমিউনিজম বা মার্কসবাদী মতাদর্শ গ্রহণকারী সমগ্র আন্দোলনটিকেই বোঝাচ্ছি, যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতীত অন্যান্য মার্কসবাদী দলগুলিরও ভূমিকা আছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের এই তৃতীয় ধারাটি অর্থাৎ কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারাটি পুষ্ট ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল প্রথম দুটি ধারার এবং বিশেষত দ্বিতীয় ধারার অগ্রণী সৈনিকদের এক বড় অংশের যোগদানের ফলে। বর্তমান প্রবন্ধে আমি সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন বা কমিউনিস্ট আন্দোলন, কোনওটিরই বিবরণ বা বিশ্লেষণে যাচ্ছি না। এই প্রবন্ধের পরিসরে আমি জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ পর্বের মধ্যবর্তী বিভিন্ন স্তরের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণেই নিজেকে নিয়োজিত রাখছি।

বিপ্লবী "সন্ত্রাসবাদ" নয়, "জাতীয় বিপ্লববাদ"

স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগের জাতীয় বিপ্লবীদের সাধারণভাবে বিপ্লবী "সন্ত্রাসবাদী" বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তৎকালীন বিপ্লবীদের হেয় করার উদ্দেশ্যেই "সন্ত্রাসবাদী" শব্দটি ব্যবহার করেছিল। পরবর্তীকালে বিপ্লবী "সন্ত্রাসবাদী" কথাটিরই বহুল প্রচলন দেখা যায়। এমনকি বামপন্থী মহলও অনেক ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম নয়। নিঃসন্দেহে এই বিপ্লবীদের কর্মপদ্ধতি ছিল "সন্ত্রাসবাদী"। এই "সন্ত্রাসবাদী" কর্মপদ্ধতির সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য এবং এই সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করেই এই বিপ্লবীদের অনেকেরই কমিউনিজমে উত্তরণ। কিন্তু যেহেতু শুধুমাত্র "সন্ত্রাসবাদী" শব্দটি ব্যবহার করে তৎকালীন বিপ্লবী আন্দোলনের পূর্ণ চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলা সম্ভবপর নয়, সেহেতু আমি স্বাধীনতা আন্দোলনের এই ধারাটি সম্পর্কে "জাতীয় বিপ্লববাদ" আখ্যাটি এবং এই ধারার সৈনিকদের সম্বন্ধে "জাতীয় বিপ্লবী" ও "জাতীয় বিপ্লববাদী" আখ্যা দুটি ব্যবহার করছি। অবশ্য তাঁদের কর্মপদ্ধতি আলোচনার ক্ষেত্রে আমি "সন্ত্রাসবাদী" শব্দটিরই আশ্রয় গ্রহণ করছি।

প্রসিদ্ধ অনুশীলন বিপ্লবী ও পরবর্তীকালের কমিউনিস্ট নেতা সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার তাঁর ***In Search of A Revolutionary Ideology and A Revolutionary Programme : A Study in the Transition from National Revolutionary Terrorism to Communism*** বইতে মার্কসীয় তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়

বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর এই বই-এর 'Preface' থেকে কিছু অংশ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় উদ্ধৃত করছি। সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার লিখেছেন—"The epithet 'terrorism' was used and widely circulated by the British government in order to discredit the revolutionaries in the eyes of the public."[১] তিনি এই নিছক "সন্ত্রাসবাদী" আখ্যার তীব্র বিরোধিতা করে লিখেছেন—"Any one conversant with the history of the national-revolutionary movement in India will realise that the above is a very much one-sided and distorted definition of the national revolutionaries. The revolutionaries, though they resorted to terroristic actions frequently, did not believe in terrorism for terrorism's sake. Nor did they believe that by terroristic actions they would be able to liberate the country from the foreign yoke. Their aim was the organisation of nationwide armed insurrection revolt by the Indian soldiers and guerilla warfare against the British government in order to achieve the goal of complete independence."[২] "Revolutionary terrorism" কথাটি ব্যবহার করা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—"The term 'revolutionary terrorism' may have to be used in this work. This may have to be done for the sake of brevity and also because it has gained such wide currency that it is now almost universally used even by Marxist research workers. But if it is used in this work it would be done with the reservations stated in the preceding pages."[৩]

একই প্রসঙ্গে অপর একজন প্রখ্যাত কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক চিন্মোহন সেহানবীশ লিখেছেন—"যে জাতীয় বিপ্লবীদের এক সময়ে এ দেশে terrorist (সন্ত্রাসবাদী) বা anarchist (নৈরাজ্যবাদী) বলা হত, অসম সাহসিকতা বা চূড়ান্ত আত্মদানের মাপ-কাঠিতে কিন্তু আমাদের দেশে তাঁদের স্থান কারো চাইতে নিচে নয়। ইংরেজ শাসক তাঁদের সম্পর্কে ঐ দু'টি অভিধা যথেচ্ছ প্রয়োগ করত, তার কারণ বুঝি। অবাক লাগে যখন সাধারণভাবে, এমনকি কিছুটা বামপন্থী মহলেও কখনো কখনো আজও এঁদের anarchist হয়ত নয়, তবে terrorist নামে উল্লিখিত হতে শুনি। কেউ কেউ বা এঁদের সবাইকে ঢালাওভাবে 'জাতীয় বিপ্লবী' বলতে নারাজ এই কারণে যে, এঁদের অনেকেরই সামন্ততন্ত্রবিরোধী চিন্তা সুস্পষ্ট ছিল না। কিন্তু আমার এঁদের 'জাতীয় বিপ্লবী' বলতে বাধে না, কারণ আমার মনে হয় ধ্যানধারণার দিক থেকে তাঁরা যতই দুর্বল থাকুন না কেন, পরাধীন ভারতে আমাদের সর্বপ্রধান প্রতিপক্ষ যেহেতু ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ (নিশ্চয়ই আমাদের অপর প্রতিপক্ষ, সামন্ততন্ত্রও শেষ অবধি টিকে থাকত সাম্রাজ্যবাদেরই

জোরে) তাই বাস্তবক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের মৃত্যুপণ সংগ্রাম নিশ্চয়ই ভারতের জাতীয় বিপ্লব প্রক্রিয়াকেই ত্বরান্বিত করেছিল। আর তাই তাঁরা নিশ্চয়ই জাতীয় বিপ্লবী।"[৪]

সুতরাং সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ও চিন্মোহন সেহানবীশের লেখায় তৎকালীন বিপ্লবীদের "জাতীয় বিপ্লবী" বা "জাতীয় বিপ্লববাদী" আখ্যা প্রদানেরই সমর্থন মেলে।

রুশ বিপ্লব : নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ ও নতুন পথের সন্ধান

১৯১৭ সালের রাশিয়ার মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব এসে পড়ে ভারতে। বিশেষভাবে এই বিপ্লবের প্রভাব অনুভব করেন বাংলার তথা ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রণী সেনাদের অর্থাৎ জাতীয় বিপ্লবীদের এক অংশ। তখন বাংলায় জাতীয় বিপ্লবীদের দুটি প্রধান দল ছিল—যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতি। এই জাতীয় বিপ্লবীরা এতদিন বৈপ্লবিক "সন্ত্রাসবাদী" পথেই ভারতকে স্বাধীন করার কাজে ব্রতী ছিলেন। অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে সাধারণভাবে জাতীয় বিপ্লবীদের একাংশের মধ্যে এবং বিশেষভাবে অনুশীলন বিপ্লবী দলের তরুণ সদস্যদের মধ্যে শুরু হয় আত্মানুসন্ধান। অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়লাভে অনুপ্রাণিত তরুণ অনুশীলন বিপ্লবীরা উপলব্ধি করেন, এতদিনকার অনুসৃত বৈপ্লবিক "সন্ত্রাসবাদী" পথে নিঃসন্দেহে বীরত্ব আছে, আছে আত্মত্যাগের মহিমা, জাতীয় বিপ্লবীদের দেশপ্রেমও প্রশ্নাতীত, কিন্তু এই পথ ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। তাঁরা উপলব্ধি করেন, শুধুমাত্র "সন্ত্রাসবাদী" পথে কখনই কোনও বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে না, বিপ্লবের বিজয়লাভের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক জনসাধারণের অংশগ্রহণ। শ্রমিক-কৃষকের অংশগ্রহণসঞ্জাত গণবিপ্লবই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র পথ—রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা ক্রমশ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ : সংবাদপত্রের ভূমিকা

জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের ক্ষেত্রে তৎকালীন বাংলা সংবাদপত্র এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। সমকালীন বাংলা সংবাদপত্রে রুশ মহাবিপ্লব ও লেনিন-সম্পর্কিত রচনা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হতে থাকে। বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্যের মাত্র অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই 'দৈনিক বসুমতী' এ সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করে। পরবর্তীকালে অন্যান্য বাংলা পত্র-পত্রিকাতেও বলশেভিক বিপ্লব ও লেনিন-সম্পর্কিত সংবাদ ও প্রবন্ধাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।[৫]

সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল দৈনিক বসুমতী, আনন্দবাজার পত্রিকা, অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী, ফরওয়ার্ড, দৈনিক বঙ্গবাণী, বাঙলার কথা, হিন্দু, বম্বে ক্রনিকল প্রভৃতি। আর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত

সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে এ ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল আত্মশক্তি (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), শঙ্খ (শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও নলিনী-কিশোর গুহ সম্পাদিত), বিজলী (বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত), নবশক্তি, ধূমকেতু, লাঙ্গল, গণবাণী, বঙ্গবাণী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, প্রাচী, বাংলার বাণী (ঢাকা), মোহাম্মদী (মাসিক), মোসলেম ভারত, সাম্যবাদী, শ্রমিক, মাসিক বসুমতী, সোনার বাংলা, সংহতি, জনসেবক, মানসী ও মর্মবাণী, নব্যভারত প্রভৃতি।[৬] এই সাময়িক পত্র-পত্রিকা-সমূহের মধ্যে আবার আত্মশক্তি ও শঙ্খ-এর কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা দরকার। ফণীভূষণ ঘোষের লেনিন নামক জীবনী পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় ১৩২৮ সালের ভাদ্র মাসে অর্থাৎ ১৯২১ সালের আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে। বাংলা ভাষায় লেনিন সম্পর্কে প্রথম প্রকাশিত এই পুস্তিকাটির গুরুত্ব অপরিসীম। শঙ্খ পত্রিকার প্রথম বর্ষের ৩য় সংখ্যা থেকে ৪৭ সংখ্যা (১২ চৈত্র ১৩২৮—৭ ফাল্গুন ১৩২৯, মার্চ ১৯২১—ফেব্রুআরি ১৯২২) অবধি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় শচীন্দ্রনাথ সান্যালের প্রবন্ধ—'লেনিন ও সমসাময়িক রুশিয়া।' আত্মশক্তি পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের ৭ম সংখ্যা থেকে ১২শ সংখ্যা (৫ বৈশাখ—৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০, ১৮ এপ্রিল—২৩ মে ১৯২৩) অবধি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় অমূল্যচরণ অধিকারীর প্রবন্ধ—'লেনিনের জীবনকথা।' বলশেভিক বিপ্লবকে জোরালো ভাষায় সমর্থন জানিয়ে আত্মশক্তি পত্রিকার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল 'অনন্তানন্দের পত্র।' 'অনন্তানন্দ' ছিল বিপ্লবী লেখক—সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। 'অনন্তানন্দের পত্র' প্রথম প্রকাশিত হয় বঙ্গবাণী পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৯, দ্বিতীয়ার্ধ)। প্রবন্ধটি আত্মশক্তি পত্রিকায় (২২ নভেম্বর ১৯২২) পুনর্মুদ্রিত হয়। এইগুলি ছাড়াও লেনিন ও বলশেভিক বিপ্লব সম্পর্কিত আরও বহু প্রবন্ধ পূর্বোল্লিখিত পত্র-পত্রিকাসমূহে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ সালে আত্মশক্তি পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় শিবরাম চক্রবর্তীর কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়। শিবরাম চক্রবর্তী এক সময়ে আত্মশক্তি-র সম্পাদকও ছিলেন। ১৯২৯ সালে ও পরবর্তীকালে নবশক্তি পত্রিকাতেও শিবরাম চক্রবর্তীর বেশ কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়। সবকটি রচনাতেই তিনি অননুকরণীয় লেখনীর সাহায্যে রুশ মহাবিপ্লব ও বলশেভিক মতাদর্শকে জোরালো সমর্থন জানান। 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' এ বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা।[৭] নতুন চিন্তাধারার উন্মেষে ও নতুন পথের সন্ধানে এই প্রবন্ধগুলির সহায়ক ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে।

মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখোপাধ্যায় ও নলিনী গুপ্তের অবদান

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে সাহায্যের উদ্দেশ্যে নলিনী গুপ্ত ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর কলকাতা পৌঁছেছিলেন। নলিনী গুপ্ত কলকাতায় এসে প্রথমে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের

চেষ্টা করেন। সেবারে সেই চেষ্টা খুব সাফল্য লাভ করেনি। তিনি বাংলার প্রথম কমিউনিস্ট ও বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের জনক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। নলিনী গুপ্তের সঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের যোগাযোগ কলকাতায় কমিউনিস্ট কাজকর্মের সূত্রপাত ঘটায়। নলিনী গুপ্তের মাধ্যমেই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ১৯২২ সালের মার্চ মাসে নলিনী গুপ্ত ফিরে যান। ১৯২২ সালের শেষভাগে নলিনী গুপ্ত কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে সাহায্যের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন। ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে একই উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বিরোধী অবনী মুখোপাধ্যায়। উভয়েই পৃথকভাবে অনুশীলন ও যুগান্তর বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালান। এই কাজে অবনী মুখোপাধ্যায়ের তুলনায় নলিনী গুপ্ত অধিক সাফল্য অর্জন করেছিলেন। যুগান্তর বিপ্লবীদের কাছে দু'জনের কেউই সেভাবে গ্রহণযোগ্য হননি। অনুশীলন বিপ্লবীদের সঙ্গে দু'জনেরই যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল, তবে অনুশীলন বিপ্লবীদের উপর প্রভাব বিস্তারের ব্যাপারে নলিনী গুপ্ত ছিলেন অধিক সফল। একমাত্র বিপ্লবী সন্তোষকুমার মিত্রকে কমিউনিস্ট ভাবধারায় বেশ কিছুটা প্রভাবিত করতে অবনী মুখোপাধ্যায় সফল হয়েছিলেন। ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে অবনী মুখোপাধ্যায় ফিরে যান। অপরদিকে নলিনী গুপ্তের প্রচেষ্টায় ও ব্যবস্থাপনায় অনুশীলন সমিতির তরফ থেকে ১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে মস্কো পাঠানো হয়। বলশেভিক বিপ্লব-পরবর্তী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে ১৯২৬ সালের একদম গোড়ার দিকে গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ভারতে ফিরে আসেন।[৮] জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ পর্বে মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখোপাধ্যায় ও বিশেষ করে নলিনী গুপ্তের ভূমিকা এবং গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মস্কো যাত্রা নিঃসন্দেহে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ : সূচনা পর্ব

১৯১৭ সালের রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের বিজয়লাভে অনুপ্রাণিত ধরণী গোস্বামী, গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গোপাল বসাক, মণি সিংহ, নলীন্দ্র মোহন সেন, নীরোদ চক্রবর্তী, পিয়ারী মোহন দাস, আশু রায় প্রমুখ তরুণ অনুশীলন বিপ্লবীরা কমিউনিস্ট ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বৈপ্লবিক "সন্ত্রাসবাদে"র পথ পরিত্যাগ করে ১৯২০ সাল নাগাদই কমিউনিজমকে রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে কমিউনিজমকে গ্রহণ করা সত্ত্বেও এই তরুণ অনুশীলন বিপ্লবীরা সঙ্গে সঙ্গেই দল ছেড়ে বেরিয়ে এসে পৃথক একটি কমিউনিস্ট দল গঠন করার কোনও প্রচেষ্টা চালাননি। বরং রাজনৈতিক মতাদর্শগতভাবে কমিউনিস্ট হওয়ার পর এই তরুণ অনুশীলন বিপ্লবীদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা হয় সমগ্র অনুশীলন সমিতিকেই মার্কসবাদী মতে বিশ্বাসী করে তোলা।

তৎকালীন অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বে ছিলেন প্রতুল গাঙ্গুলী, নরেন সেন, রমেশচন্দ্র চৌধুরী, রমেশচন্দ্র আচার্য, কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিপ্লবীরা। অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় অর্জন তাঁদেরও অনুপ্রাণিত করে। তাঁরাও এই বিপ্লবকে উচ্চ প্রশংসায় প্রশংসিত করেন। তাঁদের মধ্যে প্রতুল গাঙ্গুলী মার্কসবাদী ভাবধারাতে আকৃষ্টও হন। কিন্তু অনুশীলন নেতারা তখনই বৈপ্লবিক "সন্ত্রাসবাদী" পথ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করতে এবং অনুশীলন দলকে একটি মার্কসবাদী দলে পরিণত করে গণবিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী হন না। ফলে অনুশীলন নেতৃত্বের সঙ্গে কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণকারী তরুণ অনুশীলন বিপ্লবীদের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।

বিদ্রোহী অনুশীলন বিপ্লবীরা প্রথমে অনুশীলন সমিতির মধ্যেই একটি কমিউনিস্ট গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কমিউনিস্ট গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করার পর তাঁরা তৎকালীন অনুশীলন নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে মতবিরোধের মীমাংসা করার এবং সম্ভব হলে তাঁদের কমিউনিস্ট মতে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চলোতে থাকেন। কিন্তু অনুশীলন নেতৃত্ব এই ধরনের আলোচনায় বিশেষ উৎসাহী না হওয়ায় সেই প্রচেষ্টা আদৌ ফলপ্রসূ হয়নি। দ্বিধাগ্রস্ত অনুশীলন নেতৃত্বের সঙ্গে বিদ্রোহী অনুশীলন বিপ্লবীদের শেষ পর্যন্ত একটি সাক্ষাৎ আলোচনার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু আলোচনায় প্রতিপন্ন হল মতাদর্শগত এবং কর্মপন্থা-সংক্রান্ত উভয় ধরনের বিরোধই মীমাংসার অতীত। ফলে আলোচনা ভেঙ্গে যায়। অনুশীলন নেতৃত্বের সঙ্গে আর মানিয়ে চলা অসম্ভব অনুভব করে বিদ্রোহী কমিউনিস্ট অনুশীলন বিপ্লবীরা অনুশীলন সমিতি ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন।[৯]

১৯২৬ সালে ধরণী গোস্বামী, গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গোপাল বসাক, মণি সিংহ, নলীন্দ্র মোহন সেন, নীরোদ চক্রবর্তী, পিয়ারী মোহন দাস, আশু রায় প্রমুখের কমিউনিস্ট গ্রুপটি অনুশীলন সমিতি পরিত্যাগ করে বেরিয়ে এসে শ্রমিক, কৃষক ও যুবকদের আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করেন। একই সঙ্গে এই গ্রুপ বিভিন্ন জেলার অনুশীলন সমিতির মাঝের সারির ও নীচের সারির কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং এই গ্রুপের প্রভাবে সংযোগ রক্ষাকারী অনুশীলন কর্মীরা নিজেদের শাখার তরুণদের মধ্যে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করতেন। এইভাবে এই কমিউনিস্ট গ্রুপের প্রভাব ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং অনুশীলন বিপ্লবীদের মধ্যে ক্রমশ কমিউনিস্ট মতবাদের প্রসারও ঘটতে থাকে। ১৯২৬ সালের শেষদিকে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী এই কমিউনিস্ট অনুশীলন বিপ্লবীরা নিজেদের পৃথক কমিউনিস্ট গ্রুপের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করার উদ্দেশ্যে বাংলায় তৎকালে কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান সংগঠক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং ঐ বছরেই ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্ট্‌স্ পার্টিতে যোগদান করেন।[১০] ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্ট্‌স্ পার্টির সভ্য হিসাবে এই তরুণ কমিউনিস্টরা কৃষক আন্দোলন এবং বিশেষ করে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বৈপ্লবিক "সন্ত্রাসবাদী" পথ ত্যাগ করার পর

এইভাবেই শুরু হয় এই তরুণ বিপ্লবীদের শ্রমিক আন্দোলনে তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রথম পাঠ।

১৯২৮ সালের একদম গোড়ার দিকে (১লা ফেব্রুআরির আগে) ধরণী গোস্বামীর এবং ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্ট্স্ পার্টির অন্যান্য কয়েকজন তরুণ সদস্যের প্রচেষ্টায় কলকাতায় ইয়ং কমরেডস্ লীগ নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। (মতান্তরে ১৯২৮ সালের শেষভাগে এই সংগঠন গঠিত হয়)।[১১] এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং বিশেষ করে শ্রমিক পরিবারের যুবক ও তরুণ শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রচার ও প্রসার। এই সময় অপর বিপ্লবী দল যুগান্তরেও ভাঙন ধরে। বেশ কিছুসংখ্যক যুগান্তর বিপ্লবীও কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করে যুগান্তর দল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এই দলত্যাগী যুগান্তর ও অনুশীলন বিপ্লবীদের অনেকেই সদ্যগঠিত ইয়ং কমরেডস্ লীগে যোগদান করেন। ইয়ং কমরেডস্ লীগই ছিল বাংলার প্রথম সেতুসদৃশ কমিউনিস্ট সংগঠন, যার মাধ্যমে জাতীয় বিপ্লবীদের প্রথম অংশটি বৈপ্লবিক "সন্ত্রাসবাদ"-এর পথ পরিত্যাগ করে কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেন এবং গণবিপ্লবের পথ অবলম্বন করেন। জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ পর্বে ইয়ং কমরেডস্ লীগ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অবদান

১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে, ভারত ছাড়ার সতের বছর পরে, প্রখ্যাত বিপ্লবী ও মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ফিরে আসেন কলকাতায়।[১২] দেশে ফেরার পর ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এখানে মার্কসবাদ প্রসারে অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। একদিকে ডঃ দত্ত ছাত্র-যুবকদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে মার্কসবাদ প্রচার করেছেন আর অপরদিকে শ্রমিক আন্দোলনে, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে ও কৃষক আন্দোলনেও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তরুণ জাতীয় বিপ্লবীদের নিষ্ঠাসহকারে বুঝিয়েছেন বৈপ্লবিক "সন্ত্রাসবাদী" পথের সীমাবদ্ধতা ও নিষ্ফলতা, দীক্ষিত করেছেন মার্কসবাদে, উপদেশ দিয়েছেন ও উৎসাহিত করেছেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং তাঁর কাছে মার্কসবাদের জ্ঞান ও কমিউনিস্ট মতাদর্শে দীক্ষা অর্জন করে বহু যুবক কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ পর্বের প্রাথমিক স্তরের সবকটি কমিউনিস্ট সংগঠনের সঙ্গেই ডঃ দত্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। নিজে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হলেও সারাজীবন কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগী ছিলেন। জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণে এবং ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অবদান চিরস্মরণীয়।

শ্রমিক আন্দোলনের ভূমিকা

১৯২৭ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে কলকাতায়

এবং পার্শ্ববর্তী হাওড়া জেলার বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে, শ্রমিক আন্দোলনের ও ধর্মঘটের এক প্রবাহ বয়ে যায়। রেল শ্রমিক ধর্মঘট, চটকল শ্রমিক ধর্মঘট, ঝাড়ুদার ও মেথর ধর্মঘট, গাড়োয়ান ধর্মঘট, অন্যান্য শিল্প-শ্রমিক ধর্মঘট প্রভৃতি শ্রমিক আন্দোলনে নিয়ে আসে এক নতুন জোয়ার, উন্মেষ ঘটায় এক নতুন দিগন্তের। শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের এই প্রবাহ ও সাফল্য জাতীয় বিপ্লববাদীদেরও সীমাবদ্ধ গণ্ডির বাইরে নতুন ভাবনা-চিন্তায় উজ্জীবিত করে, বোঝাতে সক্ষম হয় শ্রমিক-কৃষকের অংশগ্রহণসঞ্জাত গণ-বিপ্লবের সার্থকতা। একদিকে উত্তরণ পর্বে এই শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটগুলি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল আর অপরদিকে জাতীয় বিপ্লবী সংগঠন পরিত্যাগকারী ও কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণকারী প্রাক্তন জাতীয় বিপ্লবীরা ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্ট্‌স্ পার্টি'র সদস্য হিসাবে ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই আন্দোলন ও ধর্মঘটগুলিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে নেতৃত্বও প্রদান করেছিলেন।

জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ : মধ্যবর্তী বিভিন্ন স্তর

জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের পর্বটিকে আমি বর্তমান প্রবন্ধে দুটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করব। প্রথম ভাগে আসবে "ভারতের বাস্তিল" আন্দামানের সেলুলার জেলে, অন্যান্য জেলে ও বিভিন্ন ডিটেন্‌শন্ ক্যাম্পে (বন্দীশিবির) জাতীয় বিপ্লববাদ পরিত্যাগ করে কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণের বিষয়টি। এই প্রসঙ্গেই আসবে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন কমিটির কথা। দ্বিতীয় ভাগে আসবে জেলের ও বন্দীশিবিরের বাইরেই বিভিন্ন মধ্যবর্তী সংগঠনের মাধ্যমে জাতীয় বিপ্লববাদ পরিত্যাগ করে কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণের বিষয়টি। এই ধরনের মধ্যবর্তী সংগঠনগুলিকে আমি আবার দুটি ভাগে বিভক্ত করছি। প্রথম ভাগে আসবে সেই সংগঠনগুলি, যেগুলিকে সাধারণভাবে "টেরো-কমিউনিস্ট" বা "টেরো-সোশ্যালিস্ট" হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। (অন্য কোনও উপযুক্ত আখ্যার অভাবে এই সংগঠনগুলি সম্পর্কে এই নাম দুটি ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছি)। দ্বিতীয় ভাগে আসবে সেই সংগঠনগুলি, যেগুলিকে আমি প্রাথমিক স্তরের কমিউনিস্ট সংগঠন বলে অভিহিত করছি। বর্তমান আলোচনায় এই সংগঠনগুলির স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সেলুলার জেলে, অন্যান্য জেলে ও বিভিন্ন বন্দীশিবিরে কমিউনিজমে উত্তরণ

বিশের দশকের শেষভাগে ও তিরিশের দশকের প্রথমভাগে যে-সমস্ত বিপ্লবী বন্দী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার কারণে দীর্ঘ মেয়াদে দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাঁদেরই ১৯৩২ সালের জুলাই মাস থেকে দলে দলে আন্দামানের সেলুলার জেলে নির্বাসনে পাঠানো শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন ব্যাচে যাঁদের আন্দামানে পাঠানো হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা, চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের

চোখে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন), মেছুয়াবাজার বোমার ও ষড়যন্ত্র মামলা, ডালহৌসি স্কোয়ার ও ক্যালকাটা বোমার মামলা, পাবনা ষড়যন্ত্র মামলা, দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা, বেগুট রাজনৈতিক ডাকাতি মামলা (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কখনই রাজনৈতিক ডাকাতিকে সাধারণ ডাকাতি থেকে পৃথক করেনি), অন্যান্য আরো বহু ষড়যন্ত্র, ডাকাতি ও বোমার মামলা প্রভৃতির অভিযোগে অভিযুক্ত এবং অস্ত্র-আইনের সাজাপ্রাপ্ত বন্দীরা। এ-ছাড়াও আরও বহু বিপ্লবী বন্দী বহরমপুর, বক্সা, হিজলী ও দেউলী বন্দিশিবিরে এবং প্রেসিডেন্সি জেল, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল, দমদম সেণ্ট্রাল জেল ও অন্যান্য বিভিন্ন জেলে আটক ছিলেন। এই বিপ্লবী বন্দীদের অধিকাংশেরই মনে বারবার যে প্রশ্নটির নাড়া দেওয়া শুরু হয়, সেটি হল : যে-পথে এতদিন সংগ্রাম করে আসা হয়েছে, সে-পথে কি পূর্ণ স্বাধীনতা ও শোষিত জনগণের চূড়ান্ত মুক্তি সম্ভব ? এই প্রশ্নের উত্তর পেতেই শুরু হয় বিপ্লবী বন্দীদের মার্কসবাদ চর্চা ও নতুন পথের সন্ধান।

১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে আন্দামানের সেলুলার জেলে এলেন ডালহৌসি স্কোয়ার ও ক্যালকাটা বোমার মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ডাঃ নারায়ণ রায়। সঙ্গে এলেন মেছুয়াবাজার বোমার ও ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত নিরঞ্জন সেন ও সতীশ পাকড়াশী। আর তাঁদের সঙ্গেই এল কয়েকটি ট্রাঙ্ক বোঝাই মার্কসবাদী তত্ত্বের বই। ১৯৩৩ সালের ১২ মে থেকে সেলুলার জেলের বর্বর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শুরু হল আমরণ অনশন সংগ্রাম। এই অনশন সংগ্রাম চলল ৪৬ দিন। মহাবীর সিং-মোহনকিশোর নমোদাস-মোহিতমোহন মৈত্র—তিন শহিদের আত্মদানের বিনিময়ে জয়লাভে সমর্থ হল এই সংগ্রাম। এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের ঠিক পরেই ১৯৩৩ সালের জুলাই মাস থেকে ডাঃ নারায়ণ রায় ও নিরঞ্জন সেনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিপ্লবী দলের নির্বাসিত বন্দীদের একটা বড় অংশ নিজেদের অতীত বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে সব সম্পর্ক খোলাখুলিভাবে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে শুরু করলেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ চর্চা। প্রধান শিক্ষক হলেন ডাঃ নারায়ণ রায়। বাইরে যে ভূমিকাটি পালন করছিলেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সেলুলার জেলে ঠিক সেই ভূমিকাটিই পালন করা শুরু করলেন ডাঃ নারায়ণ রায়। শুরু হল জাতীয় বিপ্লবী বন্দীদের কমিউনিজমে প্রথম পাঠ গ্রহণ। সেলুলার জেল হয়ে উঠল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিক্ষার বিদ্যাপীঠ। আরম্ভ হল জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের এক নতুন অধ্যায়।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের গভীর অনুশীলনের পরিণতিতে জাতীয় বিপ্লবীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করেন। কমিউনিস্ট মতাদর্শ-গ্রহণকারী জাতীয় বিপ্লবীদের একটা বড় অংশ ১৯৩৫ সালের ২৬ এপ্রিল আন্দামানের সেলুলার জেলে গোপনে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন কমিটি গঠন করেন। ১ মে সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। বাংলা-বিহার-যুক্তপ্রদেশ-পাঞ্জাব মিলিয়ে মোট ৩৯জন বন্দী প্রাথমিকভাবে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন কমিটির সদস্য হন।[১৩] তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ নারায়ণ রায়, নিরঞ্জন সেন (সেনগুপ্ত), গোপাল আচার্য, রণধীর দাশগুপ্ত, বঙ্কেশ্বর

রায়, হরেকৃষ্ণ কোঙার, নলিনী দাস, বিজয়কুমার সিংহ, বটুকেশ্বর দত্ত প্রমুখ। পরবর্তী দু'বছরে কমিউনিস্ট মতাদর্শ-গ্রহণকারী আরও বহু বন্দী কনসলিডেশনের সদস্য হন। সেলুলার জেলে কনসলিডেশন গঠিত হওয়ার ঠিক পরেই অন্যান্য বিভিন্ন জেলে ও বন্দীশিবিরেও অনুরূপ কমিউনিস্ট কনসলিডেশন কমিটি গঠিত হয়। জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ পর্বে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন কমিটির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৪]

১৯৩৫-৩৬ সালে বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী ছাড়া পেলেও প্রধানত ১৯৩৭ সাল থেকেই সাজাপ্রাপ্ত ও বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি শুরু হয়। বন্দীমুক্তি চলে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত। মুক্তিপ্রাপ্ত জাতীয় বিপ্লবীদের একটা বড় অংশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যেই অবিভক্ত বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত জেলায় পূর্ণাঙ্গ পার্টি কমিটি অথবা নিদেনপক্ষে পার্টি সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়। সদ্য গঠিত এই কমিটিগুলির অধিকাংশেরই দায়িত্বে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানকারী এই জাতীয় বিপ্লবীরা।[১৫]

"টেররো-কমিউনিস্ট" বা "টেররো-সোশ্যালিস্ট" সংগঠনসমূহ

"টেররো-কমিউনিস্ট" বা "টেররো-সোশ্যালিস্ট" সংগঠন বলতে সেই সংগঠনগুলিকেই বোঝায় যেগুলির চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে বৈপ্লবিক "সন্ত্রাসবাদে"র সঙ্গে সমাজতন্ত্র ও গণ-আন্দোলনের সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। এই "টেররো-কমিউনিস্ট" বা "টেররো-সোশ্যালিস্ট" সংগঠনের ক্ষেত্রে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোশিয়েশনকেই (এইচ. আর. এ.) পথিকৃৎ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। অবশ্য এই ধরনের সংগঠনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য ছিল হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোশিয়েশন (এইচ. এস. আর. এ.)।

১৯২৪ সালে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও যোগেশ চন্দ্র চ্যাটার্জীর যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোশিয়েশন (এইচ. আর. এ.)। ১৯২৫ সালের ১ জানুআরি এই সংগঠনের তরফে প্রকাশিত *The Revolutionary* নামে পুস্তিকায় সমাজতন্ত্রের ও গণআন্দোলনের কথার উল্লেখ থাকলেও এবং এই সংগঠনের পক্ষ হতে বিদেশে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হলেও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে এইচ. আর. এ.-র ধ্যানধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না এবং পাল্লাটা অনেক বেশি ঝুঁকে ছিল বৈপ্লবিক "সন্ত্রাসবাদী" কর্মপদ্ধতির দিকেই। কাকোরী মেল ট্রেন ডাকাতির (৯ আগস্ট ১৯২৫) পরিণতিতে ব্যাপক ধরপাকড় ও কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় ব্যাপক শাস্তিপ্রদানের ফলে এইচ. আর. এ.-র কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসের শেষদিকে হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোশিয়েশন (এইচ. এস. আর. এ.) নামে সংগঠনটি পুনরুজ্জীবিত হয়। সংগঠনটির অপর নাম ছিল হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি। ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, বটুকেশ্বর দত্ত, যতীন্দ্রনাথ দাস,

শুখদেব, রাজগুরু, বিজয় কুমার সিংহ, অজয় কুমার ঘোষ প্রমুখের সংগঠন এইচ. এস. আর. এ. সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনায় পূর্বতন এইচ. আর. এ.-র তুলনায় আরও বেশি অগ্রসর ছিল। কমিউনিস্ট চিন্তার দিক দিয়ে এইচ. এস. আর. এ.-র বিপ্লবীদের মধ্যে আবার সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন ভগৎ সিং। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এইচ. এস. আর. এ.-র তরফে প্রকাশিত *The Philosophy of the Bomb* নামে একটি এবং অপর একটি ম্যানিফেস্টো সংগঠনের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার ও গণ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে। এইচ. এস. আর. এ. স্বাধীন ভারতে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু একই সঙ্গে এইচ. এস. আর. এ. বৈপ্লবিক "সন্ত্রাসবাদ"কেও পদ্ধতি হিসাবে অবলম্বন করেছিল। এইচ. এস. আর. এ.-র বিভিন্ন কাজকর্ম সুবিদিত বলে আমি আর সেগুলির বিস্তারিত বিবরণে যাচ্ছি না। কিন্তু এইচ. এস. আর. এ.-র কর্মপদ্ধতি ও এই কাজকর্ম-গুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ও গণ আন্দোলনে অংশগ্রহণের কথা বলা হলেও এই সংগঠন বৈপ্লবিক "সন্ত্রাসবাদ"কে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে যেতে পারে নি, বরং সেই পথকেই আশ্রয় করে থেকেছে। সেই কারণেই "টেরো-কমিউনিস্ট" বা "টেরো-সোশ্যালিস্ট" ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে এইচ. এস. আর. এ.-কে অভিহিত করা যেতে পারে। এইচ. এস. আর. এ.-র সমস্ত নেতা ও অগ্রণী কর্মী লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে সংগঠনটির কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে এইচ. এস. আর. এ.-এর এক দল কর্মী হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারী পার্টি (এইচ. এস. আর. পি.) নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের তরফে প্রকাশিত একটি দলিলে দেখা যায়, এইচ. এস. আর. পি. কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণের ও গণবিপ্লবে অংশগ্রহণের পথে পূর্বতন এইচ. এস. আর. এ.-র তুলনায় আরও বেশি অগ্রসর হয়েছিল, যদিও পূর্ববর্তী সংগঠনগুলির মতই বৈপ্লবিক "সন্ত্রাসবাদ"কেও কর্মপদ্ধতি হিসাবে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে নি। শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী অনেক স্বচ্ছ হওয়া সত্ত্বেও এবং শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণী দাবিগুলিকে অনেক বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরা সত্ত্বেও বৈপ্লবিক "সন্ত্রাসবাদ" ও সমাজতন্ত্রের সংমিশ্রণের কারণে এই সংগঠনটিকেও এই ধারারই অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।[১৬]

প্রাথমিক স্তরের কমিউনিস্ট সংগঠনসমূহ

জাতীয় বিপ্লবীদের অনেকেই বৈপ্লবিক "সন্ত্রাসবাদী" পথ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে ও কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর প্রভৃতি নিজ নিজ বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংশ্রব সম্পূর্ণ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার পর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার পূর্বে বেশ কয়েকটি কমিউনিস্ট সংগঠন গঠন করেছিলেন। পূর্বতন জাতীয় বিপ্লবীদের দ্বারা গঠিত এই কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির অধিকাংশ সদস্যই পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে ও আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের মধ্যবর্তী স্তর হিসাবে

প্রাথমিক স্তরের এই কমিউনিস্ট সংগঠনসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সংগঠনগুলির ভূমিকা অনেকটাই অনালোচিত এবং উপেক্ষিত থেকে গেছে। প্রাথমিক স্তরের এই কমিউনিস্ট সংগঠনসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল : (১) ইয়ং কমরেডস্ লীগ (ধরণী গোস্বামী, নীরোদ চক্রবর্তী, নলীন্দ্র মোহন সেন, মণীন্দ্র চক্রবর্তী, সুধাংশু কুমার অধিকারী, নগেন সরকার, ওয়ালি নওয়াজ, জ্যোতির্ময় শর্মা, রামরাঘব লাহিড়ী প্রমুখ ছিলেন নেতৃস্থানীয় সদস্য); (২) সোশ্যালিস্ট ইউথ লীগ (সন্তোষ কুমার মিত্র প্রতিষ্ঠিত—১৯২৮); (৩) যশোর-খুলনা যুব সংঘ (প্রমথ ভৌমিক, কৃষ্ণবিনোদ রায়, ভবানী সেন, শচীন্দ্রনাথ মিত্র, বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়, নির্মল চন্দ্র দাস প্রমুখ); (৪) ইণ্ডিয়ান প্রোলেটারিয়ান রেভলিউশনারী পার্টি (বিজয় মোদক, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, কালীচরণ ঘোষ, বিনয় চৌধুরী, মনোরঞ্জন হাজরা, স্মতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাল, সুশীতল রায়চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখ); (৫) সাম্যরাজ পার্টি (অঘোর সেন, বাদল গাঙ্গুলী, কুমুদনাথ দত্ত প্রমুখ); (৬) বেঙ্গল ইউথ লীগ (অজিত দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত—১৯৩০); (৭) ইউথ লীগ, বেঙ্গল (পূর্বোল্লিখিত সংগঠনটি ১৯৩৪ সালে এই নামে পুনরুজ্জীবিত হয়); (৮) কারখানা গ্রুপ (নেপাল ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত—১৯৩২, পরে ভবানী সেন কিছুদিনের জন্য যোগ দেন) প্রভৃতি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তরফ থেকে এই সংগঠনগুলিকে নির্বিচারে "আধা-সন্ত্রাসবাদী", "টেরো-কমিউনিস্ট", "কমিউনিস্ট-টেররিস্ট" প্রভৃতি বিভ্রান্তিমূলক আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে।[১৭] কিন্তু এই সংগঠনগুলির নেতৃস্থানীয় সদস্যরা কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করেই এই সংগঠনগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি বৈপ্লবিক "সন্ত্রাসবাদী" কাজকর্মে এই সংগঠনগুলির কয়েকটির কোনও কোনও সদস্য ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত থাকলেও এই সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে "সন্ত্রাসবাদী" পথ পরিত্যাগ করার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল এবং কমিউনিস্ট মতাদর্শ অনুযায়ী গণবিপ্লবকেই প্রকৃত পথ বলে মনে করে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে সচেতন অংশগ্রহণ করা হয়েছিল। এই সংগঠনগুলির অধিকাংশেরই নেতৃত্ব দেশব্যাপী গণ আইন অমান্য আন্দোলনে সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করে কংগ্রেস-নেতৃত্ব দ্বারা নির্দিষ্ট আন্দোলনের সীমারেখা অতিক্রম করে অন্তত আংশিকভাবে ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে এই আন্দোলনকেই গণঅভ্যুত্থানের রূপ দিতে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালের ৭ জুলাই থেকে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমা অঞ্চলে যে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়, তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব ছিল ইয়ং কমরেডস্ লীগের সদস্যদের। শ্রমিক ধর্মঘটে ও কৃষক আন্দোলনে এই সংগঠনগুলির সদস্যদের ভূমিকা অত্যন্ত উজ্জ্বল।[১৮]

● এই সংগঠনগুলি আজ প্রায় বিস্মৃতির অন্তরালে। কিন্তু জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণে ও কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রসারে প্রাথমিক স্তরের এই কমিউনিস্ট সংগঠনসমূহের ভূমিকা কমিউনিস্ট পার্টির ও আন্দোলনের ইতিহাস চর্চার আবশ্যক অঙ্গ।

সূত্র নির্দেশ :

১. Satyendra Narayan Mazumdar, *In Search of A Revolutionary Ideology and A Revolutionary Programme : A Study in the Transition from National Revolutionary Terrorism to Communism*, People's Publishing House, New Delhi, December, 1979, p. vii.
২. Ibid., p. viii.
৩. Ibid., p. xiv.
৪. চিন্মোহন সেহানবীশ, আমাদের মুক্তি আন্দোলনের নয় ধারা ('সূর্য সেন স্মারক বক্তৃতা'), ইন্সটিটিউট অব চাইল্ড হেল্থ এডুকেশন প্রজেক্ট, আমেদনগর, বর্ধমান, এপ্রিল, ১৯৮৭, পৃ ২২।
৫. অবিনাশ দাশগুপ্ত, লেনিন, রুশ মহাবিপ্লব ও বাংলা সংবাদ-সাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, এপ্রিল, ১৯৭০, পৃ ১ (মুখবন্ধ)।
৬. তদেব, পৃ ৩; জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ পর্বে বাংলা সংবাদ-সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন—অবিনাশ দাশগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১-৫ (মুখবন্ধ), ১-২২৪; Satyendra Narayan Mazumdar, op. cit., pp. 122-43; Gautam Chattopadhyay, *Communism and Bengal's Freedom Movement, Volume I (1917-29)*, People's Publishing House, New Delhi, November, 1970, pp. 37-54, 94-105; গৌতম চট্টোপাধ্যায়, রুশ বিপ্লব ও বাংলার মুক্তি আন্দোলন, মনীষা, কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৬৭, পৃ ২৭-৭৫; মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়, সমকালীন বাঙলা ও লেনিন, মনীষা, কলকাতা, জুলাই, ১৯৮০, পৃ ১৩-৩৫, ৪৯-৫১; গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পেশোয়ার থেকে মীরাট : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বনাম ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশনী, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৮৪, পৃ ১৭-১৮, পৃ ২৩-২৫; Sandip Bandyopadhyay, 'Revolutionary Nostalgia : Bengal Revolutionaries and Communism—I', *Frontier*, Vol. 22, No. 36, April 21, 1990, Calcutta, p. 5.
৭. সূত্রনির্দেশ—(৬)-এ উল্লিখিত অবিনাশ দাশগুপ্ত ও সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের বইতে এবং গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের বইগুলিতে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। বিশদ বিবরণের জন্য এই বইগুলি দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা সংখ্যা সূত্র নির্দেশ (৬)-এর অনুরূপ।
৮. Gautam Chattopadhyay, op. cit., pp. 58-66, 128-32, 146-47,

150-51 (Appendix A) ; Satyendra Narayan Mazumdar, op. cit., pp. 163-64 ; মুজফ্ফর আহ্মদ, আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, (প্রথম খণ্ড) (১৯২০-১৯২৯) এবং (দ্বিতীয় খণ্ড) (১৯২৯-১৯৩৪) (অসম্পূর্ণ), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪, (প্রথম খণ্ড), পৃ ৬৫-৮৩, ১৭৪-৭৬, ১৮৭-৯১, ১৯৪-৯৭ ; চিন্মোহন সেহানবীশ, রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী, মনীষা, কলকাতা, জুন, ১৯৭৩, পৃ ১৭০-৯৭, ৩৭৫-৭৬ ; Suniti Kumar Chatterjee, 'Some Reminiscences of an Indian Patriot and Freedom-fighter', in চিন্মোহন সেহানবীশ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৬৫-৭৪ ; Sandip Bandyopadhyay, op. cit., *Frontier*, pp. 5-7.

৯. লেখকের সঙ্গে ধরণী গোস্বামীর সাক্ষাৎকার—২৮. ১০. ১৯৮৭, ৪. ১১. ১৯৮৭ ; লেখকের সঙ্গে সুধাংশু কুমার অধিকারীর সাক্ষাৎকার—৮. ১২. ১৯৮৭, ২৬. ১. ১৯৮৮ ; লেখকের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের সাক্ষাৎকার—৩০. ৫. ১৯৮৬ ; Satyendra Narayan Mazumdar, op. cit., pp. 153-54, 163-65 ; Gautam Chattopadhyay ; op. cit., pp. 133-36, 147, 148-49, 155 (Appendix A).

১০. ধরণী গোস্বামীর সাক্ষাৎকার—২৮. ১০. ১৯৮৭., ৪. ১১. ১৯৮৭. ; ধরণী গোস্বামী, 'বাঙলা তথা ভারতে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রসার ও পার্টি গড়ার আদিপর্ব,' কমিউনিস্ট, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অর্ধশতক পূর্তি উপলক্ষে সি. পি. আই. দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ ১৪৯, ১৫২ ; Satyendra Narayan Mazumdar, op. cit., pp. 165, 203.

১১. Gangadhar Adhikari (ed.), *Documents of the History of the Communist Party of India*, Vol. III—C (1928), People's Publishing House, New Delhi, December, 1982, *Introduction*, pp. 95-97 ; ধরণী গোস্বামী, 'ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ত্রিশের দশকের এক অধ্যায়,' (প্রথম পর্ব), পরিচয়, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ২-৩, শারদীয়, ১৩৮০ বা. স., ১৯৭৩, কলকাতা, পৃঃ ১৩১ ; নগেন সরকার, 'ইয়ং কমরেডস্ লীগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ,' (ধরণী গোস্বামী সম্পাদিত), পরিচয়, বর্ষ ৪৪, সংখ্যা ৪, কার্তিক, ১৩৮১ বা. স., নভেম্বর, ১৯৭৪, কলকাতা, পৃ ৪৩৯ ; সুধাংশু অধিকারী, স্মৃতি-মন্থন, প্রকাশক : পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়, ১৫, রাজা রামমোহন রায় সরণী, শ্রীরামপুর, হুগলী, মার্চ, ১৯৮৮, পৃ ৪৫ ; ধরণী গোস্বামী, সুধাংশু অধিকারী ও সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের সাক্ষাৎকার ; Satyendra Narayan Mazumdar, op. cit., p. 166.

১২. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, 'ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বাঙালীর ইতিহাসবোধ', (দ্বিতীয় অংশ, অধ্যায় ৫), কালধ্বনি, বর্ষ ২, সংখ্যা ৪, এবং বর্ষ ৩, সংখ্যা ১-২, জানুআরি, ১৯৮৮, কলকাতা, পৃ ৪৬।

১৩. নলিনী দাস, স্বাধীনতা-সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বন্দী, মনীষা, কলকাতা, জানুআরি, ১৯৭৪, পৃ ১৪৭ ; বঙ্গেশ্বর রায়, মনে রেখো, প্রকাশক : রাণী রায়, কলকাতা, জুন, ১৯৮৮, পৃঃ ১০৩। (বঙ্গেশ্বর রায় লিখেছেন, ৩৯ জন প্রাথমিকভাবে কনসলিডেশনের সদস্য হন, কিন্তু নলিনী দাস লিখেছেন, সর্বপ্রথমে কনসলিশনের সদস্য হন ৩৫ জন)।

১৪. আন্দামানের সেলুলার জেলে, অন্যান্য জেলে ও বিভিন্ন বন্দীশিবিরে জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন : সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, (১) *In Search of a Revolutionary Ideology and A Revolutionary Programme*, (২) আমার বিপ্লব-জিজ্ঞাসা ও (৩) মৌন মুখর সেলুলার জেল ; নলিনী দাস, স্বাধীনতা-সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বন্দী ; বঙ্গেশ্বর রায়, মনে রেখো ; গণেশ ঘোষ, মুক্তিতীর্থ আন্দামান ; সতীশ পাকড়াশী, (১) অগ্নিদিনের কথা, (২) অগ্নিযুগের কথা ও (৩) অগ্নিদিনের কথা ও কাহিনী ; সুধাংশু দাশগুপ্ত, (১) *The Story of the Past : How We Became Communist In Jails*, (২) অতীতের কথা : কারাগারে কমিউনিস্ট হওয়ার কাহিনী ও (৩) আন্দামান জেল থেকে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ভবন ; মনোরঞ্জন রায়, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও শ্রমিক আন্দোলন ; Bejoy Kumar Sinha, *In Andamans : The Indian Bastille* ; অনন্ত ভট্টাচার্য, আন্দামান বন্দী ; কালীপদ চক্রবর্তী, অগ্নিযুগের চট্টগ্রাম ও আন্দামান স্মৃতি ; সুধাংশু অধিকারী, স্মৃতি-মন্থন ; David M. Laushey, *Bengal Terrorism & The Marxist Left* ; Sandip Bandyopadhyay, 'Bengal Revolutionaries and Communism—II,' *Frontier*, Vol. 22, No. 37, April 28, 1990, Calcutta, pp. 9-11.

১৫. সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, প্রথম খণ্ড (১৯৩০-১৯৪১), গণশক্তি পত্রিকা দপ্তর, কলকাতা, মে, ১৯৮৫, পৃ ১৩৮-৪১, ১৭৮-৮৩, ২১৩, ২৩১ ; রণেন সেন, বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০-'৪৮), বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, মে, ১৯৮১, পৃ ১০০-০১ ; লেখকের সঙ্গে রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—২৮. ৪. ১৯৮৬, ২. ৫. ১৯৮৬, ৬. ৫. ১৯৮৬ ও ৮. ৫. ১৯৮৬।

১৬. Satyendra Narayan Mazumdar, *In Search of A Revolutionary Ideology and A Revolutionary Programme*, op. cit., pp. 168-208, 239-50 ; Jogesh Chandra Chatterji, *In Search of Freedom*,

Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, February, 1967, pp. 183-418 ; Ajoy Kumar Ghosh, 'Bhagat Singh and His Comrades,' (Bombay, 1945), in Ajoy Kumar Ghosh, *Articles and Speeches*, Publishing House For Oriental Literature, Moscow, 1962, pp. 13-50 ; Sandip Bandyopadhyay, op. cit., *Frontier*, April 28, 1990, pp. 6, 10.

১৭. I. B., File Nos. 1201 / 1933 and 929 / 1935.

১৮. প্রাথমিক স্তরের এই কমিউনিস্ট সংগঠনসমূহের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের অনেকেরই বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লিখিত বিবরণ এবং তাঁদের অনেকেরই দীর্ঘ সাক্ষাৎকার থেকে এই তথ্যগুলি সংগৃহীত হয়েছে।

ইয়ং কমরেডস্ লীগ : বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ও কমিউনিস্ট পার্টি-গঠনের সংগঠিত সূচনা

প্রখ্যাত অনুশীলন বিপ্লবী, ইয়ং কমরেডস্ লীগের প্রথম সাধারণ সম্পাদক ও পরবর্তীকালের কমিউনিস্ট নেতা ধরণী গোস্বামী ইয়ং কমরেডস্ লীগের কার্যকলাপ এবং কিশোরগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহে এই সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কিত এক স্মৃতিচারণামূলক প্রবন্ধে লিখেছেন, "I have in this report stated whatever facts I could collect as well as what I could recollect. It may not be a wholly correct picture. A serious study of this subject requires one to go through the authentic documents as mentioned above and collect more factual mateial from the persons and other resources connected with the actual occurrences."[১] প্রসিদ্ধ অনুশীলন বিপ্লবী ও পরবর্তীকালের কমিউনিস্ট নেতা সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারও ইয়ং কমরেডস্ লীগের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেছেন : "The contribution of the Young Comrades' League towards the spreading of Communist ideas among the youth in general and the younger generation of revolutionaries in particular, has not yet been properly recognised and appreciated. This work should be undertaken in all seriousness by research workers in the history of the Communist movement in India."[২] এই মহান্ বিপ্লবী-কমিউনিস্টদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা থেকেই বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্দোলনের প্রথম দুই দশকের ইতিহাসের একজন গবেষক হিসাবে বর্তমান প্রবন্ধে ইয়ং কমরেডস্ লীগের সাংগঠনিক-রাজনৈতিক কাজকর্মের ও কিশোরগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহ এই সংগঠনের সদস্যদের ভূমিকার এক সম্যক্ চিত্রাঙ্কনের এবং বাংলায় যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রচারে ও প্রসারে এই সংগঠনের ভূমিকার প্রকৃত মূল্যায়নের বিনীত প্রয়াসে নিরত হয়েছি। বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলীর যাথার্থ্য নিরূপণের সর্বাধিক প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগে ইয়ং কমরেডস্ লীগের ভূমিকা চারটি বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, ইয়ং কমরেডস্ লীগ বাংলাদেশে কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সংগঠিত করে বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয়ত, ইয়ং কমরেডস্ লীগই ছিল বাংলার প্রথম সেতুসদৃশ কমিউনিস্ট সংগঠন যার মাধ্যমে জাতীয় বিপ্লবীদের প্রথম অংশটি জাতীয় বিপ্লবী "সন্ত্রাসবাদ"-এর পথ পরিত্যাগ করে কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেন এবং গণ-বিপ্লবের পথ অবলম্বন করেন। তৃতীয়ত,

বাংলায় যুব রাজনীতির সংগঠিত সূত্রপাতের ক্ষেত্রেও ইয়ং কমরেডস্ লীগ পথিকৃৎ-এর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। চতুর্থত, ১৯৩০ সালের জুলাই মাসের ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জের জঙ্গী ও বীরত্বপূর্ণ, কিন্তু বিস্মৃতপ্রায়, কৃষক বিদ্রোহে ইয়ং কমরেডস্ লীগের সদস্যরাই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ: নতুন যুগের সূচনা

১৯১৭ সালের রাশিয়ায় মহান্ অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব এসে পড়ে ভারতে। বিশেষভাবে এই বিপ্লবের প্রভাব অনুভব করেন বাংলার তথা ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রণী সেনাদের অর্থাৎ জাতীয় বিপ্লবীদের এক অংশ, যাঁরা এতদিন বৈপ্লবিক "সন্ত্রাসবাদী" পথে ভারতকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখতেন এবং সেই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তখন বাংলায় জাতীয় বিপ্লবীদের দুটি প্রধান দল ছিল—যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতি। অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে অনুশীলন বিপ্লবী দলের তরুণ সদস্যদের মধ্যে শুরু হয় আত্মানুসন্ধান। অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়লাভে অনুপ্রাণিত তরুণ অনুশীলন বিপ্লবীরা উপলব্ধি করেন, এতদিনকার অনুসৃত বৈপ্লবিক "সন্ত্রাসবাদী" পথে নিঃসন্দেহে বীরত্ব আছে, আছে আত্মত্যাগের মহিমা, জাতীয় বিপ্লবীদের দেশপ্রেমও প্রশ্নাতীত, কিন্তু এই পথ ভারতের স্বাধীনতালাভের জন্য যথেষ্ট নয়, শুধুমাত্র "সন্ত্রাসবাদী" পথে কখনোই কোনও বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে না, বিপ্লবের বিজয়লাভের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক জনসাধারণের অংশগ্রহণ। শ্রমিক-কৃষকের অংশগ্রহণ-সঞ্জাত গণবিপ্লবই ভারতের স্বাধীনতালাভের একমাত্র পথ—রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা ক্রমশ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

রুশবিপ্লবের বিজয়লাভে অনুপ্রাণিত ধরণী গোস্বামী, গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গোপাল বসাক, মণি সিংহ, নলীন্দ্র মোহন সেন, নীরোদ চক্রবর্তী, পিয়ারী মোহন দাস, আশু রায় প্রমুখ তরুণ অনুশীলন বিপ্লবীরা কমিউনিস্ট ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বৈপ্লবিক "সন্ত্রাসবাদে"র পথ পরিত্যাগ করে ১৯২০ সাল নাগাদই কমিউনিজমকে রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক মতাদর্শগতভাবে কমিউনিস্ট হওয়ার পর এই তরুণ অনুশীলন বিপ্লবীদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা হয় সমগ্র অনুশীলন সমিতিকেই মার্কসবাদী মতে বিশ্বাসী করে তোলা। এই প্রচেষ্টা থেকেই শুরু হয় তৎকালীন অনুশীলন নেতৃত্বের সঙ্গে এঁদের মতাদর্শ-গত সংঘাত। তৎকালীন অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বে ছিলেন প্রতুল গাঙ্গুলী, নরেন সেন, রমেশ চন্দ্র চৌধুরী, রমেশ চন্দ্র আচার্য, কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিপ্লবীরা। অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়লাভ তাঁদেরও অনুপ্রাণিত করে। তাঁরাও এই বিপ্লবকে উচ্চ প্রশংসায় প্রশংসিত করেন। তাঁদের মধ্যে প্রতুল গাঙ্গুলী মার্কসবাদী ভাবধারাতে আকৃষ্টও হন। কিন্তু অনুশীলন নেতারা তখনই বৈপ্লবিক "সন্ত্রাসবাদী" পথ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে অনুশীলন দলকে একটি মার্কসবাদী দলে পরিণত করে, কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করে গণবিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী হন না। ফলে অনুশীলন

নেতৃত্বের সঙ্গে কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণকারী তরুণ অনুশীলন বিপ্লবীদের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।

বিদ্রোহী অনুশীলন বিপ্লবীরা প্রথমে অনুশীলন সমিতির মধ্যেই একটি কমিউনিস্ট গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন তৎকালীন অনুশীলন নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে মতবিরোধের মীমাংসা করার এবং সম্ভব হলে তাঁদের কমিউনিস্ট মতে নিয়ে আসার। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। অনুশীলন নেতৃত্ব এই ধরনের আলোচনায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। দ্বিধাগ্রস্ত অনুশীলন নেতৃত্বের সঙ্গে বিদ্রোহী অনুশীলন বিপ্লবীদের শেষ পর্যন্ত একটি সাক্ষাৎ আলোচনার ব্যবস্থা হয়। সেই অলোচনাসভায় অনুশীলন নেতৃত্বের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত এবং কমিউনিস্ট অনুশীলন বিপ্লবীদের তরফ থেকে ধরণী গোস্বামী। কিন্তু আলোচনায় প্রতিপন্ন হল মতাদর্শগত এবং কর্মপন্থা-সংক্রান্ত উভয় ধরনের বিরোধই মীমাংসার অতীত। ফলে আলোচনা ভেঙে যায় এবং কমিউনিস্ট অনুশীলন বিপ্লবী গ্রুপের তরফ থেকে ধরণী গোস্বামী ঘোষণা করেন, তাঁরা অনুশীলন সমিতি থেকে পৃথক তাঁদের নিজেদের পথ অনুসরণ করবেন। সেই সিদ্ধান্তক্রমে বিদ্রোহী কমিউনিস্ট অনুশীলন বিপ্লবীরা অনুশীলন সমিতি ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন।[৩]

১৯২৬ সালে অনুশীলন সমিতি পরিত্যাগকারী ধরণী গোস্বামী, গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গোপাল বসাক, মণি সিংহ, নলীন্দ্র মোহন সেন, নীরোদ চক্রবর্তী, পিয়ারী মোহন দাস, আশু রায় প্রমুখের এই কমিউনিস্ট গ্রুপ শ্রমিক, কৃষক ও যুবকদের আন্দোলন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেইমত তাদের মধ্যে কাজ করা শুরু করেন। এই কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা এইসময় 'ভ্যানগার্ড', 'ইনপ্রেকর', 'মাসেস অভ্ ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা এবং লেনিনের **'হোয়াট ইজ টু বী ডান?'**, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের **'ইণ্ডিয়া ইন ট্র্যানজিশন,' 'আফটারমাথ অভ্ নন-কোঅপারেশন'** প্রভৃতি বই বে-আইনীভাবে সংগ্রহ করা ও পড়া শুরু করেন। এই পত্র-পত্রিকা ও বইগুলি গোপনে বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করা হত। এই কমিউনিস্ট গ্রুপ বিভিন্ন জেলার অনুশীলন সমিতির মাঝের সারির ও নীচের সারির কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং এই কমিউনিস্ট গ্রুপের প্রভাবে সংযোগ রক্ষাকারী অনুশীলন কর্মীরা নিজেদের শাখার তরুণদের মধ্যে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করতেন।[৪] এইভাবে এই কমিউনিস্ট গ্রুপের প্রভাব ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং অনুশীলন বিপ্লবীদের মধ্যে ক্রমশ কমিউনিস্ট মতবাদের প্রসারও ঘটতে থাকে।

এর মধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয় বিদেশের মাটিতে, তাশকন্দে, ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর এবং স্বদেশের মাটিতে, কানপুরে, ১৯২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর। কানপুরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পর অর্থাৎ ১৯২৬ সালের মাঝামাঝি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নির্দেশসহ একটি চিঠি ধরণী গোস্বামীর কাছে আসে, যাতে লেখা ছিল, যেহেতু এখন

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, সেহেতু পৃথক কোনও কমিউনিস্ট গ্রুপের আর প্রয়োজন নেই, ধরণী গোস্বামীরা যেন মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে (যিনি তখন মুক্ত হয়ে বাংলায় কমউনিস্ট পার্টি সংগঠন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন) সাক্ষাৎ করে পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করেন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নির্দেশ অনুযায়ী ধরণী গোস্বামীরা তাঁদের পৃথক কমিউনিস্ট গ্রুপের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে ১৯২৬ সালের শেষ দিকে ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্ট্স্ পার্টিতে যোগদান করেন।[৫] বাংলাদেশে ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড্ পেজ্যাণ্ট্স্ পার্টি গঠিত হয় ১৯২৫ সালের ১ নভেম্বর।[৬] ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্ট্স্ পার্টির সভ্য হিসাবে এই তরুণ কমিউনিস্টরা কৃষক আন্দোলন এবং বিশেষ করে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৫ সালে গঠিত সারা বাংলা চটকল শ্রমিকদের সংগঠন বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়নের (পূর্বে নাম ছিল বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স্ অ্যাসোশিয়েশন) কাজকর্মের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত হন এবং কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সমস্ত চটকলে এই ইউনিয়নের শাখা সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন।[৭] বৈপ্লবিক "সন্ত্রাসবাদী" পথ ত্যাগ করার পর এইভাবেই শুরু হয় এই তরুণ বিপ্লবীদের শ্রমিক আন্দোলন তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রথম পাঠ।

ইয়ং কমরেডস্ লীগ গঠন : জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের এবং বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ও কমিউনিস্ট পার্টি-গঠনের সংগঠিত সূত্রপাত

১৯২৮ সালে ধরণী গোস্বামীর এবং ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড্ পেজ্যাণ্ট্স্ পার্টির অন্যান্য কয়েকজন তরুণ সদস্যের প্রচেষ্টায় কলকাতায় ইয়ং কমরেডস্ লীগ (ওয়াই. সি. এল.) নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। বাংলার ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড্ পেজ্যাণ্ট্স্ পার্টির (ডব্লিউ. পি. পি.) যুব শাখা হিসাবে একটি গণ-সংগঠনের চরিত্র নিয়ে ওয়াই. সি. এল. গঠিত হয়। ওয়াই. সি. এল.-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং বিশেষ করে শ্রমিক পরিবারের যুবক ও তরুণ শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রচার ও প্রসার। ধরণী গোস্বামী ওয়াই. সি. এল.-এর প্রথম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ফিলিপ স্প্রাট হন এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি। ইয়ং কমরেডস্ লীগ প্রতিষ্ঠার প্রকৃত তারিখ যথেষ্ট বিতর্কিত। এই বিষয়ে দুটি পরস্পরবিরোধী মতের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। ওয়াই. সি. এল.-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ধরণী গোস্বামী, নগেন সরকার, সুধাংশু কুমার অধিকারী, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, Horace Williamson এবং David M. Laushey-এর অভিমত অনুযায়ী ১৯২৮ সালের শেষভাগে কলকাতায় ওয়াই. সি. এল. গঠিত হয়।[৮] কিন্তু গঙ্গাধর অধিকারী তাঁর সম্পাদিত *Documents of the History of the Communist Party of India*, Volume III-C (1928), বইতে বিভিন্ন দলিল ভিত্তিক তথ্য উপস্থাপিত করেছেন, যার থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ১৯২৮ সালের ১ ফেব্রুআরির আগেই ইয়ং কমরেডস্ লীগ গঠিত হয়েছিল।[৯] অধিকারী

তাঁর সম্পাদিত *Documents*, Vol III-C,-এর Part I-এর 'Introduction'-এ লিখেছেন, "The earliest reference to Young Comrades' League is a document found in its office. This is a letterhead of the league, containing 16 names including N. Sen gupta, Ratan B. Hazra, Abdul Halim, D. K. Goswami, P. Spratt, who wre referred to as attendi g a 'general meeting' held on 1 Februany 1928." [১০]

১৯২৮ সালের ২৮ জুলাই ওয়াই. সি. এল.-এর সংগঠকেরা নলীন্দ্র সেনগুপ্তকে অস্থায়ী সম্পাদক ('protem' or provisional secretary) হিসাবে নির্বাচিত করেন এবং সদস্য চাঁদা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯২৮ সালের ১১ আগস্ট ওয়াই. সি. এল.-এর সংগঠকেরা কার্যনির্বাহী কমিটির (executive committee) সদস্যদের নির্বাচিত করেন। পি. স্প্রাট, এ. রায়, ডি. কে. গোস্বামী, পি. মুখার্জী, এন. ভট্টাচার্য, এ. হাজরা ও এ. হালিম এই কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। লীগের সংবিধান প্রণয়নের এবং আইনকানুন, নিয়ম, নীতি ও কর্মসূচি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সংগঠকেরা একটি সাব-কমিটিও গঠন করেন। আগস্ট মাসের শেষ দিকে ওয়াই. সি. এল.-এর সংবিধান প্রণীত হয় এবং আইনকানুন, নিয়ম, নীতি ও কর্মসূচি নির্ধারিত হয়। লীগের রাজনৈতিক কর্মপন্থাও এই সময়েই স্থিরীকৃত হয়। "তরুণ বন্ধু দল" সংগঠনটির বাংলা নাম হিসাবে গৃহীত হয়। ঢাকা, বরিশাল ও ময়মনসিংহে লীগের শাখা খোলার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়।[১১]

ধরণী গোস্বামীর সঙ্গে একযোগে ইয়ং কমরেডস্ লীগ গঠনে উদ্যোগীদের অন্যতম গোপেন চক্রবর্তীর অভিমত অনুযায়ী "সংগ্রামী মানসিকতাসম্পন্ন পেটি-বুর্জোয়া তরুণদের শ্রমিকশ্রেণীর উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করার এবং তাঁদের সচেতনভাবে বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলনের পথে টেনে আনার" উদ্দেশ্যেই এই সংগঠনের জন্ম হয়েছিল।[১২]

"নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রমিকদের এবং দরিদ্র কৃষকদের" একটি যুব সংগঠনের আশু প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে ধরণী গোস্বামী বলেন : "এই শ্রেণীগুলির শোষিত তরুণদের মার্কসবাদী মতাদর্শভিত্তিক একটি সঠিক সংগ্রামী ও বৈজ্ঞানিক নেতৃত্ব দেওয়ার, এই তরুণদের একটি সংগ্রামী আন্দোলন গড়ে তোলার, তাঁদের আশু দুর্দশা দূর করার, এবং বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের, অর্থাৎ শ্রমিক-কৃষকের, সংগ্রামে সাহায্য করার, এবং এই সংগ্রামের মাধ্যমে, জনগণের আর্থ-সামাজিক মুক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্যে স্বাধীন, সাধারণতান্ত্রিক ভারত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই এই সংগঠন (ওয়াই. সি. এল.) গঠিত হয়েছিল"।[১৩]

১৯২৮ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে ওয়াই. সি. এল.-এর কার্যনির্বাহী কমিটি (executive committee) একটি *Statement of Program and Policy* (Document 23) গ্রহণের মাধ্যমে লীগের কর্মসূচি ও কর্মপন্থা ঘোষণা করেন। প্রায় একই সময়ে লীগের সংবিধানও প্রণীত হয়। সংবিধানে লীগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় :

"The object of the league is to organise a radical and militant movement of the exploited and oppressed young men and women for (a) the redress of their immediate grievances, and (b) the establishment of the independent republic of India on the basis of the social and economic emancipation of the masses."[১৪]

Statement of Program and Policy of Young Comrades' League ছটি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল: (1)" "What is the Youth Movement?", (2) "Our grievances", (3) "What Is the Remedy?", (4) "The Ideas of Today", (5) "What We Shall Do?" এবং (6) "Our Program of Practical Work for the Immediate Future." *Statement*-এ যুব-সম্প্রদায়ের কাছে সমস্ত "অতীতাশ্রয়ী চিন্তাভাবনা" বর্জনের এবং নিম্নলিখিত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়:

(ক) "A true appreciation of our position in the world"—"ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পুরাতন স্বাতন্ত্র্য" বর্জনের এবং "জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ভারতের সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য অবশ্যই আন্তর্জাতিক"—এই উপলব্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়;

(খ) "A realistic revolutionism";

(গ) "Class-struggle as the mainspring of historical development, and the rise and organisation of the masses as the key to our problems";

(ঘ) "Abandonment of traditional attitude of hero-worship"; এবং

(ঙ) "An active intolerance of the divisions and hostilities among ourselves, based upon ancient usages and customs having no reality or value at the present day."

Statement-এ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হল: "The Young Comrades' League has been established to carry on the propaganda of these ideas and to form and lead a real movement of the exploited youth for the solution of its grievances and for the attainment of independence and freedom."[১৫]

লীগের সংবিধান ও *Statement of Program and Policy* থেকে এই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। ওয়াই. সি. এল. বাংলার ডব্লিউ. পি. পি.-র যুব শাখা হিসাবে স্বীকৃত ছিল। সেই কারণেই ১৯২৮ সালের ২১-২৪ ডিসেম্বর কলকাতার অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্টস্ পার্টির

সর্বভারতীয় সম্মেলনে ওয়াই. সি. এল.-এর তরফ থেকে ৫০ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে বলা হয়েছিল। গোপাল বসাকের বক্তব্য অনুযায়ী এই সম্মেলনে আশু রায় ইয়ং কমরেডস্ লীগের একটি রিপোর্ট পাঠ করেন।[১৬]

এই সময় অপর বিপ্লবী দল যুগান্তরেও ভাঙ্গন ধরে। বেশ কিছু সংখ্যক যুগান্তর বিপ্লবীও কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করে যুগান্তর দল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এই দলত্যাগী যুগান্তর ও অনুশীলন বিপ্লবীদের অনেকেই সদ্যগঠিত ইয়ং কমরেডস্ লীগে যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সুধাংশু কুমার অধিকারী, জ্যোতির্ময় শর্মা, নলীন্দ্রমোহন সেন, নগেন সরকার, রামরাঘব লাহিড়ী, আশু রায়, প্রমথ ভৌমিক, বিভূতি ঘোষ প্রমুখ। প্রথম যুগের কমিউনিস্ট মতবাদগ্রহণকারী অনুশীলন দল পরিত্যাগকারী বিপ্লবীদের মধ্যে ধরণী গোস্বামী ছাড়াও গোপাল বসাক, মণি সিংহ ও নীরোদ চক্রবর্তীও ইয়ং কমরেডস্ লীগে যোগদান করেন। গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লীগে যোগদান না করলেও অন্যতম প্রধান সহযোগী ছিলেন। তৎকালে কলকাতায় অবস্থান-কারী সিন্ধুপ্রদেশের বিপ্লবী জামালুদ্দিন বুখারীও লীগের অন্যতম প্রধান সদস্য ছিলেন। তৎকালীন শ্রমিকনেতা এ. এম. এ. জামান ছিলেন লীগের অন্যতম প্রধান সহযোগী। তৎকালে বাংলার প্রধান দুই কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠক মুজফ্ফর আহ্মদ ও আব্দুল হালিমের পরামর্শেই ধরণী গোস্বামীরা ইয়ং কমরেডস্ লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটির নামকরণ করেন ফিলিপ স্প্রাট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইয়ং কমরেডস্ লীগ নামটি প্রকৃতপক্ষে গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির ভারতীয় সদস্য শাপুরজী শাকলাতওয়ালার মস্তিষ্ক-প্রসূত।[১৭] অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর থেকে বেরিয়ে আসা বিপ্লবীরা যাতে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পূর্বে শ্রমিক আন্দোলনের ও শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন (যে অভিজ্ঞতা তাঁদের এতদিন ছিল না), সেই উদ্দেশ্যেই একটি মধ্যবর্তী সংগঠন বা সেতু সংগঠন হিসাবে ইয়ং কমরেডস্ লীগের সৃষ্টি। এই সংগঠনের প্রধান কাজ ছিল কমিউনিস্ট পার্টিকেই জোরদার করে তোলা এবং বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির শাখা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এই কাজে এই নবীন সংগঠন মুজফ্ফর আহ্মদ, আব্দুল হালিম ও ফিলিপ স্প্রাটের সাহায্য ও সমর্থন (যতদিন তাঁরা জেলের বাইরে ছিলেন) সবসময়েই পেয়ে এসেছিল।[১৮]

শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী ও যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রচার ব্যতীতও লীগের কর্মীরা শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে এবং তাঁদের আন্দোলনে অংশগ্রহণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কলকাতায় মূল কেন্দ্র ব্যতীতও তৎকালীন বাংলার অপর পাঁচটি জেলাতেও ইয়ং কমরেডস্ লীগের শাখা গড়ে ওঠে—ময়মনসিংহ, মালদহ, খুলনা, রাজশাহী ও ঢাকা। এই জেলাগুলির মধ্যে লীগের সবচেয়ে শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমা অঞ্চলে।[১৯] কিশোরগঞ্জ মহকুমা অঞ্চলে ইয়ং কমরেডস্ লীগের প্রধান দুই সংগঠক ছিলেন প্রাক্তন অনুশীলন বিপ্লবী নগেন সরকার ও ওয়ালি নওয়াজ। ইয়ং কমরেডস্ লীগের কিশোরগঞ্জ শাখার

সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন নগেন সরকার। কিশোরগঞ্জ ইয়ং কমরেডস্ লীগের কমিটি সদস্য ছিলেন—নগেন সরকার (সম্পাদক), ওয়ালি নওয়াজ, গিরীন্দ্র রায়, নবী বক্স, ক্ষীরোদ রায়, রুস্তম আলি, মণীন্দ্র চক্রবর্তী, আবদুল জলিল, হাতেম আলি (একজন সাধারণ কৃষক) প্রমুখ। কিশোরগঞ্জে ওয়াই. সি. এল.-এর উপদেষ্টা ও সাহায্যকারী হিসাবে ছিলেন সুধাংশু অধিকারী, নীরোদ চক্রবর্তী, নলীন্দ্র মোহন সেন ও গিরীন্দ্র চন্দ্র রায় (শেষোক্ত ব্যক্তি কমিটি সদস্যও হন)। প্রধান উপদেষ্টা ও সাহায্যকারী ছিলেন সুধাংশু অধিকারী। তিনি লীগ নেতৃত্বের নির্দেশে কলকাতা থেকে কিশোরগঞ্জে চলে গিয়ে সেখানে কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন। মালদহে লীগের শাখা সংগঠিত করেন জ্যোতির্ময় শর্মা, রামরাঘব লাহিড়ী প্রমুখ। খুলনায় প্রমথ ভৌমিক, বিভূতি ঘোষ, বিষ্ণু চ্যাটার্জী প্রমুখ লীগের শাখা খোলেন। রাজশাহীতেও লীগের শাখা ছিল। রামরাঘব লাহিড়ী মালদহের সঙ্গে রাজশাহীতেও লীগের শাখা খোলেন। প্রাক্তন অনুশীলন বিপ্লবী গোপাল বসাক ঢাকায় ইয়ং কমরেডস্ লীগের শাখা সংগঠিত করেন। কলকাতা থেকে গিয়ে তাঁকে কাজে সাহায্য করতেন নলীন্দ্র মোহন সেন। মূল কেন্দ্র কলকাতার দায়িত্বে ছিলেম ইয়ং কমরেডস্ লীগের সাধারণ সম্পাদক ধরণী গোস্বামী। কলকাতায় লীগের কাজকর্মে মণি সিংহ, নীরোদ চক্রবর্তী, নলীন্দ্র মোহন সেন, জামালুদ্দিন বুখারী প্রমুখও বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন। মণি সিংহ প্রধানতঃ মেটিয়াবুরুজ ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনের কাজেই ব্যাপৃত থাকতেন। ১৯২৯ সালের ২০ মার্চ ধরণী গোস্বামী 'মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা' সূত্রে গ্রেফ্তার হওয়ার পর তাঁর জায়গায় নলীন্দ্র মোহন সেন ইয়ং কমরেডস্ লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[২০]

প্রধানত শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে কাজ করে, তাঁদের সংগঠিত করে, শ্রেণী সংগ্রামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে, কমিউনিস্ট ভাবধারায় দীক্ষিত করে ইয়ং কমরেডস্ লীগ তথা কমিউনিস্ট পার্টি'র দিকে নিয়ে আসা ছাড়াও লীগের সক্রিয় কর্মী ও সদস্যরা "সন্ত্রাসবাদী" পথ অবলম্বনকারী জাতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন ও প্রচেষ্টা চালাতেন যাতে এই আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিক বিপ্লবীরা "সন্ত্রাসবাদের" ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করে গণবিপ্লবের পথ ও মার্কসবাদী চিন্তাধারা গ্রহণ করেন। সেই কাজে অর্থাৎ "সন্ত্রাসবাদী" পথাবলম্বী জাতীয় বিপ্লবীদের কমিউনিজমের দিকে টেনে আনার কাজে ইয়ং কমরেডস্ লীগ তখনই বিশেষ সফলতা না পেলেও পরবর্তীকালে ত্রিশের দশকের মধ্যভাগে এই বিপ্লবীদের বিরাট অংশের কমিউনিস্ট পার্টি'তে যোগদানের পথ লীগের এই কাজকর্মের ফলে নিঃসন্দেহে অনেকটাই প্রশস্ত হয়ে যায়।

কলকাতার মেটিয়াবুরুজে লীগ নেতা মণি সিংহ শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস করে এক বিরাট শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ছাড়াও লীগের অন্যান্য নেতারা কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতেন। লীগের সদস্যরা চটকল শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করার কাজ শুরু করেন।[২১] চব্বিশ পরগণায়

নৈহাটি থেকে বজবজ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ চটকল অঞ্চলে লীগের সদস্যরা চটকল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে থাকেন এবং লীগের শাখা সংগঠিত করেন। হাওড়া জেলায় বিস্তীর্ণ চটকল অঞ্চলেও শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কাজে লীগ নেতারা কয়েকজন ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু সেখানে কোথাও লীগের শাখা সংগঠন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।[২২]

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন রাজশাহী শহরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কংগ্রেস সম্মেলনের প্যাণ্ডেলেই আরও তিনটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন, ১৯৩০ সালের ১৫ এপ্রিল কংগ্রেস সম্মেলন হয়। দ্বিতীয় দিন, ১৬ এপ্রিল হয় স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলন বা যুব সম্মেলন। সভাপতি হন প্রতুল গাঙ্গুলী, প্রধান অতিথি ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। তৃতীয় দিন, ১৭ এপ্রিল হয় রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন—নির্বাচিত সভাপতি হয়েছিলেন ত্রৈলোক্য কুমার চক্রবর্তী, যিনি 'মহারাজ' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। চতুর্থ দিন, ১৮ এপ্রিল রাজশাহী শহরে কংগ্রেস সম্মেলন প্যাণ্ডেলেই ইয়ং কমরেডস্ লীগের প্রথম ও শেষ প্রকাশ্য প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা বঙ্কিম মুখার্জী, যদিও তিনি লীগের সদস্য ছিলেন না। তৎকালীন লীগ সম্পাদক নলীন্দ্র মোহন সেন ও রামরাঘব লাহিড়ীর উদ্যোগেই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩০ সালের ১৮ ও ১৯ এপ্রিল দুদিন ধরে লীগের এই প্রাদেশিক সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ১৮ এপ্রিল বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে তাঁর দলের বিপ্লবী তরুণরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করে চট্টগ্রামকে "স্বাধীন" ঘোষণা করেন। ফলে সারা বাংলায় ১৮ এপ্রিল রাত্রি থেকেই সমস্ত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের গ্রেফ্‌তার করা শুরু হয়। এই কারণে ওয়াই. সি. এল.-এর নেতা ও কর্মীরা ঐ রাত্রেই রাজশাহী থেকে গোপনে অন্যত্র সরে যান। ফলে ১৯ এপ্রিল আর সম্মেলন হওয়া সম্ভব হয় নি। সম্মেলনের কাজ অর্ধসমাপ্তই থেকে যায়। ইয়ং কমরেডস্ লীগের এই প্রাদেশিক সম্মেলনে সারা বাংলা থেকে প্রায় ২০০ জন কর্মী উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সম্মেলনে প্রায় ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) শ্রোতা ও দর্শক জমায়েত হন।[২৩]

এই সম্মেলনে লীগের বক্তাদের বক্তৃতার সুর ছিল বেশ চড়া। তাঁরা কংগ্রেস নেতৃত্বের চরিত্র বিশ্লেষণ করেন ও তীব্র ভাষায় কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন। এই সম্মেলনে ইয়ং কমরেডস্ লীগের বক্তব্যের সারাংশ ছিল—"বুর্জোয়া কংগ্রেস নেতৃত্ব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস চায়। জনসাধারণকে বিপ্লবের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য তারা এই আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেছে। বুর্জোয়া আন্দোলনের পথে মুক্তি আসবে না। মুক্তি-সংগ্রামের আসল শক্তি শ্রমিক ও কৃষক। তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই গঠিত হয়েছিল 'ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজ্যান্ট্স্ পার্টি'। তার অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"[২৪] এই সম্মেলনে খুলনার প্রমথ ভৌমিক তাঁর বক্তৃতায় বলেন—"কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনের পথেও নয়, 'সন্ত্রাসবাদী' পথেও নয়, একমাত্র শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের পথেই ও বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শেই ভারতের স্বাধীনতা

আসবে।"[২৫] এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করা প্রয়োজন, কংগ্রেসের তৎকালীন গান্ধীবাদী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের বুর্জোয়া, আপসকামী এবং মৌলিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন-বিরোধী চরিত্রটি সঠিকভাবে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হলেও এবং শ্রমিক-কৃষকের সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি ও আন্দোলনের উপর সঠিকভাবে গুরুত্ব আরোপ করলেও ইয়ং কমরেডস্ লীগের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ ১৯৩০ সালের দেশব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আইন অমান্য আন্দোলনের গণ-চরিত্রটি উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হন এবং এই আন্দোলনে দেশের অগণিত শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণের ব্যাপারটির সঠিক গুরুত্ব অনুভব না করে তৎকালীন সি. পি. আই. নেতৃত্বের "বাম-সংকীর্ণতাবাদী" পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমগ্র আন্দোলনটিকেই "বুর্জোয়া আন্দোলন" আখ্যা দিয়ে তা থেকে দূরে সরে থাকার ভ্রান্ত ও নেতিবাচক পথ গ্রহণ করে সি. পি. আই. নেতৃত্বের মতই এই গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব-প্রদানের সঠিক ঐতিহাসিক কর্তব্যপালনে ব্যর্থ হন। ফলে আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে যায় বুর্জোয়া নেতাদের হাতে এবং তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনমত আন্দোলনের রাস টেনে ধরেন।

কিশোরগঞ্জের কৃষক অভ্যুত্থান—ইয়ং কমরেডস্ লীগের ভূমিকা

ইয়ং কমরেডস্ লীগের কাজকর্মের মধ্যে সর্বপ্রধান ও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৯২৯-৩০ সালের জমিদারী শোষণ ও মহাজনী শোষণবিরোধী কিশোরগঞ্জের সুবিখ্যাত কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্বপ্রদান। কিশোরগঞ্জে ইয়ং কমরেডস্ লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে কিশোরগঞ্জেই সর্বপ্রথম ওয়াই. সি. এল. জমিদারী প্রথা ও মহাজনী প্রথা বিনা ক্ষতিপূরণে সম্পূর্ণ উচ্ছেদের দাবি জানায় এবং এই দাবিতে সভা করে ও ইস্তাহার ছড়ায়। ১৯২৯ সালের জুন মাসে ওয়াই. সি. এল. জমিদারী প্রথা ও মহাজনী প্রথা উচ্ছেদের দাবি জানিয়ে কিশোরগঞ্জ শহরে রথখোলার ময়দানে এক জনসভা করে। ঐ জনসভা প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণের সম্মুখীন হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই জমিদারদের ভাড়াটে গুণ্ডারা এবং কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার স্বেচ্ছাসেবকেরা সভা ভেঙ্গে দেয় এবং পুলিশের সহায়তায় ওয়াই. সি. এল.-এর কর্মীদের উপর দৈহিক আক্রমণ চালায়। ময়মনসিংহ জেলার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট গুরুসদয় দত্তের ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিশোরগঞ্জ শহরের ওয়াই. সি. এল.-এর অফিসে খানাতল্লাসী করা হয় এবং নগেন সরকারের বিরুদ্ধে গ্রেফ্তারী পরওয়ানা বার করা হয়। তিনি আত্মগোপন করে গ্রামে গ্রামে সংগঠনের কাজ করতে থাকেন। ১৯৩০ সালের জানুআরি মাসে ওয়ালি নওয়াজের বিরুদ্ধেও একইভাবে গ্রেফ্তারী পরওয়ানা জারি হওয়ায় তিনিও আত্মগোপন করে সংগঠনের কাজ চালাতে থাকেন। আত্মগোপনকারী অবস্থায় নগেন সরকার ও ওয়ালি নওয়াজ এবং মণীন্দ্র চক্রবর্তী, আবদুল জলিল, হাতেম আলি প্রমুখ ওয়াই. সি. এল.-এর কর্মীরা জমিদারী ও মহাজনী অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে এবং এই দুই নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়াশীল প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষক জনসাধারণকে সচেতন করতে ও সংগঠিত

করতে শুরু করেন। ওয়াই. সি. এল. পাকুন্দিয়া ও হোসেনপুর এই দুটি থানাকেই মূলতঃ সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেয় এবং সেই অনুযায়ী কাজকর্ম চালায়। মুখ্যতঃ এই দুই থানার কৃষকরাই সামগ্রিকভাবে কৃষকবিদ্রোহ করেছিলেন।[২৬]

১৯২৯ সালের মধ্যভাগ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইয়ং কমরেডস্ লীগের কিশোরগঞ্জ শাখায় আত্মগোপনকারী নেতৃবৃন্দ জমিদারী, তালুকদারী ও মহাজনী সর্বপ্রকার শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষকদের সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজে প্রয়াসী হলেও আশু কোনও কৃষক বিদ্রোহের ডাক দেননি। ফলে অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবেই ১৯৩০ সালের জুলাই মাসে কিশোরগঞ্জের বিখ্যাত কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়, যদিও লীগের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা বিদ্রোহী কৃষকদের সঙ্গে প্রথম থেকেই ছিলেন এবং বিদ্রোহকে সঠিকভাবে শ্রেণীসংগ্রামের পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছিলেন। আত্মগোপনকারী ওয়াই. সি. এল. নেতা নগেন সরকার ও ওয়ালি নওয়াজের প্রচেষ্টায় পাকুন্দিয়া ও হোসেনপুর থানার জঙ্গী কৃষকদের নিয়ে এক 'সংগ্রামী কৃষক-বাহিনী' গঠন করা হয়। ঐ বাহিনীর প্রধান কমাণ্ডার ছিলেন জঙ্গী কৃষকনেতা হাতেম আলি এবং সহকারী নেতা ও কমাণ্ডার ছিলেন খোন্দকার কালু মিঞা। ঐ বাহিনীতে সৈন্য হিসাবে ছিলেন ২১৫ জন জঙ্গী কৃষক।[২৭]

১৯৩০ সালের ৭ জুলাই এই 'সংগ্রামী কৃষক-বাহিনী' সাধারণ দরিদ্র কৃষকদের সহযোগিতায় ইয়ং কমরেডস্ লীগের কোনও সুস্পষ্ট নির্দেশ ছাড়াই 'জমিদার-মহাজনদের ঘরে অন্যায়ভাবে মজুত করা গোলাভরা ধান কেড়ে নিয়ে গ্রামের সাধারণ কৃষকদের মধ্যে বিলি করার' ও 'জমিদার-মহাজনদের সিন্দুকে থাকা কৃষকদের টাকা ধারের মিথ্যা দলিল কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলার' দাবি ও আওয়াজ নিয়ে কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জমিদার, জোতদার, তালুকদার ও মহাজনদের বাড়ি চড়াও হন। প্রথমে কৃষকরা অহিংস ও শান্তভাবে জমিদার-জোতদার-মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধারের মিথ্যা দলিল ও বন্ধকী দলিল (তমসুক) ফেরত পাবার দাবি জানান। অধিকাংশ জমিদার-জোতদার-মহাজনই এই দলিল ফেরত দিয়ে দিলে কৃষকরা এই দলিল নিয়ে শান্তভাবে চলে যান। সে সমস্ত জমিদার-জোতদার-মহাজন দলিল ফেরত দিতে অস্বীকার করেন, সে সমস্ত জায়গাতেই বলপ্রয়োগের ঘটনা ঘটে।[২৮]

কিশোরগঞ্জ শহর থেকে মাত্র দশ মাইল দূরবর্তী পাকুন্দিয়া থানার অন্তর্গত এক গ্রাম থেকেই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। জানা যায় যে, এক মুসলমান তালুকদার-মহাজনের বাড়িই হয়েছিল বিক্ষুব্ধ কৃষক জনতার আক্রমণের প্রথম শিকার। থানায় এই কৃষক আক্রমণের ব্যাপারে প্রথম অভিযোগ দায়ের করেন এক মুসলমান তালুকদার-মহাজন। বিক্ষুব্ধ মুসলমান ও হিন্দু কৃষকের এক সম্মিলিত বিশাল জনতা এই মুসলমান তালুকদার-মহাজনের বাড়ি আক্রমণ করে সমস্ত দলিলপত্র ও বাড়ির আসবাবপত্র ধ্বংস করে দেয়। এই ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, প্রাথমিক স্তরে এই কৃষক বিদ্রোহের চরিত্র ছিল

সম্পূর্ণ অ-সাম্প্রদায়িক ও আর্থনীতিক। অতি দ্রুত কৃষক বিদ্রোহ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।[২৯]

১৯৩০ সালের ৭ জুলাই-এর দিনটিতেই 'সংগ্রামী কৃষক-বাহিনী' কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাকুন্দিয়া থানার জাঙ্গালিয়া গ্রামের বড় জমিদার ও মহাজন কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বাড়ি গিয়ে গোলার ধান ও মিথ্যা দলিলগুলি ফেরত চাইলে তিনি সেগুলি দিতে অস্বীকার করেন এবং কৃষকদের উপর গুলি চালাতে থাকেন। এই গুলি বর্ষণের ফলে ৯ জন কৃষক ঘটনা-স্থলেই মারা যান। পরিণতিতে অহিংস কৃষক জনতা সহিংস হয়ে ওঠেন এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অত্যাচারী জমিদার-মহাজন কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও তার ছেলেসহ ঐ বাড়ির ৯ জন লোককে হত্যা করেন। তারপর কৃষক জনতা জমিদারবাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে কয়েক হাজার মণ ধান ও মিথ্যা দলিলগুলি নিয়ে আসেন এবং দলিলগুলি পুড়িয়ে ফেলেন।[৩০] এই প্রসঙ্গে ঐ অঞ্চলের প্রচলিত গান হল—

"জাঙ্গালিয়ার কেষ্ট রায়
চল্লিশ হাজার দিতে চায়.
তবু পরাণ ভিক্ষা সে না পায়।"[৩১]

এই কৃষক বিদ্রোহ ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে কিশোরগঞ্জ মহকুমাভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে। বিদ্রোহের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই সরকারপক্ষ বিদ্রোহ দমনের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ময়মনসিংহ পুলিস লাইন থেকে সশস্ত্র পুলিস বাহিনী এবং ঢাকা ও কুমিল্লা থেকে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্ নিয়ে আসা হয় এই বিদ্রোহ দমনের কাজে। সরকারী পুলিস বাহিনী ও 'সংগ্রামী কৃষক-বাহিনী'র মধ্যে সংঘর্ষে বহু কৃষক মারা যান।

সশস্ত্র পুলিস বাহিনী ও ই. এফ. আর. গ্রামে ঢুকে কৃষকদের উপর অত্যাচার চালায়। শতাধিক কৃষককে নির্বিচারে হত্যা করা হয়।[৩২] ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই কৃষক বিদ্রোহকে রক্তবন্যায় ভাসিয়ে দেয়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ছাড়াও হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই জমিদারপক্ষের তরফ থেকে এবং কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা এই দুই রাজনৈতিক দলের তরফ থেকেও এই কৃষক বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা সর্বশক্তি দিয়ে এই কৃষক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধাচরণ করে। সরকারপক্ষ, জমিদারপক্ষ, কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার তরফ থেকে এই কৃষক বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ দেওয়ার অপচেষ্টা করা হয়। জমিদার-মহাজনদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু, আর কৃষক জনতার অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান, এই সুযোগ নিয়ে সরকারপক্ষ ও আন্দোলন-বিরোধীদের তরফ থেকে এই কৃষক বিদ্রোহকে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের আক্রমণ বলে চালানোর চেষ্টা করা হয়, যদিও বাস্তবে এই কৃষক বিদ্রোহের চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক—দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান কৃষক হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জমিদার-মহাজনদের বাড়ি আক্রমণ করেন। দরিদ্র কৃষকদের উপর জমিদার-মহাজনদের বল্গাহীন শোষণ ও অত্যাচারই ছিল এই কৃষক বিদ্রোহের মূল কারণ, এই কৃষক বিদ্রোহের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের কোনওমাত্র যোগাযোগ ছিল না।[৩৩]

অবশ্য এ কথা সত্য যে, সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতাদের পক্ষ হতে এই কৃষক বিদ্রোহকে তার মূল আর্থনীতিক-রাজনীতিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে সাম্প্রদায়িকতার কানাগলিতে আবদ্ধ করার যথেষ্ট অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল। নবগঠিত ইয়ং কমরেডস্ লীগের গণ-আন্দোলনের অভিজ্ঞতা-বিরহিত ও অপরিণত নেতৃত্বের পক্ষে এই জঙ্গী কৃষক আন্দোলনের অপ্রত্যাশিত ও ক্ষিপ্রগতি ব্যাপকতা ও বিস্তৃতির সঙ্গে সর্বদা সমান তালে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। ওয়াই. সি. এল. নেতৃত্বের এই সীমাবদ্ধতার কারণে এই কৃষক বিদ্রোহ সঠিক নেতৃত্ব থেকেও বেশ কিছুদংশে বঞ্চিত হয়েছে। তদুপরি ওয়াই. সি. এল.-এর অধিকাংশ নেতাকেই গ্রেফ্‌তার এড়াতে প্রকাশ্য কাজকর্ম ছেড়ে গোপনে চলে যেতে হয়। আত্মগোপনকারী ওয়াই. সি. এল. নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই পরবর্তীকালে গ্রেফ্‌তার হয়ে বিভিন্ন জেলে ও বন্দীশিবিরে আবদ্ধ হন। ফলে কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতারা সচেষ্ট হয়। কৃষক বিদ্রোহ শুরু হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতারা এবং ধর্মান্ধ "মৌলবী"রা দলে দলে ঢাকা ও নোয়াখালি থেকে 'কিশোরগঞ্জে আসা শুরু করে। আর্থনীতিক-রাজনীতিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে এই কৃষক বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িকতার পথে নিয়ে যাওয়ার এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানোর উদ্দেশ্যেই এই আগমন ঘটতে থাকে।[৩৪]

কিশোরগঞ্জের কৃষক অভ্যুত্থানের বিরোধীদের তরফ থেকে সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতাদের এই ভূমিকা ও অপচেষ্টাকে বড় করে দেখিয়ে এই অভ্যুত্থানকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে চিহ্নিত করে কলঙ্কিত করার দুরভিসন্ধিমূলক প্রচেষ্টা কিন্তু বাস্তবের আলোকে ধোপে টেকে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ইয়ং কমরেডস্ লীগের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় কোনও বিরাম দেয় নি[৩৫] এবং এই কৃষক বিদ্রোহকে রক্তবন্যায় ভাসিয়ে দেওয়ার সমর্থনে যথেষ্ট অজুহাতও খাড়া করতে কার্পণ্য করে নি, কিন্তু এহেন সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গও এই বিদ্রোহের আর্থনীতিক উদ্দেশ্য ও চরিত্রকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল : "......the motive behind it (the peasant movement) is economic. Only money-lenders were attacked and many Mahomedan money-lenders were threatened or looted."[৩৬] সরকার এ কথাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল : "......the low prices obtainable for agricultural produce are a cause of much anxiety."[৩৭] যুগ যুগ ধরে কৃষকদের উপর জমিদার-মহাজনদের যে বল্গাহীন শোষণ ও অত্যাচার চলে এসেছে, তার বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভই রূপ নিয়েছিল কিশোরগঞ্জের এই জঙ্গী কৃষক অভ্যুত্থানের।

এই কৃষক বিদ্রোহকে কঠোর হস্তে দমন করার ব্যাপারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার হিন্দু-মুসলমান জমিদারপক্ষ, বিদেশী মিশনারি প্রতিষ্ঠান, দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি রাজনৈতিক দল সকলেরই সমর্থন পেয়েছিল। এমন কি বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা ও "সন্ত্রাসবাদী" পথ অবলম্বনকারী জাতীয় বিপ্লবীরাও দুর্ভাগ্যজনকভাবে

এই কৃষক বিদ্রোহের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন।[৩৮] তদানীন্তন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য ও কিশোরগঞ্জের জমিদার সতীশ চন্দ্র রায়চৌধুরী কিশোরগঞ্জের ইয়ং কমরেডস্ লীগকে এই "দাঙ্গা"র জন্য দায়ী করে সভাকক্ষে বক্তব্য রাখেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারের নিকট দাবি জানান।[৩৯]

"প্রগতিশীল" অংশ সহ সমস্ত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং এই কৃষক বিদ্রোহের বিরুদ্ধে লেখা শুরু করে। *The Amrita Bazar Patrika, Liberty, Modern Review,* প্রবাসী প্রভৃতি সমস্ত জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকাতেই এই কৃষক বিদ্রোহের বিরুদ্ধাচরণ করে লেখা প্রকাশিত হয়।[৪০] বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী দৈনিক *The Amrita Bazar Patrika*-র ১৮ জুলাই ১৯৩০ সংখ্যায় লেখা হয়: "It is stated that the disturbances at Kishoreganj are more economic in their origin than communal and the fact that money-lenders are being attacked. But whether the origin of the trouble is economic or communal, it does not matter much. We shall be only too glad if it is not communal in character.······The situation is a serious one and if the authorities do not want the tragic scenes of Dacca to be re-enacted in Mymensingh they should lose no time in tackling it with firmness and determination."[৪১] *The Amrita Bazar Patrika*-র প্রশ্ন করা হয়: "Can there be any doubt that the situation is extremely grave necessitating the authorities to take drastic methods to bring it under control?"[৪২] তৎকালীন বাম-জাতীয়তাবাদী পত্রিকা *Liberty*-র ২৮ জুলাই ১৯৩০ সংখ্যায় লেখা হয়: "In spite of the governor's readiness to strengthen the hands of the local officials, looting and arson are still going on to the discredit of those charged with the duty of maintaining peace and order in Kishoreganj."[৪৩] *Liberty* দুর্ভাগ্যজনকভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে এই আন্দোলন আরও কঠোর হস্তে দমন করার জন্য দাবি জানায়, তা সেখানকার অপরাধের চরিত্র যাই হোক্ না কেন: "whatever may be the nature of the crimes in Kishoreganj."[৪৪]

১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন "অস্থায়ী কলকাতা কমিটি"র তরফ থেকে কিশোরগঞ্জের কৃষক অভ্যুত্থানকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়।[৪৫] প্রকাশিত ইস্তাহারে কিশোরগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহের মৌলিক আর্থনীতিক কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয় এবং বাংলার কৃষকশ্রেণীকে কিশোরগঞ্জের সংগ্রামী কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়। ইস্তাহারে বলা হয়: "গভীর আর্থ-রাজনীতিক সঙ্কট জনগণকে বিদ্রোহের পথে নিয়ে যাচ্ছে এবং কিশোরগঞ্জ

সমগ্র দেশের জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির দ্যোতক।"[৪৬] ইস্তাহারে বিভিন্ন সংগ্রামী স্লোগানের উল্লেখ ছিল : "মহাজন, জমিদার ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন ধ্বংস কর! পূর্ণ এবং চূড়ান্ত স্বাধীনতা! শ্রমিক-কৃষকের সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রী!"[৪৭]

কিন্তু এই সমস্ত স্লোগান্‌ বাস্তবায়িত হল না, হওয়া সম্ভব ছিল না। দুর্বল ও অসংগঠিত সি. পি. আই.-এর পক্ষে কিশোরগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হল না। ফলে বিদ্রোহ অনেকাংশেই সঠিক নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হল। সব স্লোগান্‌ আবার যুগোপযোগীও ছিল না, কিছু কিছু ছিল যুগের তুলনায় অধিক অগ্রসর। সি. পি. আই.-এর ভূমিকাও ইস্তাহার প্রকাশ ও স্লোগানের স্তরেই আবদ্ধ ছিল। এমন কি এই কৃষক বিদ্রোহের সংগঠকদের সঙ্গে সি. পি. আই. কোনও রূপ যোগাযোগও স্থাপন করে উঠতে পারেনি।[৪৮] তদুপরি অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, কমিউনিস্ট পার্টি পরবর্তীকালে এই সংগ্রামী কৃষক অভ্যুত্থানের উপর আর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে নি।[৪৯]

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কিশোরগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহকে দমন করতে সমর্থ হলেও বৃহত্তর অর্থে এই বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করেছিল। জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ এক গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। এই কৃষক বিদ্রোহ জাতীয় বিপ্লবীদের কমিউনিস্ট ভাবধারায় আকৃষ্ট তরুণতর অংশটিকে বৈপ্লবিক "সন্ত্রাসবাদী" পথের সীমাবদ্ধতা ও গণ-সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাতে সহায়ক হয়েছিল। সচেতন কৃষক সংগ্রাম তাঁদের সামনে উন্মোচিত করেছিল এক নতুন দিগন্ত।[৫০]

কিশোরগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহ ছাড়াও রামরাঘব লাহিড়ীর নেতৃত্বে ওয়াই. সি. এল.-এর মালদহ শাখা ১৯৩১ সালে মালদহে একটি কৃষক আন্দোলনে সংগঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল। এই আন্দোলন দমন করতেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চরম নৃশংসতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।[৫১]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির "কলকাতা কমিটি" গঠন : ইয়ং কমরেডস্‌ লীগের ভূমিকা

বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলার ব্যাপারে এবং পরবর্তীকালে বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত করে তোলার ব্যাপারে ইয়ং কমরেডস্‌ লীগের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুধাংশু কুমার অধিকারী সহ ইয়ং কমরেডস্‌ লীগের অন্যান্য নেতারা বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির শাখা খোলার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালান। ১৯৩০ সালেই ইয়ং কমরেডস্‌ লীগ নেতা সুধাংশু অধিকারী ও লীগের ছাত্র নেতা জগজ্জিত সরকার উভয়ে শ্রমিক নেতা এ. এম. এ. জামান ও সদ্য 'কমিউনিস্ট অবনী চৌধুরীর সংস্পর্শে আসেন। এই সময় তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিনিধি কমরেড হেনরী জি. লিও গোপনে কলকাতায় আসেন। কমরেড লিওর প্রস্তাবানুসারে ১৯৩০ সালেই কলকাতায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একটি অস্থায়ী কমিটি বা নিউক্লিয়াস সংগঠিত

করা হয়। এই কমিটির নামকরণ করা হয় 'অস্থায়ী কলকাতা কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অংশ'। এই 'অস্থায়ী কলকাতা কমিটি'র প্রাথমিক সদস্য ছিলেন পাঁচজন—সুধাংশু অধিকারী, অবনী চৌধুরী, এ. এম. এ. জামান, জগজ্জিত সরকার এবং নদীয়া জেলার একজন কৃষক (নাম জানা যায়নি)। বোম্বাইতে সংগঠিত কমিউনিস্ট পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এস. ভি. দেশপাণ্ডের সুপারিশক্রমে সদাশিবম্ (ছদ্মনাম) নামে একজন কমরেডও এই অস্থায়ী কলকাতা কমিটির সঙ্গে যুক্ত হন।[৫২] ১৯৩০ সালে এই 'অস্থায়ী কলকাতা কমিটি' গঠিত হওয়ার পর সুধাংশু অধিকারী ও অন্যান্যরা উপলব্ধি করেন পুরাতন কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত না হলে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা যাবে না। ১৯৩১ সালের জানুআরি মাসে আব্দুল হালিম জেল থেকে ছাড়া পেলে সুধাংশু অধিকারীরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং এই 'অস্থায়ী কলকাতা কমিটি' পুনর্গঠনের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে স্থির হয়। কিন্তু এই আলোচনা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই ১৯৩০ সালে পাস হওয়া বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল অ্যামেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্ট বলে ১৯৩১ সালের ৫ এপ্রিল সুধাংশু অধিকারীকে গ্রেফ্‌তার করা হয়।[৫৩] সুধাংশু অধিকারী ব্যতীত ইয়ং কমরেডস্‌ লীগের অন্যান্য সকল নেতাই ১৯৩০ সালেই ঐ এ্যাক্ট-এ গ্রেফ্‌তার হয়ে গেছেন। তাঁদের সকলের গ্রেফ্‌তারের পূর্বেই ধরণী গোস্বামী ১৯২৯ সালের ২০ মার্চ "মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা" সূত্রে গ্রেফ্‌তার হয়ে গেছেন। ফলে ১৯৩১ সালের গোড়ার দিকেই যখন স্থায়ীভাবে আব্দুল হালিমকে সম্পাদক করে 'কলকাতা কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অংশ' এই নাম দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখা গঠন করা হল,[৫৪] তখন তাতে ইয়ং কমরেডস্‌ লীগের কেউই অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, কারণ তারা সকলেই তখন জেলে বন্দী।

কিন্তু ইয়ং কমরেডস্‌ লীগ বাংলাদেশে কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন সংগঠিত করে তোলার ব্যাপারে নিঃসন্দেহে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। একইসঙ্গে বাংলা তথা ভারতে যুব রাজনীতির সূত্রপাতের ক্ষেত্রেও লীগ পথিকৃৎ-এর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ইয়ং কমরেডস্‌ লীগই ছিল প্রথম সেতু সংগঠন যার মাধ্যমে জাতীয় বিপ্লবীদের প্রথম অংশটি "বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের" পথ ত্যাগ করে কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেন ও গণ-বিপ্লবের পথ অবলম্বন করেন। লীগের প্রায় সকল সদস্যই জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পুনর্বার কমিউনিস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

মূল্যায়ন

সি. পি. আই.-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইয়ং কমরেডস্‌ লীগ সি. পি. আই.-এর তৎকালীন "বাম-সংকীর্ণতাবাদী" রাজনীতির[৫৫] অন্ধ অনুকরণে কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে এক ভ্রান্ত ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বাংলাদেশে গণআইন

অসান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণে বিরত থাকে এবং ফলে সি. পি. আই.-এর মতই "বাম-সংকীর্ণতাবাদী" বিচ্যুতির শিকার হয়। ফলে লাভ হয় একমাত্র বুর্জোয়া কংগ্রেস নেতৃত্বের। কিন্তু এই বিচ্যুতি সত্ত্বেও বাংলাদেশে সাধারণভাবে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং বিশেষ করে জাতীয় বিপ্লবীদের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রচারে ও প্রসারে অবদানের কারণেই ইয়ং কমরেডস্ লীগ বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণে ইয়ং কমরেডস্ লীগের ভূমিকা কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসচর্চার আবশ্যক অঙ্গ।

সূত্রনির্দেশ :

১. Dharani Goswami, 'Pages from the Past', *Marxist Miscellany*, No. 1, January, 1970, New Delhi, p. 41.

২. Satyendra Narayan Mazumdar, *In Search of A Revolutionary Ideology and A Revolutionary Programme : A Study in the Transition from National Revolutionary Terrorism to Communism*, People's Publishing House, New Delhi, December, 1979, pp. 165-66.

৩. লেখকের সঙ্গে ধরণী গোস্বামীর সাক্ষাৎকার—২৮. ১০. ১৯৮৭, ৪. ১১. ১৯৮৭ ; লেখকের সঙ্গে সুধাংশু কুমার অধিকারীর সাক্ষাৎকার—৮. ১২. ১৯৮৭, ২৬. ১. ১৯৮৮. ; লেখকের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের সাক্ষাৎকার—৩০. ৫. ১৯৮৬. ; Satyendra Narayan Mazumdar, op, cit., pp. 153-54, 163-65 ; Gautam Chattopadhyay, *Communism and Bengal's Freedom Movement*, *Volume I (1917-29)*, People's Publishing House, New Delhi, November, 1970, Appendix A, Interviews, pp. 133-36, 147, 148-49, 155.

৪. ধরণী গোস্বামীর সাক্ষাৎকার—২৮. ১০. ১৯৮৭., ৪. ১১. ১৯৮৭. ; ধরণী গোস্বামী, 'বাঙলা তথা ভারতে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রসার ও পার্টি গড়ার আদিপর্ব', কমিউনিস্ট, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অর্ধশতক পূর্তি উপলক্ষে সি. পি. আই. দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ ১৪৯ ; S. N. Mazumdar, op. cit., p. 165.

৫. ধরণী গোস্বামীর সাক্ষাৎকার ; ধরণী গোস্বামী, পূর্বোল্লিখিত, কমিউনিস্ট, পৃ ১৪৯, ১৫২ ; S. N. Mazumdar, op. cit., p. 203.

৬. ১৯২৫ সালের ১ নভেম্বর গঠিত হওয়ার সময় এই পার্টির নাম ছিল লেবার-পেজ্যান্ট্‌-স্বরাজ পার্টি অভ্‌ দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। ১৯২৬ সালের ৬ ফেব্রুআরি পার্টির নাম পরিবর্তিত হয়ে পেজ্যান্ট্‌স্‌ অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স্‌ পার্টি অভ্‌ বেঙ্গল নাম হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯২৮ সালের ৩১ মার্চ ও ১ এপ্রিল ভাটপাড়ায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে এই পার্টি ওয়ার্কার্স্‌ অ্যাণ্ড পেজ্যান্ট্‌স্‌ পার্টি অভ্‌ বেঙ্গল নাম গ্রহণ করে।

Gangadhar Adhikari (ed.), *Documents of the History of the Commumist Party of India*, (hereafter *Documents* : in a multi-volume project), People's Publishing House, New Delhi ; Vol. II (1923-1925), (Published in 1974), pp. 671-72 ; Vol. III-A (1926), (1978), p. 24 ; Vol. III-B (1927), (1979), pp. 41-42 ; Vol.-III C (1928), (1982). p. 447 ; মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, (প্রথম খণ্ড) (১৯২০-১৯২৯) এবং (দ্বিতীয় খণ্ড) (১৯২৯-১৯৩৪) (অসম্পূর্ণ), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪, (প্রথম খণ্ড), পৃ ৩৩৭-৫৮ ; Muzaffar Ahmad, *The Commumist Party of India and its Formation Abroad*, (Translated from Bengali by Professor Hirendranath Mukherjee), National Book Agency, Calcutta, April, 1962, p. 161.

৭. ধরণী গোস্বামীর সাক্ষাৎকার।

৮. ধরণী গোস্বামী, 'ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ত্রিশের দশকের এক অধ্যায়' (প্রথম পর্ব), পরিচয়, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ২-৩, শারদীয় ১৩৮০ বাংলা সন (বা. স.), ১৯৭৩, কলকাতা, পৃ ১৩১ ; নগেন সরকার, 'ইয়ং কমরেডস্‌ লীগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ', (ধরণী গোস্বামী সম্পাদিত), পরিচয়, বর্ষ ৪৪, সংখ্যা ৪, কার্তিক, ১৩৮১ বা. স., নভেম্বর, ১৯৭৪, কলকাতা, পৃ ৪৩৯ ; ধরণী গোস্বামীর সাক্ষাৎকার—২৮. ১০. ১৯৮৭., ৪. ১১. ১৯৮৭. ; সুধাংশু কুমার অধিকারীর সাক্ষাৎকার—৮. ১২. ১৯৮৭., ২৬. ১. ১৯৮৮. ; সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের সাক্ষাৎকার—৩০. ৫. ১৯৮৬. ; Satyendra Narayan Mazumdar, op. cit., p. 166 ; David M. Laushey, *Bengal Terrorism and The Marxist Left : Aspects of Regional Nationalism in India, 1905—1942*, Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1975, p. 97 ; Horace Williamson, *India and Communism*, (With an introduction and explanatory notes by Mahadevaprasad Saha), Editions Indian, Calcutta, 1976, pp. 125, 231.

আবার অন্যত্র ধরণী গোস্বামী ও সুধাংশু কুমার অধিকারীর লেখায় পাওয়া যায়

যে, ওয়াই. সি. এল. ১৯২৯ সালের প্রথম ভাগে গঠিত হয়েছিল। ধরণী গোস্বামী, 'একটি কৃষক বিদ্রোহের কাহিনী', পরিচয়, বর্ষ ৩৯, সংখ্যা ২-৩, ভাদ্র—আশ্বিন, ১৩৭৬ বা. স., সেপ্টেম্বর—অক্টোবর, ১৯৬৯, শারদীয় সংখ্যা, কলকাতা, পৃ ২১০ ; Dharani Goswami, op. cit., *Marxist Miscellay*, (*hereafter M. M.*), p. 34 ; সুধাংশু অধিকারী, স্মৃতি-মন্থন, প্রকাশক : পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়, ১৫, রাজা রামমোহন রায় সরণী, শ্রীরামপুর, হুগলী, মার্চ, ১৯৮৮, পৃ ৪৫।

৯. Gangadhar Adhikari (ed.), *Documents of the History of the Communist Party of India*, (hereafter *Documents*), Vol. III-C (1928), People's Publishing House, New Delhi, December, 1982, *Introduction to Part I*, pp. 95-97.

১০. Ibid., p. 97.

১১. Meerut Records, P. 565 and P. 563, in Adhikari (ed.), *Documents*, Vol. III-C, pp. 97-98.

১২. Gopen Chakravarty's Statement in the Meerut Court, p. 147, in Adhikari (ed.), *Documents*, Vol. III-C, pp. 95-96.

১৩. Ibid, p. 96.

১৪. Meerut Records, P. 502 and P. 546 (6), in Adhikari (ed.), *Documents*, Vol. III-C, p. 96.

১৫. Ibid., pp. 297-98. *Statement*-এর পূর্ণ বয়ানের জন্য দেখুন - Adhikari (ed.), *Documents*, Vol. III-C, pp. 294-300.

১৬. Meerut Records, P. 284, in Adhikari (ed.), *Documents*, Vol. III-C, p. 99.

১৭. Adhikari (ed.), *Documents*, Vol. III-B (1927), p. 116 ; Vol. III-C (1928), p. 97 ; ধরণী গোস্বামীর সাক্ষাৎকার—২৮. ১০. ১৯৮৭., ৪. ১১. ১৯৮৭. ; সুধাংশু অধিকারীর সাক্ষাৎকার—৮. ১২. ১৯৮৭., ২৬. ১. ১৯৮৮.।

১৮. ধরণী গোস্বামীর ও সুধাংশু অধিকারীর সাক্ষাৎকার।

১৯. ধরণী গোস্বামীর ও সুধাংশু অধিকারীর সাক্ষাৎকার ; সুধাংশু অধিকারী, স্মৃতিমন্থন, পৃ ৪৫ ; Satyendra Narayan Mazumdar, op. cit., p. 166.

২০. ধরণী গোস্বামী, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, শারদীয়, ১৯৭৩, পৃ ১৩৩-৩৪ ; নগেন সরকার, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, পৃপৃ ৪৩৯-৪০ ; ধরণী গোস্বামী, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, শারদীয়, ১৯৬৯, পৃপৃ ২১০-১১ ; Dharani Goswami, op. cit., *M. M.*, p. 34 ; S. N. Mazumdar, op. cit., p. 166 ; সুধাংশু

অধিকারী,স্মৃতি-মন্থন, পৃ ৪৫ ; ধরণী গোস্বামীর ও সুধাংশু অধিকারীর সাক্ষাৎকার।

২১. ধরণী গোস্বামীর সাক্ষাৎকার। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন—মণি সিংহ, জীবন-সংগ্রাম, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, জুলাই, ১৯৮৬, পৃ ২৩-৪২।

২২. ধরণী গোস্বামীর সাক্ষাৎকার।

২৩. ধরণী গোস্বামী, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, শারদীয়, ১৯৭৩, পৃ ১৩৩-৩৪ ; নগেন সরকার, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, পৃ ৪৪২ ; ধরণী গোস্বামীর, সুধাংশু অধিকারীর ও সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের সাক্ষাৎকার ; Satyendra Narayan Mazumdar, *In Search of A Revolutionary Idelogy and A Revolutionary Programme*, p. 168 ; সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, আমার বিপ্লব-জিজ্ঞাসা, (১ম পর্ব : ১৯২৭-১৯৪৫), মনীষা, কলকাতা, আগস্ট, ১৯৭৩, পৃ ১৩৬, ১৪৭-৪৮।

২৪. সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, আমার বিপ্লব-জিজ্ঞাসা, পৃ ১৪৫-৪৬ ; সুধাংশু অধিকারীর সাক্ষাৎকার।

২৫. সুধাংশু অধিকারীর সাক্ষাৎকার।

২৬. Dharani Goswami, op. cit., *M. M.*, pp. 34-35 ; ধরণী গোস্বামী, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, শারদীয়, ১৯৬৯, পৃ ২১১-১২ ; ধরণী গোস্বামী, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, শারদীয়, ১৯৭৩, পৃ ১৩৪-৩৫ ; নগেন সরকার, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, পৃ ৪৪২-৪৫ ; সুধাংশু অধিকারী, স্মৃতি-মন্থন, পৃ ৪৮ ; ধরণী গোস্বামীর ও সুধাংশু অধিকারীর সাক্ষাৎকার ; Satyendra Narayan Mazumdar, *In Search of A Revolutionary Ideology and A Revolutionary Programme*, pp. 166-67 ; Tanika Sarkar, *Bengal : 1928-1934 : The Politics of Protest*, Oxford University Press, New Delhi, 1987, pp. 107-08 ; সুপ্রকাশ রায়, বিদ্রোহী ভারত, বুক ওয়ার্লর্ড, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৮৩, পৃ ৯১-৯২।

২৭. নগেন সরকার, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, পৃ ৪৪৫-৪৬।

২৮. নগেন সরকার, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, পৃ ৪৪৬ ; ধরণী গোস্বামী, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, শারদীয়, ১৯৬৯, পৃ ২১২ ; Dharani Goswami, op. cit., *M. M.*, pp. 35-36 ; ধরণী গোস্বামীর ও সুধাংশু অধিকারীর সাক্ষাৎকার।

২৯. ধরণী গোস্বামী, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, শারদীয়, ১৯৬৯, পৃ ২১২ ; Dharani Goswami, op. cit., *M. M.*, pp. 35-36.

৩০. ধরণী গোস্বামী, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, শারদীয়, ১৯৬৯, পৃ ২১২-১৩ ; Dharani Goswami, op. cit., *M. M.*, p. 36 ; নগেন সরকার, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, পৃ ৪৪৬-৪৭ ; ধরণী গোস্বামীর ও সুধাংশু অধিকারীর সাক্ষাৎকার ;

S. N. Mazumdar, op. cit., p. 167 ; Tanika Sarkar, op. cit., p. 112 ; সুপ্রকাশ রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৯২-৯৪ ।

৩১ ধরণী গোস্বামী, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, শারদীয়, ১৯৬৯, পৃ ২১৩ ; Dharani Goswami, op. cit., *M. M.*, p. 36 ; ধরণী গোস্বামীর সাক্ষাৎকার ।

৩২ ধরণী গোস্বামী, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, শারদীয় ১৯৬৯, পৃ ২১৫ ; Dharani Goswami, op. cit., *M. M.*, p. 38 ; নগেন সরকার, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, পৃ ৪৪৭-৪৯ ; সুধাংশু অধিকারী, স্মৃতি-মন্থন, পৃ ১০২ ; ধরণী গোস্বামীর ও সুধাংশু অধিকারীর সাক্ষাৎকার ; S. N. Mazumdar, op. cit., p. 167 ; সুপ্রকাশ রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৯৪ ।

৩৩. ধরণী গোস্বামী, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, শারদীয়, ১৯৬৯, পৃ ২১৫-১৬ ; Dharani Goswami, op cit, *M. M.*, p 38 ; নগেন সরকার, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, পৃ ৪৪৮-৪৯ ; ধরণী গোস্বামীর ও সুধাংশু অধিকারীর সাক্ষাৎকার ; সুধাংশু অধিকারী, স্মৃতি-মন্থন, পৃপৃ ১০০-০২ ; S. N. Mazumdar, op cit., p. 167.

৩৪. ধরণী গোস্বামী, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, শারদীয় ১৯৬৯, পৃপৃ ২১৪-১৬ ; Dharani Goswami, op. cit., *M. M.*, pp. 37-38 ; Tanika Sarkar, op. cit., pp. 107, 113.

৩৫. Home / Poll. / F. No. 18 / III / 1930 (February)—Fortnightly Report on the political situation of Bengal for the second-half of February 1930.

৩৬. Home / Poll. / F. No. 18 / VIII / 1930 (July)—Fortnightly Report on the political situation of Bengal for the first-half of July 1930.

৩৭. Home / Poll. / F. No. 18 / VIII / 1930 (July)—Fortnightly Report for the second-half of July 1930.

৩৮. ধরণী গোস্বামী, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, শারদীয়, ১৯৬৯, পৃ ২১৫, ২১৮ ; Dharani Goswami, op. cit., *M. M.*, pp. 38, 40-41 ; ধরণী গোস্বামীর ও সুধাংশু অধিকারীর সাক্ষাৎকার ; সুধাংশু অধিকারী, স্মৃতি-মন্থন, পৃ ১০০-০২ ; S. N. Mazumdar, op. cti., pp. 167-68 ; সুপ্রকাশ রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৯৪ ।

৩৯. নগেন সরকার, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, পৃ ৪৪৮-৪৯ ; সুধাংশু অধিকারী, স্মৃতি-মন্থন, পৃ ১০১ ; সুধাংশু অধিকারীর সাক্ষাৎকার ।

৪০. ধরণী গোস্বামী, পূর্বোল্লিখিত, পরিচয়, শারদীয়, ১৯৬৯, পৃ ২১৮ ; Dharani Goswami, op. cit., *M. M.*, pp. 39-41 ; সুধাংশু অধিকারী, স্মৃতি-মন্থন, পৃ ১০১ ; সুধাংশু অধিকারীর সাক্ষাৎকার ।

৪১. *The Amrita Bazar Patrika*, Calcutta, July 18, 1930, p. 2.

৪২. Ibid. ; এছাড়াও দেখুন—*The Amrita Bazar Patrika*, July 16, 1930, p. 8 ; July 17, 1930, p. 3 ; July 18, 1930, pp. 2-3.

৪৩. *Liberty*, Calcutta, July 28, 1930, p. 5.

৪৪. Ibid. ; এছাড়াও দেখুন—*Liberty*, July 16, 1930, p. 9 ; July 29, 1930, p. 5.

৪৫. ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির "অস্থায়ী কলকাতা কমিটি" কর্তৃক প্রকাশিত ইস্তাহারটির বেশ কিছু অংশ উদ্ধৃত হয়েছে নিম্নলিখিত প্রবন্ধে—Dharani Goswami, op. cit., *M. M.*, pp. 39-41 ; এছাড়াও ইস্তাহারটির মূল বক্তব্যের আলোচনা পাওয়া যায়—ধরণী গোস্বামী, পূর্বোল্লিখিত পরিচয়, শারদীয়, ১৯৬৯, পৃ ২১৭-২১৮ ; ইস্তাহারটির উল্লেখ পাওয়া যায়—সুধাংশু অধিকারী, স্মৃতি-মন্থন, পৃ ১০২ ।

৪৬. Dharani Goswami, op. cit., *M. M.*, p 41.

৪৭. Ibid.

৪৮. Ibid.

৪৯. সুধাংশু অধিকারী, স্মৃতি-মন্থন, পৃ ১০২ ; সুধাংশু অধিকারীর সাক্ষাৎকার ।

৫০. S. N. Mazumdar, op. cit., pp. 167-68.

৫১. সুধাংশু অধিকারীর সাক্ষাৎকার ।

৫২. ধরণী গোস্বামী, 'ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ত্রিশের দশকের এক অধ্যায়', (প্রথম পর্ব), পরিচয়, শারদীয়, ১৯৭৩, পৃ ১৩৬-৩৮ ; সুধাংশু অধিকারী, স্মৃতি-মন্থন, পৃ ৭৪, ৭৮ ; সুধাংশু অধিকারীর সাক্ষাৎকার ।

৫৩. সুধাংশু অধিকারী, স্মৃতি-মন্থন, পৃ ১০৬ ; সুধাংশু অধিকারীর সাক্ষাৎকার ।

৫৪. রণেন সেন, বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০-'৪৮), বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, মে, ১৯৮১, পৃ ৩৮-৪১ ; লেখকের সঙ্গে রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—২৮. ৪. ১৯৮৬, ১৫. ১. ১৯৮৭ ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, প্রথম খণ্ড (১৯৩০—১৯৪১), গণশক্তি পত্রিকা দপ্তর, কলকাতা, মে, ১৯৮৫, পৃ ৫১-৫২ ।

৫৫. বর্তমান সংকলনভুক্ত 'বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম পর্যায় : ১৯২৮-'১৯৩৫' নামক প্রথম প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ।

যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘ : জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ

বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণে যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের ভূমিকা। যশোর খুলনা যুব সঙ্ঘ সংক্রান্ত ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত বিবরণ নিতান্তই অপ্রতুল। যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের উদ্যোগে সম্প্রতি প্রকাশিত **'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা'** নামক বইটি সেই অভাব কিছুটা মিটিয়েছে। এই প্রবন্ধটি লেখার কাজে উক্ত বইটি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তথ্য-সংগ্রহের অন্যান্য উৎসের মধ্যে আছে যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের কয়েকজন সদস্যের এবং এই সংগঠন সম্পর্কে অবহিত কয়েকজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, এই সঙ্ঘের অন্যতম প্রথম সারির সদস্য প্রয়াত সুরেশ দাশগুপ্তের অপ্রকাশিত আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিচারণ, বঙ্গীয় পুলিস-সূত্র, মহাফেজখানা, এই সঙ্ঘের সদস্যদের দ্বারা প্রকাশিত কয়েকটি ইস্তাহার, চিন্মোহন সেহানবীশ লিখিত ভবানী সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং প্রয়াত ভবানী সেন ও বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কিত তাঁদের সহযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণ।

যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের কার্যকলাপের বিভিন্ন পর্যায়

আত্মপ্রকাশ থেকে বিলুপ্তি অবধি যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের কার্যকলাপকে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে পড়ে জাতীয় বিপ্লববাদী সংগঠন হিসাবে যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের আত্মপ্রকাশ ও কার্যকলাপ। প্রথম পর্যায়ে সঙ্ঘের কার্যকলাপ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ছিল "সন্ত্রাসবাদী" চরিত্রের। দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে যুব সঙ্ঘের একাংশের মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রতি আকর্ষণ এবং মতাদর্শ হিসাবে মার্কসবাদে দীক্ষা। মার্কসীয় মতবাদ বিশ্বাসী যুব সঙ্ঘের নেতৃবৃন্দের একাংশ সংগঠনটিকে মার্কসবাদী মতবাদে দীক্ষিত করে গণ-সংযোগ ও গণ-আন্দোলনের পথে টেনে আনার চেষ্টা করতে থাকেন, যদিও তখন নেতৃবৃন্দের অপরাংশের "সন্ত্রাসবাদী" কার্যকলাপ অব্যাহত ছিল। তৃতীয় পর্যায়ে পড়ে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রকে দলের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ এবং মার্কসবাদে বিশ্বাসী বামপন্থী দল হিসাবে যুব সঙ্ঘের পরিচিতি-প্রদান। চতুর্থ পর্যায়ে পড়ে যুব সঙ্ঘের নেতৃবৃন্দের ও কর্মীদের নির্বিচারে গ্রেফ্‌তারের পর সঙ্ঘের যে-সমস্ত সদস্য তখনও জেলের বাইরে ছিলেন, তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে শ্রমিক-ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও কার্যকলাপ। সাংগঠনিকভাবে এই পর্যায়ের কাজের দায়িত্ব যুব সংঘের উপর না বর্তালেও ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাঁরা এই পর্যায়ে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র সংগঠনের কাজ করছিলেন, তাঁরা ছিলেন যুব সঙ্ঘেরই সদস্য এবং বঙ্গীয় পুলিস-সূত্রে এই পর্যায়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংঘটিত কাজগুলিকে যুব সঙ্ঘের কাজ বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চম তথা শেষ পর্যায়ে পড়ে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের

নেতৃবৃন্দের ও কর্মীবৃন্দের প্রায় সকলেরই কমিউনিস্ট পার্টি'তে যোগদান, কমিউনিস্ট পার্টি'র যশোর জেলা কমিটির ও খুলনা জেলা কমিটির প্রতিষ্ঠা এবং পৃথক্ সংগঠন হিসাবে যুব সঙ্ঘের অবলুপ্তি। অবশ্য সুরেশ দাশগুপ্ত, অনন্ত মুখার্জী, বিষ্ণু মুখার্জী ও যোগেন সরকার—যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের এই চারজন সদস্য প্রথমে কমিউনিস্ট পার্টি'তে যোগ না দিয়ে বেঙ্গল লেবার পার্টি'তে যোগ দেন এবং পরে বেঙ্গল লেবার পার্টি থেকে কমিউনিস্ট পার্টি'তে আসেন।

যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের জন্ম ও প্রাথমিক কার্যকলাপ

বিশের দশকের প্রথমভাগেই যশোর ও খুলনা উভয় জেলাতেই দুটি প্রধান বিপ্লবী দল যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির কিছু কিছু কার্যকলাপ চালু ছিল। ১৯২৩ সাল নাগাদ যশোর জেলার অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় সংগঠক অতুলকৃষ্ণ ঘোষ কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে মতবিরোধের কারণে পৃথক্ একটি বিপ্লবী দল গঠন করার ব্যাপারে মনস্থির করেন। খুলনার দৌলত-পুর কলেজের ছাত্র অতুলকৃষ্ণ ঘোষ এই উদ্দেশ্যে খুলনা জেলা স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র প্রমথনাথ ভৌমিকের এবং যশোরের কৃষ্ণবিনোদ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অতুলকৃষ্ণ ঘোষের পরামর্শে খুলনার প্রমথনাথ ভৌমিক এবং যশোরের কৃষ্ণবিনোদ রায় নিজেদের উদ্যোগে তাঁদের নিজ নিজ জেলায় বিপ্লবী দল গঠনে প্রয়াসী হন। যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতি—এই দুই প্রধান বিপ্লবী দল থেকে পৃথক্ অস্তিত্ব রেখেই প্রমথ ভৌমিক ও কৃষ্ণবিনোদ রায়ের প্রচেষ্টায় ও নেতৃত্বে যথাক্রমে খুলনা ও যশোর জেলায় দুটি স্বতন্ত্র যুবগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। অতুল ঘোষের পরামর্শে প্রমথ ভৌমিক কৃষ্ণবিনোদ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং উভয় যুবগোষ্ঠীর মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। এই সময়েই ১৯২৩ সালের শেষভাগে যশোরে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে খুলনার বিপ্লবী যুব কর্মী প্রমথ ভৌমিক, নির্মলচন্দ্র দাস, বিভূতিভূষণ ঘোষ (গোখেল), উপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ যোগ দেন। যশোর থেকে যোগ দেন কৃষ্ণবিনোদ রায়। সম্মেলন চলাকালীনই যশোরের সন্ন্যাসী আশ্রমে এক রাতের গোপন আলোচনায় প্রমথ ভৌমিক, কৃষ্ণবিনোদ রায় প্রমুখ যশোর ও খুলনার দুটি স্বতন্ত্র যুবগোষ্ঠীকে একীভূত করে "যশোর-খুলনা যুবক সমিতি" (Jessore-Khulna Youngman's Association) নামে একটি সংযুক্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যশোর ও খুলনা উভয় বিপ্লবী সংস্থার মধ্যে আরও বেশ কিছু আলোচনার পর ১৯২৬ সালে যশোরে দুই সংস্থার একটি যুক্ত সম্মেলন হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত শ্রমিকনেতা মৃণালকান্তি বসু। ঐ সম্মেলন থেকেই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে একটি পৃথক্ জাতীয় বিপ্লববাদী সংগঠন হিসাবে সমিতির আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিছুদিনের মধ্যেই মহিলা কর্মীদের যোগদানের ফলে সমিতির নামটি পরিবর্তন করা হয়। নতুন নামকরণ হয়—"যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘ" (Jessore-Khulna

Youth Association)। ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত যুব সঙ্ঘের প্রকাশ্য মঞ্চের প্রথম সভাপতি ছিলেন মৃণালকান্তি বসু। প্রমথ ভৌমিক ও কৃষ্ণবিনোদ রায় ছিলেন প্রথম যুগ্ম সম্পাদক। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন নির্মলচন্দ্র দাস, বিভূতিভূষণ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বসু, দুলালমোহন সরকার, কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।[১]

যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজকর্মেরও বিভিন্ন দিক ছিল। উভয় জেলারই কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে থেকে যুব সঙ্ঘের সদস্যরা কাজ করতেন এবং চেষ্টা চালাতেন কংগ্রেস সংগঠনকে আবরণ হিসাবে ব্যবহার করে সঙ্ঘের প্রভাব বৃদ্ধি করার। যুব সঙ্ঘের সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজে লিপ্ত থেকে জনসংযোগ বৃদ্ধি করতেন এবং সঙ্ঘের জন্য সদস্য সংগ্রহ করতেন। কিন্তু কংগ্রেস সংগঠনের মাধ্যমে কাজ এবং জনকল্যাণকর কাজ ছিল মূল পরিকল্পনার আচ্ছাদন। গুপ্তসমিতি সংগঠনের মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতিই ছিল সঙ্ঘের নেতৃবৃন্দের মূল পরিকল্পনা। সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন ছিল অস্ত্রের এবং অর্থের। স্বাভাবিকভাবেই এই পর্যায়ে যুব সঙ্ঘ অস্ত্রসংগ্রহের ও অর্থসংগ্রহের কাজকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিল। অস্ত্রসংগ্রহেরও অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ডাকাতিই ছিল যুব সঙ্ঘের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজকর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।[২]

১৯২৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই কৃষ্ণবিনোদ রায়ের মাধ্যমে যশোর জেলার শচীন্দ্রনাথ মিত্র যুব সঙ্ঘে যোগ দেন।[৩] ১৯২৮ সালে প্রমথ ভৌমিকের এবং নির্মলচন্দ্র দাসের মারফত যুব সঙ্ঘে যোগ দেন পরবর্তীকালের প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা খুলনা জেলার ভবানীশঙ্কর সেনগুপ্ত (ভবানী সেন)।[৪]

ঙ: ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে যুব সঙ্ঘের যোগাযোগ এবং যুব সঙ্ঘে মার্কসবাদী চিন্তাধারার উন্মীলন

১৯২৬ সালে যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের আত্মপ্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই প্রমথ ভৌমিক প্রমুখ সঙ্ঘের নেতৃত্ববৃন্দের একাংশ সোভিয়েত বিপ্লব ও মার্কসবাদী চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। শুধুমাত্র ব্রিটিশ বিতাড়নই নয়, এই শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের কথাও তাঁরা চিন্তা করতে থাকেন। পদ্ধতি হিসাবে "সন্ত্রাসবাদ"-এর সীমাবদ্ধতা এবং শ্রমিক-কৃষকের অংশগ্রহণসঞ্জাত গণবিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা উপলব্ধি করতে থাকেন। ১৯২৬ সালেই যুব সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর প্রমথ ভৌমিক প্রমুখ নেতৃস্থানীয় কর্মীরা প্রখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে কলকাতায় যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশে মার্কসবাদী চিন্তাধারা প্রচার ও প্রসারের কাজে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অবদান ছিল অসামান্য। নিজে কোনওদিনই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক সদস্য না হলেও সারাজীবনই তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগী। বহু যুবককে কমিউনিস্ট মতাদর্শে দীক্ষিত করে ডঃ দত্তই কমিউনিস্ট পার্টির দিকে টেনে আনেন।

যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘেও মার্কসবাদী চিন্তাধারার উন্মীলনের ক্ষেত্রে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক।[৫]

১৯২৭ সালের প্রথমদিকে যুব সঙ্ঘ যশোরের বি. আর. সিং হলে এক যুব সম্মেলনের আয়োজন করে। এই যুব সম্মেলনে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির বক্তৃতায় তিনি যুব সমাজের কাছে দেশের বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সমাজতন্ত্রের পথ অনুসরণ করার আহ্বান জানান।[৬]

১৯২৮ সালের গোড়া থেকেই প্রমথ ভৌমিক প্রমুখ যুব সঙ্ঘের নেতৃবৃন্দের একাংশ মার্কসবাদকে মতাদর্শ, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে উদ্দেশ্য এবং গণবিপ্লবকে পথ হিসাবে গ্রহণ করেন। কলকাতার বাইরে কোনো জেলায় কোনো সংগঠনের পক্ষে মার্কসবাদকে মতাদর্শ হিসাবে গ্রহণ এই প্রথম।[৭] ১৯২৮ সালেই মার্কসবাদী মতাদর্শের ভিত্তিতে এবং কমিউনিজম প্রচারের ও প্রসারের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় ইয়ং কমরেডস্ লীগ। কলকাতার বাইরে কোনও জেলায় সংগঠন হিসাবে মার্কসবাদ গ্রহণের ক্ষেত্রে ইয়ং কমরেডস্ লীগের স্থান দ্বিতীয়।

অবশ্য ১৯২৮ সালে মার্কসবাদে যুব সঙ্ঘের দীক্ষা সম্পূর্ণ হয় নি। প্রমথ ভৌমিক মার্কসবাদী মতাদর্শে ভবানী সেন, ননীগোপাল বসু রায়চৌধুরী প্রমুখকে দীক্ষা দিলেও কৃষ্ণবিনোদ রায়, নির্মলচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ বসু, কালিদাস বসু, শচীন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ নেতৃত্বের অপরাংশ তখনও "সন্ত্রাসবাদী" কর্মপদ্ধতিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে মার্কসবাদকে গ্রহণ করেন নি।[৮] এঁদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ বসু ছাড়া সকলেই জেলে থাকতেই কমিউনিস্ট হয়ে যান এবং জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।[৯]

সুতরাং যুব সঙ্ঘের মধ্যে তখন চলেছিল দুই মতাদর্শের ও কর্মপদ্ধতির দ্বন্দ্ব। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের ফলে যুব সঙ্ঘে কোনও ভাঙ্গন ধরে নি। দুই মতাদর্শ ও কর্মপদ্ধতির সহাবস্থানের ভিত্তিতেই এই দ্বন্দ্বের সমাধান হয়েছিল।

যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘ ও খালিশপুর স্বরাজ আশ্রম

গান্ধীবাদী কংগ্রেসী নেতা যামিনীভূষণ মিত্র বিশের দশকের প্রথমভাগে খুলনা শহরের চার মাইল পশ্চিমে খালিশপুরে একটি স্বরাজ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতিষ্ঠার তিন-চার বছরের মধ্যেই গুরুতর লোকসানের কারণে স্বরাজ আশ্রমটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৬ সালে যুব সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর প্রমথ ভৌমিক, নির্মলচন্দ্র দাস প্রমুখ নেতারা যামিনী মিত্রের কাছে প্রস্তাব দেন যে, আশ্রমটি যুব সঙ্ঘের হাতে তুলে দিলে তাঁরা এটিকে পুনরায় চালু করবেন। যামিনী মিত্র সম্মতি দিলে যুব সঙ্ঘ খালিশপুর স্বরাজ আশ্রমটিকে হাতে নিয়ে ঐটিকে কেন্দ্র করে কৃষিকাজ, স্বাস্থ্যচর্চা, পঠনপাঠন প্রভৃতি শুরু করে। খালিশপুর স্বরাজ আশ্রম হয়ে ওঠে যুব সঙ্ঘের প্রধান কর্মকেন্দ্র। প্রমথ ভৌমিক, নির্মল দাস, উপেন বসু, নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ যুব সঙ্ঘের ৮-৯ জন নেতা

ও কর্মী এই আশ্রমে স্থায়ীভাবে থাকতেন। কৃষ্ণবিনোদ রায়, শচীন মিত্র, কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস বসু, ভবানী সেন, ননীগোপাল বসু রায়চৌধুরী, বিশ্বেশ্বর সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ সেন, মুকুন্দ মিত্র প্রমুখ নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন ও যোগাযোগ রাখতেন। সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতির গোপন আলাপ-আলোচনাও হত।[১০]

১৯২৮ সাল থেকে কৃষ্ণবিনোদ রায়, নির্মল দাস, উপেন্দ্রনাথ বসু, শচীন মিত্র, কালিদাস বসু প্রমুখ যুব সঙ্ঘের নেতারা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা ও তদনুযায়ী প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, এই সশস্ত্র অভ্যুত্থান দেশের যুবশক্তিকে ইংরেজ বিতাড়নে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করবে। কিন্তু মার্কসবাদী প্রমথ ভৌমিক এবং তাঁর প্রচেষ্টায় সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ভবানী সেন, বিশ্বেশ্বর সেনগুপ্ত, ননী বসু রায়চৌধুরী, শচীন সেন প্রমুখ দৃঢ় বক্তব্য প্রকাশ করে বলেন যে, এই "সন্ত্রাসবাদী" পদ্ধতি ইংরেজ বিতাড়নের জন্য যথেষ্ট নয় এবং শুধুমাত্র ইংরেজ বিতাড়নেই দেশের নিপীড়িত জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর হবে না, তার জন্য প্রয়োজন আমূল সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধন এবং সেই উদ্দেশ্যে গণজাগরণ। এই বিকল্প মতের কারণে সশস্ত্র অভ্যুত্থানপন্থীরা সেই মুহূর্তে কোনো চরম কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারলেন না। অবশ্য অন্যান্য বিপ্লবী দলগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে অস্ত্রসংগ্রহ ও অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্নভাবে রাজনৈতিক স্বদেশী ডাকাতির প্রচেষ্টা যুব সঙ্ঘের সশস্ত্র অভ্যুত্থানপন্থী নেতৃবৃন্দের তরফে অব্যাহত ছিল।[১১]

খালিশপুর স্বরাজ আশ্রমকে কেন্দ্র করে গণসংযোগের প্রচেষ্টাও যুব সঙ্ঘের তরফ থেকে চলতে থাকে। এই কাজে প্রমথ ভৌমিক, নির্মল দাস, বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়, নগেন মিত্র প্রমুখ উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাঁরা আশ্রমের জমিতে নিজেরাই কৃষিকাজ করতেন এবং উৎপন্ন ফসলের উদ্বৃত্ত অংশ নিজেরাই দৌলতপুর হাটে বিক্রি করতে নিয়ে যেতেন। কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার করে তাঁদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলার চেষ্টাও তাঁরা চালাতেন। যুব সঙ্ঘের বিষ্ণু চ্যাটার্জী প্রমুখ কয়েকজন কর্মী সুন্দরবনের নিকটবর্তী খুলনা জেলাভুক্ত পাইকগাছায় ও তার নিকটস্থ থানা অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে কাজ করা শুরু করেন। তাঁরা ঐ সমস্ত অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে নিরক্ষরতা-বিরোধী শিক্ষা অভিযান চালান এবং এই সূত্রে জমিদারি শোষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। খালিশপুর স্বরাজ আশ্রমেই প্রমথ ভৌমিক, ভবানী সেন প্রমুখ যুব সঙ্ঘের মধ্যে একটি গোপন ছোট গোষ্ঠী গড়ে তুলে মার্কসবাদ চর্চার মাধ্যমে সঙ্ঘের যুবক সদস্যদের মার্কসবাদে শিক্ষা দিয়ে যুব সঙ্ঘকেই একটি সম্পূর্ণ কমিউনিস্ট গ্রুপে পরিণত করার চেষ্টাও চালাতে থাকেন। আতঙ্কিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ১৯২৯ সালের গোড়ার দিকে এক মিথ্যা ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে প্রমথ ভৌমিক, বিষ্ণু চ্যাটার্জী প্রমুখ যুব সঙ্ঘের ও স্বরাজ আশ্রমের প্রধান কর্মীদের গ্রেফতার করে। যুব সঙ্ঘের কাজের গতি অবশ্য এর দ্বারা রোধ করা সম্ভব হয় নি।[১২]

অস্ত্রসংগ্রহ ও অর্থসংগ্রহের জন্য যুব সঙ্ঘের প্রচেষ্টা

আশু সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হলেও ১৯২৬ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের কর্মীরা অস্ত্রসংগ্রহ ও অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক স্বদেশী ডাকাতির কাজে লিপ্ত হন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে এই প্রচেষ্টা আরও জোরদার হয়ে ওঠে। এমনকি যুব সঙ্ঘের যাঁরা মার্কসবাদকে গ্রহণ করে গণবিপ্লবের কথা বলতেন, তাঁরাও এই প্রচেষ্টার বাইরে ছিলেন না। বঙ্গীয় পুলিস-সূত্রে যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘকে "যশোর-খুলনা কমিউনিস্ট-টেররিস্ট গ্রুপ" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পুলিশের তরফ থেকে নির্বিচারে সমস্ত কমিউনিস্ট গ্রুপ সম্পর্কেই "কমিউনিস্ট-টেররিস্ট" বা "টেরো-কমিউনিস্ট" এই বিভ্রান্তিমূলক আখ্যা প্রদান করা হলেও যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘ সম্পর্কে "কমিউনিস্ট-টেররিস্ট" আখ্যা সম্পূর্ণ অমূলক নয়। এমনকি যুব সঙ্ঘের নেতা ও কর্মীরাও পরবর্তীকালে তাঁদের এই পর্যায়ের কাজের আলোচনা-প্রসঙ্গে নিজেদের "টেরো-কমিউনিস্ট" বলেই বর্ণনা করেছেন।

যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের "সন্ত্রাসবাদী" কার্যকলাপের বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধের পরিধিভুক্ত নয়। তবে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যুব সঙ্ঘের কয়েকটি অ্যাক্‌শন্‌-এর কথা। এগুলির মধ্যে পড়ে ১৯৩০ সালের শেষ ভাগের বাগেরহাট-রূপসা লাইনের ছোট ট্রেনে মেল-ডাকাতির চেষ্টা, তার কয়েক মাস পরের বাগেরহাটের নিকট জয়গাছি গ্রামের এক সুদখোর মহাজনের বাড়িতে ডাকাতি, ১৯৩১ সালের ২৪ ফেব্রুআরি হাওড়া শহরতলির এক বড় মহাজনের গদিতে ডাকাতির প্রচেষ্টা, ১৯৩১ সালের মাঝামাঝি সময়ের সামন্তসেনা গ্রামের ডাক-লুঠ, খুলনা জেলায় ফকিরহাট থানার এক ধনী মহাজনের বাড়িতে ডাকাতি, ১৯৩২ সালের গোড়ার দিকের কয়েকটি অ্যাক্‌শন্‌-এর প্রচেষ্টা প্রভৃতি।[১৩]

বিভিন্ন গণ-আন্দোলনে যুব সঙ্ঘের ভূমিকা

১৯২৬ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে বিভিন্ন গণ-আন্দোলনে যুব সঙ্ঘের নেতা ও কর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। যশোর জেলার বন্দবিলার ইউনিয়ন বোর্ড-বিরোধী সত্যাগ্রহ আন্দোলনে (১৯২৭-১৯৩০) কৃষ্ণবিনোদ রায় ও অন্যান্য যুব সঙ্ঘ কর্মীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১৪] খুলনা জেলার "দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি" আবাসিক কলেজের বর্ণবৈষম্যমূলক ও জাতিবৈষম্যমূলক কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনের ও ধর্মঘটের (১৯২৮) নেতৃত্বে ছিলেন যুব সঙ্ঘের কর্মী ভবানী সেন, ননীগোপাল বসু রায়চৌধুরী, নগেন দে প্রমুখ।[১৫]

১৯৩০ সালের ১২ মার্চ থেকে গান্ধীর ডাণ্ডি অভিযান শুরুর মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ আইন-অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের সদস্যদের গান্ধীবাদের প্রতি কোনো আস্থা ও বিশ্বাস না থাকলেও তাঁরা

তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির অপরিণত নেতৃত্বের মতো এই গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করে "বাম সংকীর্ণতাবাদী" দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র আন্দোলনটিকেই "বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী" আখ্যা দিয়ে সমালোচনা করায়, এমন-কি বিরোধিতা করার নেতিবাচক ও ভ্রান্ত নীতি অবলম্বন করেন নি। বরং তাঁরা এটিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলন মনে করে এই আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং অংশগ্রহণকারী হিসাবে কারাবরণ করেন। আত্মগোপনকারী অবস্থায় প্রমথ ভৌমিক, কৃষ্ণবিনোদ রায় প্রমুখ যুব সঙ্ঘের নেতারা দুই জেলায় এই আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন।[১৬] আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী যুব সঙ্ঘের সদস্যদের একের পর এক বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল অ্যামেণ্ডমেণ্ট (বি. সি. এল. এ.) অ্যাক্ট-এ গ্রেফ্‌তার করা হয়। একে একে কারারুদ্ধ হন বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় (২ মে ১৯৩০), প্রমথ ভৌমিক (জুন ১৯৩০), নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (২৪ আগস্ট ১৯৩০), কৃষ্ণবিনোদ রায় (১৯৩০), শচীন মিত্র (১৯৩০) প্রমুখ।[১৭] ছাড়া পাওয়ার পর শচীন মিত্র পুনর্বার বি. সি. এল.এ. অ্যাক্ট-এ গ্রেফ্‌তার হন ২ জুন ১৯৩২; তিনি ছাড়াও বি. সি. এল. এ. অ্যাক্ট-এ গ্রেফ্‌তার হন ভবানী সেন (২২ মে ১৯৩২), সুকুমার মিত্র (১৯৩২) প্রমুখ।[১৮]

ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্ট্‌স্ পার্টি, ইয়ং কমরেডস্ লীগ প্রভৃতির সঙ্গে যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের যোগাযোগ

ইতিপূর্বে ১৯২৮ সালের ২১-২৪ ডিসেম্বর প্রাদেশিক দলগুলিকে একত্র করার উদ্দেশ্যে সর্দার সোহন সিং জোশের সভাপতিত্বে কলকাতার অ্যালবার্ট্ হলে বিভিন্ন প্রদেশের ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্ট্‌স্ পার্টিগুলির সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তখন বাংলাদেশে এই পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের কর্মীরা এই সম্মেলনে যোগ দেন। প্রমথ ভৌমিক সম্মেলনে গঠিত কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন।[১৯]

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন রাজশাহী শহরে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কংগ্রেস সম্মেলনের প্যাণ্ডেলেই আরও তিনটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ এপ্রিল ১৯৩০, প্রথম দিন, কংগ্রেস সম্মেলন হয়। যুব সম্মেলন বা স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলন হয় ১৬ এপ্রিল এবং রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন হয় ১৭ এপ্রিল। ১৮ এপ্রিল ১৯৩০, চতুর্থ দিন, রাজশাহী শহরে কংগ্রেস সম্মেলনের প্যাণ্ডেলেই ইয়ং কমরেডস্ লীগের প্রথম ও শেষ প্রকাশ্য প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা বঙ্কিম মুখার্জী। যুব সঙ্ঘের তরফ থেকে প্রমথ ভৌমিক সবকটি সম্মেলনেই প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন।[২০] ইয়ং কমরেডস্ লীগের সম্মেলনে প্রমথ ভৌমিক তাঁর বক্তৃতায় বলেন—"কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনের পথেও নয়, 'সন্ত্রাসবাদী' পথেও নয়, একমাত্র শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের পথেই ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শেই ভারতের স্বাধীনতা আসবে"।[২১]

মার্কসবাদে বিশ্বাসী বামপন্থী দল হিসাবে যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের ভূমিকা

১৯৩০ সালে কলকাতার মানিকতলা ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন্ স্ট্রীটের একটি ব্যারাক বাড়ির তিনতলার দুটি ঘরে যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের একটি শাখা দপ্তর খোলা হয়েছিল। ১৯৩১ সালের ২৪ ফেব্রুআরি একটি অ্যাক্শন্-এর দিন যখন ঐ প্রয়োজনে বিশ্বেশ্বর সেনগুপ্ত বোমা তৈরিতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন আকস্মিকভাবে একটি বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনা ঘটে। ঐ দুর্ঘটনায় বিশ্বেশ্বর সেনগুপ্ত গুরুতর আহত হন।[২২]

ঐ দুর্ঘটনার পর কলকাতার ১৮, গোপাল বসু লেনের (বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটের সংলগ্ন) একটি বাড়িতে যুব সঙ্ঘের নতুন শাখা কেন্দ্র খোলা হয়। ভবানী সেন, সুরেশ দাসগুপ্ত প্রমুখ যুব সঙ্ঘের নেতা ও কর্মীরা স্থায়ীভাবে ঐ ঘরে থেকে কলকাতায় যুব সঙ্ঘের কাজকর্ম পরিচালনা করতেন।[২৩]

১৯৩১ সালের আগস্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাসে ঐ ঘরেই যুব সঙ্ঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ গোপন অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন শচীন মিত্র। ভবানী সেন, সুরেশ দাসগুপ্ত, ননীগোপাল বসু রায়চৌধুরী, দুলাল সরকার, মুকুন্দ মিত্র, শশাঙ্কশেখর ঘোষ প্রমুখ ঐ অধিবেশনে যোগ দেন। যুব সঙ্ঘের প্রথম সারির নেতারা সকলেই কারারুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় সংগঠনকে পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দেয়। ঐ অধিবেশনেই নতুন নেতৃত্ব সংগঠন পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যুব সঙ্ঘের সর্বাধিনায়ক (তখন বলা হত "ডিক্টেটর") নির্বাচিত হন শচীন মিত্র। সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন ভবানী সেন। সহ-সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন সুরেশ দাসগুপ্ত, শশাঙ্কশেখর ঘোষ, দুলাল সরকার, নারায়ণ সেন, মুকুন্দ মিত্র প্রমুখ। সহ-সম্পাদকদের এক-একটি সেলের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং সেই সেলের সম্পাদক বলে ঘোষণা করা হয়। সুরেশ দাসগুপ্ত ছিলেন শ্রমিক সেলের সম্পাদক, শশাঙ্ক ঘোষ ছিলেন বুদ্ধিজীবী সেলের সম্পাদক, নারায়ণ সেন ছিলেন ছাত্র সেলের সম্পাদক এবং দুলাল সরকার ছিলেন অ্যাক্শন্ সেলের সম্পাদক।[২৪]

ঐ অধিবেশনেই আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কসবাদকে মতাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকেই উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ভবানী সেন এই মর্মে প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবিত কর্মসূচীর সারমর্ম হল—

"১। দলের কর্মক্ষেত্র ছাত্র-যুবক ছাড়া শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে প্রসারিত করা।

২। শ্রমিক-কৃষকদের ন্যায্য দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে যেখানে সম্ভব আন্দোলন গড়ে তোলা।

৩। বিদেশী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য হিংস্র-অহিংস্র সর্বপ্রকার আন্দোলনে যুক্ত থাকা।

৪। সম-মনোভাবাপন্ন দল ও নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা।

৫। দলের মতামত প্রচার ও প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিজস্ব পত্রিকা বার করা।"[২৫]

এই প্রস্তাবানুযায়ী দ্রুত কাজ শুরু হয়। ভবানী সেন ও তাঁর সহকর্মীরা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বঙ্কিম মুখার্জী, সোমনাথ লাহিড়ী, রণেন সেন, গোপাল হালদার প্রমুখের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কমিউনিস্ট পার্টি'র ও অন্যান্য কয়েকটি কমিউনিস্ট গ্রুপের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কলকাতা কর্পোরেশন-এর শ্রমিকদের মধ্যে ভবানী সেন, সুরেশ দাসগুপ্ত, শচীন মিত্র, শশাঙ্ক ঘোষ, নারায়ণ সেন প্রমুখ সেল গঠন করে কাজ শুরু করেন। শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী সচেতনতা, রাজনৈতিক চেতনা ও জঙ্গী মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভবানী সেন ও তাঁর সহকর্মীরা কয়েকটি হাতে লেখা প্রাথমিক পুস্তিকার সাহায্যে পঠনপাঠন শুরু করেন। শ্রমিকদের মৌলিক দাবিদাওয়া আলোচনার জন্য প্রায়ই শ্রমিক-বৈঠকের আয়োজন করা হত এবং শ্রমিকদের ক্লাস নেওয়া হত। প্রচণ্ড অর্থাভাব সত্ত্বেও উৎসাহের সঙ্গেই এইসব কাজ চলত।[২৬] যুব সঙ্ঘের কর্মীরা মেছুয়াবাজার, টেরিটিবাজার ও বড়বাজার এলাকায় ভিস্তিওয়ালাদের মধ্যে কাজ শুরু করেন এবং সংগঠন গড়ে তোলেন। ভিস্তিওয়ালাদের লেখাপড়াও শেখানো হত। এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন ভবানী সেন, সুরেশ দাসগুপ্ত প্রমুখ।[২৭] চটকল শ্রমিকদের সঙ্গেও এঁদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্যামনগরের গাড়ুলিয়া বাজারে চটকল মজদুর ইউনিয়নের অফিস খুলে সুরেশ দাসগুপ্ত চটকল শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠনের কাজ শুরু করেন।[২৮] শ্যামনগর, জগদ্দল, টিটাগড়, কাঁচরাপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে, শ্যামনগরের ভানবার কটন্ মিলের শ্রমিকদের মধ্যে এবং কাঁচরাপাড়ায় রেলশ্রমিকদের মধ্যে সুরেশ দাসগুপ্ত ১৯৩১ সাল থেকেই সংগঠন গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন।[২৯]

যশোর-খুলনা যুব-সঙ্ঘের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির ও অন্যান্য কমিউনিস্ট গ্রুপের যোগাযোগ

১৯৩১ সাল থেকেই যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের ভবানী সেন, সুরেশ দাসগুপ্ত, বিশ্বেশ্বর সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতারা কমিউনিস্ট পার্টি'র ও অন্যান্য কমিউনিস্ট গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালাতে থাকেন। ১৯৩১ সালের গোড়ার দিকেই আব্দুল হালিমকে সাধারণ সম্পাদক করে পাকাপাকিভাবে "কলকাতা কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অংশ"—এই নাম দিয়ে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে তখনও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে "কলকাতা কমিটি"র আনুষ্ঠানিকভাবে কোন যোগাযোগই স্থাপিত হয় নি। প্রাথমিকভাবে এই "কলকাতা কমিটি"র সদস্য ছিলেন পাঁচজন—আব্দুল হালিম (সাধারণ সম্পাদক), রণেন সেন, অবনী চৌধুরী, রমেন বসু ও অখিল ব্যানার্জী।[৩০] যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের মার্কসবাদে বিশ্বাসী সভ্যদের কমিউনিস্ট পার্টি'র "কলকাতা কমিটি"-তে যোগদানের ব্যাপারে উভয় দলের মধ্যে একটি আলোচনা হয়। ৭, মৌলভী লেনে এই আলোচনা সভায় "কলকাতা কমিটি"র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন হালিম, রণেন সেন, অবনী চৌধুরী ও অখিল ব্যানার্জী,

এবং যুব সঙ্ঘের তরফে উপস্থিত ছিলেন ভবানী সেন, বিশ্বেশ্বর সেনগুপ্ত ও আরও একজন। এই আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় ভবানী সেন প্রমুখ যুব সঙ্ঘের সদস্যরা কমিউনিস্ট পার্টির "কলকাতা কমিটি"-তে যোগ দেননি।[৩১]

এরপর ভবানী সেন প্রমুখ বোম্বাই-এর কমিউনিস্ট নেতা বি. টি. রণদিভের অনুগামী একটি কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ করেন। কিন্তু এই যোগাযোগও বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। তারপর ভবানী সেনের সঙ্গে যোগাযোগ হয় "কারখানা" গ্রুপ নামে একটি ছোট কমিউনিস্ট গ্রুপের। "কারখানা" নামে একটি মার্কসবাদী পত্রিকা এই গ্রুপের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হত। পত্রিকার নামেই গ্রুপের নাম ছিল "কারখানা" গ্রুপ। প্রভাস ব্যানার্জী, এ. এম. এ. জামান, নরেন চ্যাটার্জী প্রমুখ ছিলেন এই গ্রুপের নেতা। প্রভাস ব্যানার্জী এবং জামান উভয়েই, বিশেষ করে প্রভাস ব্যানার্জী ছিলেন অত্যন্ত বিতর্কিত চরিত্রের।

ভবানী সেন 'কারখানা' পত্রিকায় লিখতেন এবং তিনি কিছুদিন 'কারখানা' পত্রিকা সম্পাদনাও করেন, যদিও তাঁর নাম ঐ কাগজে কখনও প্রকাশিত হয় নি। এই গ্রুপের সঙ্গে ভবানী সেন কিছু কিছু ট্রেড ইউনিয়নেও কাজ করেন। শেষ পর্যন্ত ভবানী সেন "কারখানা" গ্রুপের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৯৩২ সালের ২২মে ভবানী সেন বি. সি. এল. এ. অ্যাক্ট্-এ গ্রেফ্তার হয়ে যান। ঐ আইনেই গ্রেফ্তার হন শচীন মিত্র (২ জুন ১৯৩২), বিশ্বেশ্বর সেনগুপ্ত (১৯৩২) প্রমুখ।[৩২]

ভবানী সেন ও শচীন মিত্র গ্রেফ্তার হয়ে যাওয়ার পর মুকুন্দ মিত্র যুব সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক হন এবং সুরেশ দাসগুপ্ত, শশাঙ্ক ঘোষ, নারায়ণ সেন প্রমুখের সহায়তায় যুব সঙ্ঘের কাজ চালাতে থাকেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পুলিশ সুরেশ দাসগুপ্তকে গ্রেফ্তার করে। জেলে কয়েক মাস থাকার পর সুরেশ দাসগুপ্ত খুলনা জেলার মূলঘরে তাঁর নিজের বাড়িতে অন্তরীণ (গৃহবন্দী) হয়ে থাকেন। মুকুন্দ মিত্র গ্রেফ্তার হওয়ায় শশাঙ্কশেখর ঘোষ যুব সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক হন। অবশ্য যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের সদস্যদের কারোরই আর বেশীদিন জেলের বাইরে থাকা সম্ভব হয় নি। ১৯৩২ সাল শেষ হওয়ার আগেই পুলিস যুব সঙ্ঘের প্রায় সকল সদস্যকেই গ্রেফ্তার করে। কেউ বেশী মেয়াদে, কেউ কম মেয়াদে জেলে আবদ্ধ হন। কোন কোন সদস্যকে অন্তরীণাবদ্ধ (গৃহবন্দী) করেও রাখা হয়। ফলে ১৯৩২ সালের শেষ নাগাদ যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের কাজকর্ম কার্যত বন্ধ হয়ে যায়।[৩৩]

ব্যক্তিগত উদ্যোগে যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের সদস্যদের পরবর্তী পর্যায়ের কার্যকলাপ

সংগঠন হিসাবে যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের কাজকর্ম ১৯৩২ সালের শেষ নাগাদ কার্যত বন্ধ হয়ে গেলেও সঙ্ঘের সদস্যরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে তাঁদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অবশ্য তখন সঙ্ঘের খুব অল্প সদস্যই

জেলের বাইরে ছিলেন। এই পর্যায়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাজের ক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নাম সুরেশ দাশগুপ্তের। মূলঘরে গৃহান্তরীণ (গৃহবন্দী) অবস্থায় থাকাকালীন সুরেশ দাসগুপ্ত গোপনে খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার কৃষক কেন্দ্রগুলিতে যেতেন এবং কৃষকদের নিয়ে বৈঠক করতেন। বাগেরহাটের যুব সঙ্ঘের অবশিষ্ট সদস্যদের নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে ক্লাস্‌ও করতেন। পরবর্তীকালে গোপনে খুলনা শহরে গিয়েও তিনি সংগঠন গড়ার চেষ্টা চালাতেন। ১৯৩৩-৩৪ সালে খুলনা জেলার মৌভোগে ও নলধায় সুরেশ দাসগুপ্ত, শচীন (খোকা) বসু ও অনিল ঘোষ কৃষকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁদের কর্মোদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় ঐ দুই অঞ্চলে কৃষক সংগঠন ক্রমশ শক্তি অর্জন করতে থাকে। কৃষক পরিবারের ছেলেরাই ছিলেন এগুলির প্রধান সংগঠক।[৩৪]

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৫ সাল অবধি কলকাতায় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের সদস্যরা কমিউনিস্ট পার্টি'র ও বেঙ্গল লেবার পার্টি'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে কাজ করতেন। তাঁদের কাজ ছিল মূলত শ্রমিকদের মধ্যে এবং কিছুটা পরিমাণে ছাত্রদের মধ্যে।[৩৫] অবশ্য স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখে যুব সঙ্ঘের অবশিষ্ট সদস্যরা বেশীদিন কাজ করেন নি। ১৯৩৩ সালের শেষভাগে সুরেশ দাসগুপ্ত, অনন্ত মুখার্জী, বিষ্ণু মুখার্জী ও যোগেন সরকার—যুব সঙ্ঘের এই চারজন অগ্রণী সদস্য বেঙ্গল লেবার পার্টি'তে যোগ দেন।[৩৬] কলকাতায় কর্মরত যুব সঙ্ঘের কয়েকজন সদস্য কমিউনিস্ট পার্টি'তেও যোগ দেন।[৩৭]

বঙ্গীয় পুলিস-সূত্রে যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘ ও তার কলকাতায় কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।[৩৮] বঙ্গীয় পুলিসের তরফ থেকে এই সংগঠনকে "যশোর-খুলনা কমিউনিস্ট-টেররিস্ট গ্রুপ" বলে বর্ণনা করা হয়েছিল।[৩৯] যুব সঙ্ঘের যে-সময়ের কার্যকলাপ (১৯৩৩-১৯৩৫) সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে এই আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, সেই সময়ে যুব সঙ্ঘের সদস্যরা কোনও রকম "টেররিস্ট" ("সন্ত্রাসবাদী") কাজের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন না। তদুপরি যুব সঙ্ঘ-সম্পর্কিত পুলিসী বিবরণ ও তথ্য অত্যন্ত বিভ্রান্তিমূলক এবং অন্য কোনও সূত্রেই সমর্থিত হয়নি। ১৯৩৫ সালে যুব সঙ্ঘের কাজের আলোচনা প্রসঙ্গে এই সংগঠনকে সুরেশ দাসগুপ্তের ও শচীন মিত্রের দল বলে পুলিসী সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪০] ১৯৩৩ সালের শেষদিকেই সুরেশ দাসগুপ্ত বেঙ্গল লেবার পার্টি'তে যোগ দেন। আর শচীন মিত্র ১৯৩২ সালের ২ জুন বি. সি. এল. এ. অ্যাক্ট্‌-এ গ্রেফ্‌তার হয়ে পাঁচ বছরেরও বেশী সময় বিভিন্ন জেলে বিনা বিচারে আটক থাকেন।[৪১]

যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের অবলুপ্তি এবং এই দলের সদস্যদের কমিউনিস্ট পার্টি'তে যোগদান

বিভিন্ন জেলে ও বন্দীশিবিরে আটক থাকাকালীনই প্রমথ ভৌমিক, কৃষ্ণবিনোদ রায়, ভবানী সেন, শচীন মিত্র, বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র দাস, সুকুমার মিত্র প্রমুখ যশোর-

খুলনা যুব সঙ্ঘের নেতৃস্থানীয় প্রথম সারির সদস্যদের প্রায় সকলেই সম্পূর্ণভাবে মার্কসবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠে কমিউনিস্ট কনসলিডেশনে যোগ দেন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তাঁরা সকলেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্য হন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি'তে যোগ দেন স্বকুমার মিত্র। ১৯৩৫ সালে সুকুমার মিত্রের মাধ্যমে কৃষ্ণবিনোদ রায় এবং যুব সঙ্ঘের আরও কয়েকজন সদস্য কমিউনিস্ট পার্টি'তে যোগ দেন। যশোর ও খুলনায় কমিউনিস্ট পার্টি'র দুটি স্বতন্ত্র জেলা কমিটি গঠিত হয়। ১৯৩৭ সালে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর প্রমথ ভৌমিক, নির্মল দাস, বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়, শচীন মিত্র প্রমুখ কমিউনিস্ট পার্টি'তে যোগ দেন। কৃষ্ণবিনোদ রায় যশোর জেলা কমিটির এবং প্রমথ ভৌমিক খুলনা জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। স্বকুমার মিত্র, শচীন মিত্র, অমল (বাসু) সেন প্রমুখ যশোর জেলা কমিটির সদস্য হন। খুলনা জেলা কমিটির সদস্য হন নির্মল দাস, বিষ্ণু চ্যাটার্জী, শচীন (খোকা) বসু প্রমুখ। ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে মুক্তি পেয়ে ঐ বছরেরই নভেম্বর মাসে ভবানী সেন কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্য হন।[৪২] সদস্যপদ লাভের কিছুদিন পরেই ভবানী সেন প্রাদেশিক নেতৃত্বের অন্তর্ভূ'ত হয়ে কাজ করতে থাকেন এবং ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে তিনি নির্বাচিত হন কমিউনিস্ট পার্টি'র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক পদে।

যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘ আজ প্রায় বিস্তৃতির অন্তরালে। কিন্তু জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণে এই সংগঠনের ভূমিকা কমিউনিস্ট পার্টি'র ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে অবশ্যই স্বীকার্য।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা, যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের উদ্যোগে প্রকাশিত, প্রধান সম্পাদক—স্বকুমার মিত্র, প্রকাশক—শশাঙ্কশেখর ঘোষ ও কুমার মিত্র, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৮৯, পৃ ১১৮-১৯, ১২৭-২৯, ৩৯৭ ; লেখকের সঙ্গে শশাঙ্কশেখর ঘোষ ও কুমার মিত্রের সাক্ষাৎকার —২৭. ১. ১৯৯০।

২. তদেব, পৃ ১৩৭-৪০ ; শশাঙ্কশেখর ঘোষ ও কুমার মিত্রের সাক্ষাৎকার—২৭. ১. ১৯৯০।

৩. তদেব, পৃ ১২৯।

৪. তদেব, পৃ ১৩৫ ; শশাঙ্কশেখর ঘোষ ও কুমার মিত্রের সাক্ষাৎকার—২৭. ১. ১৯৯০. ; Chinmohan Sehanavis, 'A Brief Life-Sketch,' in *Bhowani Sen : Tributes*, Communist Party Publication, New Delhi, December, 1972, pp. 102-03 ; চিন্মোহন সেহানবীশ, 'জীবনী (ভবানী সেন),' ভবানী সেন : নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ, শিবশঙ্কর মিত্র

(সম্পাদিত), (প্রথম খণ্ড), ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ, কলকাতা, জুলাই, ১৯৭৪, পৃ এগারো-বারো।

৫. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৪২-৪৪ ; শশাঙ্ক ঘোষ ও কুমার মিত্রের সাক্ষাৎকার।

৬. তদেব, পৃ ১৪৩-৪৪ ; শশাঙ্ক ঘোষ ও কুমার মিত্রের সাক্ষাৎকার।

৭. শশাঙ্ক ঘোষ ও কুমার মিত্রের সাক্ষাৎকার।

৮. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৪৩ ; শশাঙ্ক ঘোষ ও কুমার মিত্রের সাক্ষাৎকার ; সুরেশ দাশগুপ্তের আত্মজীবনীমূলক স্মৃতি-চারণ (অপ্রকাশিত), ১৯৭৮, পৃ ১০-১১ (১৯৭৮ সালে লিখিত অপ্রকাশিত ৪২ পৃষ্ঠা পাণ্ডুলিপির ১০-১১ পৃষ্ঠা)।

৯. শশাঙ্ক ঘোষ ও কুমার মিত্রের সাক্ষাৎকার।

১০. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৪৪-৪৫ ; শশাঙ্ক ঘোষ ও কুমার মিত্রের সাক্ষাৎকার ; Pramatha Bhaumik, 'Boyhood and youth' in *Bhowani Sen : Tributes*, op. cit, p. 80 ; কুমার মিত্র, 'বিষ্ণুদার জীবন-কথা,' অমর কৃষক নেতা বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় (১৯১০-১৯৭১), প্রকাশক—অশোক মিত্র (বাংলাদেশ মুক্তি-সংগ্রাম সহায়ক সমিতির পক্ষ হইতে) (যশোহর-খুলনা), কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৭১, পৃ ৪ ; লেখকের সঙ্গে ধনঞ্জয় দাশের সাক্ষাৎকার—২৩.৯. ১৯৮৯।

১১. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৪৫ ; শশাঙ্ক ঘোষ ও কুমার মিত্রের সাক্ষাৎকার।

১২. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৪৫-৪৬, ১৫৯ ; শশাঙ্ক ঘোষ ও কুমার মিত্রের সাক্ষাৎকার ; Pramatha Bhaumik, op cit., in *Bhowani Sen : Tributes*, p. 80 ; কুমার মিত্র, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪ ; ধনঞ্জয় দাশের সাক্ষাৎকার।

১৩. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৩৩-৪৩ ; শশাঙ্ক ঘোষ ও কুমার মিত্রের সাক্ষাৎকার।

১৪. তদেব, পৃ ১৫৫।

১৫. তদেব, পৃ ১৫৮-৫৯।

১৬. শশাঙ্ক ঘোষ ও কুমার মিত্রের সাক্ষাৎকার।

১৭. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৩৭, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৮, ১৯৮, ২০২, ২৫৩, ৩৪৩ ; কুমার মিত্র, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৯ ; Pramatha Bhaumik, op cit., p. 81 ; প্রমথ ভৌমিক, 'বন্দীশালা থেকে নগরে প্রান্তর,' কমিউনিস্ট, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অর্ধশতক পূর্তি উপলক্ষে সি. পি. আই.

দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ ৫০।

১৮. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৩৩, ১৪৭, ৪১১ ; Chinmohan Sehanavis, op. cit., in *Bhowani Sen : Tributes*, p. 106 ; চিন্মোহন সেহানবীশ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ চৌদ্দ।

১৯ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৭১।

২০. তদেব, পৃ ১৭১-৭২ ; লেখকের সঙ্গে ধরণী গোস্বামীর সাক্ষাৎকার—২৮. ১০. ১৯৮৭., ৪. ১১. ১৯৮৭. ; লেখকের সঙ্গে সুধাংশুকুমার অধিকারীর সাক্ষাৎকার —৮. ১২. ১৯৮৭., ২৬. ১. ১৯৮৮. ; সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা, (১ম পর্ব : ১৯২৭-১৯৪৫), মনীষা, কলকাতা, আগস্ট, ১৯৭৩, পৃ ১৩৬।

২১. সুধাংশুকুমার অধিকারীর সাক্ষাৎকার—৮. ১২. ১৯৮৭., ২৬. ১. ১৯৮৮.।

২২. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৩৪-৩৭ ; সুরেশ দাশগুপ্তের আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিচারণ (অপ্রকাশিত), ১৯৭৮, পৃ ৭ (১৯৭৮ সালে লিখিত অপ্রকাশিত ৪২ পৃষ্ঠা পাণ্ডুলিপির ৭ পৃষ্ঠা)।

২৩. তদেব, পৃ ২৪৪ ; সুরেশ দাশগুপ্তের আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিচারণ (অপ্রকাশিত), পৃ ২৫-২৬।

২৪. তদেব, পৃ ২৪৪-৪৫ ; শশাঙ্ক ঘোষ ও কুমার মিত্রের সাক্ষাৎকার ; সুরেশ দাশগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৬ (অপ্রকাশিত)। সুরেশ দাশগুপ্ত তাঁর স্মৃতিচারণে (পৃ ২৬) লিখেছেন, ঐ অধিবেশনে যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের নতুন নামকরণ করা হয়—'বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি"। কিন্তু 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা' বইতে অথবা শশাঙ্ক ঘোষ ও কুমার মিত্রের সাক্ষাৎকারে কোথাও এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায় নি।

২৫. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৪৪-৪৫।

২৬. তদেব, পৃ ২৪৫ ; শশাঙ্ক ঘোষ ও কুমার মিত্রের সাক্ষাৎকার।

২৭. সুরেশ দাশগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৬-২৭ (অপ্রকাশিত) ; লেখকের সঙ্গে সুরেশ দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার—১৪. ৮. ১৯৮৭., ১৯. ৮. ১৯৮৭।

২৮. তদেব, পৃ ২৯ (অপ্রকাশিত)।

২৯. তদেব, পৃ ২৯-৩২ (অপ্রকাশিত) ; সুরেশ দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার—১৪. ৮. ১৯৮৭., ১৯. ৮. ১৯৮৭।

৩০. রণেন সেন, বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০-'৪৮), বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, মে, ১৯৮১, পৃ ৩৮, ৪১ ; লেখকের সঙ্গে রণেন সেনের সাক্ষাৎকার—২৮. ৪. ১৯৮৬., ১৫. ১. ১৯৮৭.।

৩১. রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪৬-৪৭।

৩২. সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, প্রথম খণ্ড (১৯৩০-১৯৪১), গণশক্তি পত্রিকা দপ্তর, কলকাতা, মে, ১৯৮৫, পৃ ৬১-৬২ ; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪০-৪১, ৫৪-৫৫ ; সুরেশ দাশগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩২-৩৪ (অপ্রকাশিত) ; Chinmohan Sehanavis, op. cit., pp. 105-06 ; চিন্মোহন সেহানবীশ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ চৌদ্দ ; ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৩৭, ২৩৬, ২৪৬ ।

৩৩. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৪৬-৪৮ ; সুরেশ দাশগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৫-৩৬ (অপ্রকাশিত) ; শশাঙ্ক ঘোষ ও কুমার মিত্রের সাক্ষাৎকার ।

৩৪. সুরেশ দাশগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৫-৩৭ (অপ্রকাশিত) ; ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৪৪-৪৫, ৩৫৯ ।

৩৫. Intelligence Branch (I. B.), Government of Bengal—File Nos. 1201/ 33 (Year-1933) and 929 / 35 (Year-1935).

৩৬. সুরেশ দাশগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৯-৪১ (অপ্রকাশিত) ; সুরেশ দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার—১৪. ৮. ১৯৮৭., ১৯. ৮. ১৯৮৭ ।

৩৭. I.B., File No. 929 / 35.

৩৮. I.B. File Nos. 1201 / 33 and 929 / 35.

৩৯. I.B., File Nos. 1201 / 33 and 929 / 35.

৪০. I.B. File No. 929 / 35.

৪১. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৩৭ ।

৪২. তদেব, পৃ ১৩৪, ১৭৫, ২৭৫-৭৬, ৪১১ ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৭৯-৮০ ; Chinmohan Sehanavis, op. cit., p. 108 ; চিন্মোহন সেহানবীশ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ সতেরো ।

ইণ্ডিয়ান প্রোলেটারিয়ান রেভলিউশনারী পার্টি : জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ

তিরিশের দশকে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের গোড়ার যুগে কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতীত আরও বেশ কয়েকটি কমিউনিস্ট সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল। আত্মপ্রকাশের কয়েক বছরের মধ্যেই এই ধরনের অধিকাংশ সংগঠনেরই বিলোপ ঘটলেও স্বল্পকালীন স্বাধীন অস্তিত্বের পর্যায়েই এই সংগঠনগুলি বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং এই দলগুলির মাধ্যমেই ঘটেছিল জাতীয় বিপ্লববাদীদের কমিউনিস্ট মতাদর্শে উত্তরণ। বাংলাদেশের তিরিশের দশকের এই রকমেই একটি বামপন্থী সংগঠন হল ইণ্ডিয়ান প্রোলেটারিয়ান রেভলিউশনারী পার্টি (আই. পি. আর. পি.)। এই দলটি "গণনায়ক" পার্টি নামেও পরিচিত ছিল। বিস্মৃতপ্রায় আই. পি. আর. পি.-এর উল্লেখ পাওয়া যায় বাংলার তথা ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম দুই পথিকৃৎ সরোজ মুখোপাধ্যায়ের বইতে[১] এবং রণেন সেনের বইতে[২] ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রবন্ধে[৩]। প্রখ্যাত অনুশীলন বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট ধরণী গোস্বামীর স্মৃতিচারণেও আই. পি. আর. পি.-এর উল্লেখ আছে।[৪] কিন্তু এই বিবরণগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ এবং কিছু ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ। অবশ্যই ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বা তদধিক বছরের পর স্মৃতিচারণের ক্ষেত্রে এই ধরনের তথ্যগত ত্রুটি খুবই স্বাভাবিক। অপরদিকে জাতীয় ও রাজ্য মহাফেজখানা থেকে প্রাপ্ত ও পুলিস সূত্র থেকে গৃহীত তথ্যগুলিও সর্বক্ষেত্রে ত্রুটিমুক্ত নয়। ফলে সুবোধ রায় সম্পাদিত বইতে[৫] এবং পঞ্চানন সাহা লিখিত প্রবন্ধে[৬] I.P.R.P.-এর যে বিবরণ আছে সেগুলিতেও তথ্যগত ত্রুটির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ অনুশীলন বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার তাঁর বইতে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় বিপ্লবী "সন্ত্রাসবাদ" থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে এসেছে I. P. R. P.-এর কথা।[৭] অত্যন্ত সুলিখিত এই আলোচনায় শ্রীযুক্ত মজুমদার I. P. R. P. প্রসঙ্গের সূত্রপাত করেছেন এই কথাটি লিখে—"Dr. Bhupendra Nath Dutta was the founder of this party."[৮] সুবোধ রায় সম্পাদিত বইতে প্রাপ্ত ব্রিটিশ সরকারী সূত্রের সরবরাহ করা তথ্যের ভিত্তিতেই তিনি এই কথা লিখেছেন (তাঁর সূত্রনির্দেশেই এটার উল্লেখ আছে), কিন্তু তথ্যগত দিক থেকে এই কথা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। আমি এই প্রবন্ধে পরে এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি। প্রাগুক্ত সবকটি বই ও প্রবন্ধেই ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান সংকলিত আছে, কিন্তু এককভাবে কোনটিতেই আই. পি. আর. পি.-এর সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নেই। এই সবকটি বই ও প্রবন্ধ থেকেই তথ্য সঞ্চয়ন করে এবং এছাড়াও আই. পি. আর. পি.-এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে ও তাঁদের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ও এমনকি অপ্রকাশিত লেখা থেকেও তথ্য সংগ্রহ

করে, আই. পি. আর. পি.-এর তৎকালীন মুখপাত্র "গণনায়ক" পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং জাতীয় মহাফেজখানা থেকে ও বঙ্গীয় পুলিস সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত এই নিবন্ধে আমি ইণ্ডিয়ান প্রোলেটারিয়ান রেভলিউশনারী পার্টির এক সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

পূর্বকথা

১৯৩০ সাল ছিল প্রকৃত অর্থেই ঘটনাবহুল। ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ থেকে গান্ধীর ডাণ্ডি অভিযান শুরুর মধ্যে দিয়ে দেশব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে তাঁর দলের বিপ্লবী যুবকেরা চট্টগ্রাম শহরের দুইটি অস্ত্রাগার দখল করেন এবং চট্টগ্রামকে "স্বাধীন" ঘোষণা করেন। শুরু হয় ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের গ্রেফ্‌তার। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম চার দিন (১-৪ এপ্রিল) কলকাতায় গাড়োয়ান ধর্মঘট হয়। ধর্মঘটীরা কলকাতার রাস্তায় তাঁদের গরু-মোষের গাড়ি দিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ঐ বছরেরই ৭ জুলাই থেকে শুরু হয় ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহ। ইয়ং কমরেড্‌স লীগের সদস্যরা এই বিদ্রোহে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩০ সালেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির "অস্থায়ী কলকাতা কমিটি" গঠন করা হয়। এর আগেই ১৯২৯ সালের ২০ মার্চ ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট-অ-কমিউনিস্ট নির্বিশেষে সারা ভারতে জুড়ে ৩২ জনকে (প্রথমে ৩১ জনকে এবং পরে আরও ১ জনকে) গ্রেফ্‌তার করে তাঁদের বিরুদ্ধে **"মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা"** শুরু করে। শিশু কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সংগঠনকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার উদ্দেশ্যে এই ধরপাকড় ও **"মীরাট মামলা"** শুরু করা হলেও এই সূত্রেই কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকে। ১৯২৭ থেকে ১৯৩০ সাল অবধি অনুষ্ঠিত বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। শুরু হয় বাংলার বিভিন্ন জাতীয় বিপ্লবী দলের তরুণ সদস্যদের আত্মানুসন্ধান।[১]

"শিল্প সমবায়", "স্বদেশী-বাজার" পত্রিকা ও "চন্দননগর যুব সমিতি"

হুগলী জেলা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে ১৯২৮ সাল থেকেই। এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র, ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগর। ১৯২৭ সালে বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের পরিকল্পনা অনুযায়ী চন্দননগরের দুর্গাদাস শেঠের উদ্যোগে চন্দননগরে "শিল্প সমবায়" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন কালীচরণ ঘোষ, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, বলাই চক্রবর্তী, জ্যোতিষ সিংহ প্রমুখ। ১৯২৮ সালে দুর্গাদাস শেঠের উদ্যোগে ও সম্পাদনায় এবং তাঁরই অর্থে কলকাতা থেকে "স্বদেশী-বাজার" নামে

একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরে পত্রিকাটি মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। দুই বছরেরও কিছু বেশী সময় এই পত্রিকা চলে। এই পত্রিকার মাধ্যমে জাতীয় বিপ্লবী ভাবধারার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাও স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। জাতীয় বিপ্লববাদী পুরানো ধারার পরিবর্তে যুগোপযোগী নতুন ধারা অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক ধারা অনুসন্ধানের জন্যই একটা অনুশীলন কেন্দ্র হিসাবে "স্বদেশী বাজার" পত্রিকার কলকাতার কার্যালয়টি কাজ করতে থাকে। ১৯২৮ সালেই দুর্গাদাস শেঠের একান্ত অনুগামী কালীচরণ ঘোষকে সম্পাদক ও সিদ্ধেশ্বর মল্লিককে সভাপতি করে "চন্দননগর যুব সমিতি" গড়ে ওঠে। এতে যোগ দেন ডাঃ হীরেন চ্যাটার্জী, তুষার চট্টোপাধ্যায়, দয়াল কুমার, সন্তোষ ভড়, সন্তোষ নন্দী, আনন্দ পাল, ভবানী মুখার্জী, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, বলাই চক্রবর্তী, জ্যোতিষ সিংহ, মহীতোষ নন্দী প্রমুখ। এই যুব সমিতির পক্ষ থেকে লেনিনের "ইসক্রা" নামের অনুকরণে "স্ফুলিঙ্গ" নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পরই ইংরাজ সরকারের চাপে পড়ে ফরাসী সরকার পত্রিকাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। তখন পার্শ্ববর্তী ভদ্রেশ্বর থেকে কিছুদিন এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[10] চন্দননগর যুব সমিতির নেতৃত্বে ১৯২৮ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে চন্দননগরে কয়েকটি আন্দোলন হয়। হুগলী জেলায় সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রসারের ক্ষেত্রে এই যুব সমিতির একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

হুগলী জেলার জাতীয় বিপ্লববাদীদের নতুন পথের সন্ধান

১৯৩০ সালে হুগলি জেলায় জাতীয় বিপ্লববাদীদের চারটি স্বতন্ত্র গ্রুপ ছিল। প্রথমটি ছিল বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরপাড়া গ্রুপ। এই গ্রুপের তৎকালীন নেতা ছিলেন বরেন চট্টোপাধ্যায় (অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভাই), সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় (অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে), ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মৃতীশ (মাণিক) বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী প্রমুখ। দ্বিতীয়টি ছিল বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর শ্রীরামপুর গ্রুপ। তৎকালীন নেতা ছিলেন পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, নিরাপদ মুখার্জী, মনোরঞ্জন হাজরা, প্রমথ দত্ত প্রমুখ। প্রকৃতপক্ষে পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী-নিরাপদ মুখার্জীর গ্রুপের সঙ্গে মনোরঞ্জন হাজরা-প্রমথ দত্তের গ্রুপটি মিলিত হয়ে শ্রীরামপুর গ্রুপ তৈরি হয়। তৃতীয়টি ছিল বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের চন্দননগর গ্রুপ। তৎকালীন নেতা ছিলেন কালীচরণ ঘোষ, তিনকড়ি মুখার্জী, সন্তোষ ভড় প্রমুখ। চতুর্থটি ছিল বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের ও বিপ্লবী ভূপতি মজুমদারের হুগলী গ্রুপ। তৎকালীন নেতা ছিলেন *বিজয় মোদক, হামিদুল হক, সিরাজুল হক, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন* ঘোষ প্রমুখ। এই চারটি গ্রুপই ছিল বিপ্লবী যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত এবং এই গ্রুপ-গুলির সদস্যরা ছিলেন যুগান্তর দলেরই সদস্য, যদিও উত্তরপাড়া গ্রুপের সঙ্গে অনুশীলন দলেরও কিছুটা যোগাযোগ ছিল। চন্দননগর গ্রুপটি কাজ করত ফরাসী ভারতে, আর

বাকী তিনটি গ্রুপ কাজ করত ব্রিটিশ ভারতে। সবকটি গ্রুপই আলাদা অস্তিত্ব বজায় রাখলেও কংগ্রেসের মধ্যে একসঙ্গেই কাজ করত, যদিও কংগ্রেস রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বিরোধের ফলে তাঁদের সমর্থনের প্রশ্নে এই বিপ্লবী গ্রুপ-গুলি বিভক্ত ছিল। কংগ্রেস রাজনীতিতে শ্রীরামপুর গ্রুপ ও চন্দননগর গ্রুপ ছিল সুভাষচন্দ্র বসুর সমর্থক, আর অপরদিকে উত্তরপাড়া গ্রুপ ছিল যতীন সেনগুপ্তের সমর্থক। হুগলী গ্রুপ এই সমর্থনের প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত ছিল।[১১]

কিন্তু জাতীয় বিপ্লববাদীদের পুরানো "সন্ত্রাসবাদী" কর্মপদ্ধতি এই চারটি গ্রুপেরই তরুণ সদস্যদের কাছে তার আকর্ষণ হারাচ্ছিল—এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তাঁরা ক্রমশই সজাগ হয়ে উঠছিলেন। অপরদিকে কংগ্রেস রাজনীতির নিষ্ফল অন্তর্দ্বন্দ্বও তাঁদের আর আকর্ষণ করছিল না। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ক্রমশই তাঁদের স্পর্শ করছিল। গণবিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই তাঁরা উপলব্ধি করছিলেন—উপলব্ধি করছিলেন শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামে অংশ-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা। এই সময়েই গান্ধীর ডাণ্ডি অভিযান শুরু হল ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ—সূত্রপাত ঘটল দেশব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ আইন অমান্য আন্দোলনের। হুগলী জেলার সবকটি বিপ্লবী গ্রুপের সদস্যরাই আগ্রহীভাবে গণ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই আন্দোলনকেই গণবিপ্লবের স্তরে উত্তরণের স্বপ্ন দেখলেন—যেমন, বিজয় মোদক।[১২]

হুগলী জেলার বহু যুব কর্মী আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি অভিযান করেন সেখানে লবণ-আইন অমান্য করতে এবং অন্যান্য কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে। তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০। চন্দননগর যুব সমিতির উদ্যোগে যথাক্রমে জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ, ব্রজেন পাল ও কালীচরণ ঘোষের নেতৃত্বে তিনটি স্বেচ্ছাসেবী দল লবণ সত্যাগ্রহে অংশ নিতে কাঁথি অভিমুখে যাত্রা করে। তুষার চট্টোপাধ্যায় প্রথমে চন্দননগরে সত্যাগ্রহ সংগঠন করেন।[১৩] পরে তিনি কামারপুকুরের নিকটবর্তী গোঘাট থানার অন্তর্গত আমুরে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে যান। বিজয় মোদক গেলেন আরামবাগে "ট্যাক্স-বন্ধ" আন্দোলন করতে। আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত বড়ডোঙ্গলে কংগ্রেস সম্মেলন থেকে আরামবাগে এই "ট্যাক্স-বন্ধ" আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আরামবাগের "ট্যাক্স-বন্ধ" আন্দোলনের উৎসাহী অংশগ্রণকারী বিজয় মোদক চাইলেন আন্দোলনের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করতে —"ট্যাক্স-বন্ধে"র সঙ্গে সঙ্গেই "খাজনা-বন্ধ" আন্দোলন শুরু করতে। হুগলী জেলার উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া, হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলের সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীরাই আরামবাগের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিজয় মোদক তাঁর পরিকল্পনায় এঁদের অনেকেই সমর্থন পেলেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রমাদ গুনলেন। গান্ধী নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস গান্ধীর পরামর্শে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জমিদারি ব্যবস্থার অঞ্চলে "খাজনা-বন্ধ" আন্দোলন অনুমোদন করল না—একমাত্র রায়তওয়ারি অঞ্চলেই

"খাজনা-বন্ধ" আন্দোলন অনুমোদন করা হল, বলা হল—দেশপ্রেমিক জমিদারের খাজনা চাষীদের দিতেই হবে, অন্যদের নাও দেওয়া যেতে পারে। এর মধ্যেই বড়ডোঙ্গলে এক কর্মীসভার শেষে বিজয় মোদক সহ আন্দোলনের ৭জন নেতা গ্রেফ্‌তার হয়ে গেছেন। ছাড়া পাওয়ার পর ১৯৩১ সালের গোড়ায় বিজয় মোদক আবার কারারুদ্ধ হন আরামবাগে এবং ১৯৩১ সালে গান্ধীর গোলটেবিল বৈঠকের আগে 'অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে মুক্তি পেয়ে আবার আরামবাগে আসেন।[১৪]

এর মধ্যেই ১৯৩১ সালের ৫ মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গান্ধী নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেস দেশের সর্বত্র আইন অমান্য আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে তার আপসকামী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আরও একবার দিল দেশের মানুষকে, আরও একবার হতাশ করল মুক্তি আন্দোলনে সামিল দেশবাসীকে।

বিজয় মোদক সহ অন্যান্য বিপ্লবী ও বামপন্থী কংগ্রেস কর্মীদের পরিকল্পনা ছিল "ট্যাক্স-বন্ধ" আন্দোলনকেই "খাজনা-বন্ধ" আন্দোলনের রূপ দিয়ে শেষপর্যন্ত গণ-অভ্যুত্থানের পথে নিয়ে যাওয়া হবে—কিন্তু শেষপর্যন্ত সে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হল না। আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯৩২ সালের ৪ জানুআরি গান্ধী কারারুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়) ১৯৩২ সালের গোড়ার দিকেই বিজয় মোদক প্রমুখ দ্বিতীয়বার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে আরামবাগে "খাজনা-বন্ধ" আন্দোলন শুরু করেন। এবারও কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে এই ধরনের আন্দোলন বন্ধ করার নির্দেশ আসে। বিজয় মোদক ও তাঁর সহযোদ্ধারা ১৯৩২ সালের প্রথম দিকেই আরামবাগ ছেড়ে চলে আসেন। দ্বিতীয়বারও এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় নি।[১৫]

ইণ্ডিয়ান প্রোলেটারিয়ান রেভলিউশনারী পার্টি গঠন

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হুগলী টাউন হলে অনুষ্ঠিত হুগলী জেলা কংগ্রেসের এক সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের অনুগামী কংগ্রেসের দুই বিবদমান দলের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। কিন্তু এই সংঘর্ষ হুগলী জেলার বিপ্লবী যুব-ছাত্রদের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনে। তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে, কংগ্রেসের অন্তর্দলীয় বিবাদ ও স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের জড়িত না করে, নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করে, নতুন চিন্তাধারার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ এক নতুন দল তাঁরা গড়ে তুলবেন।[১৬]

ফলে জাতীয় বিপ্লববাদী আন্দোলনের "সন্ত্রাসবাদী" পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা, কংগ্রেস নেতৃত্বের আপসকামী মনোভাব ও আন্দোলন বিমুখতা, কংগ্রেসের অন্তর্দলীয় সংঘর্ষ, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রসার, শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাব প্রভৃতি সব কিছুই সম্মিলিত হয়ে হুগলী জেলার চারটি বিপ্লবী গ্রুপেরই তরুণ সদস্যদের নিয়ে গেল নতুন চিন্তাধারার ভিত্তিতে নতুন একটি দল গঠনের দিকে। এই প্রয়াসে তাঁরা সঙ্গে পেলেন বিপ্লবী গ্রুপগুলির সদস্য নন, অথচ কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত ও কংগ্রেস সদস্য এমন তরুণ কর্মীদেরও।

১৯৩১ সালেই হুগলী জেলা কংগ্রেসের কোরোলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যাতে সব কটি বিপ্লবী গ্রুপের সদস্যরাই যোগ দিয়েছিলেন। এই কোরোলা কংগ্রেস সম্মেলনে হুগলী জেলা যুব সমিতি গঠিত হল। বিজয় মোদক তার সভাপতি হলেন আর সম্পাদক হলেন পঞ্চানন বসু (গুলে)। পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, নিরাপদ মুখার্জী, তুষার চট্টোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এই যুব সমিতির সদস্য হন। বিজয় মোদক, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীরা স্থির করেন যে, হুগলী জেলা যুব সমিতির এই প্রকাশ্য মঞ্চটিকে ব্যবহার করেই দল গড়ে তোলা হবে।[17]

সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৩১ সালেই পূর্বতন সমস্ত বিপ্লবী দল ও গ্রুপের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করে হুগলী জেলার বিপ্লবী যুবকেরা এক নতুন দল গড়ে তুললেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন বর্ধমান জেলার বিনয় চৌধুরী, যিনি বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর বিপ্লবী গ্রুপের সদস্য ছিলেন। বিনয় চৌধুরী বর্ধমান জেলায় বিপিন গাঙ্গুলীর বিপ্লবী গ্রুপ থেকে আরও বহু সদস্যকে নতুন দলে নিয়ে এলেন। নতুন দল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা মার্কসবাদকে তার মতাদর্শ হিসাবে ঘোষণা করল। বলা হল, এই দল পুরানো "সন্ত্রাসবাদী" পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে, "পূর্ণ স্বাধীনতা"র লক্ষ্যে ও "সমাজতান্ত্রিক সমাজ" গঠনের লক্ষ্যে শ্রমিক-কৃষককে সংগঠিত করবে এবং শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রচার করবে।[18]

বিজয় মোদক তাঁর সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেন যে, প্রথমে নবগঠিত দলটির নাম রাখা হয় সোস্যালিস্ট রেভলিউশনারী পার্টি। কিছু পরে ১৯৩১ সালেই বিজয় মোদক ও পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী আব্দুল হালিমের সঙ্গে কলকাতায় সাক্ষাৎ করলে, তিনি বলেন যে, "রাশিয়ায় সোস্যালিস্ট রেভলিউশনারী পার্টি'র বিশেষ বদনাম আছে; এই নাম কেন দিয়েছেন?" তখন বিজয় মোদক-পাঁচু ভাদুড়ীরা ফিরে এসে গোপন মিটিং করে দলের নাম পরিবর্তন করে রাখেন—ইণ্ডিয়ান প্রোলেটারিয়ান রেভলিউশনারী পার্টি।[19] কিন্তু মনোরঞ্জন হাজরা তাঁর সাক্ষাৎকারে আমাদের বলেন যে, নবগঠিত দলটির নাম প্রথম থেকেই ছিল ইণ্ডিয়ান প্রোলেটারিয়ান রেভলিউশনারী পার্টি—সোস্যালিস্ট রেভলিউশনারী পার্টি নাম কোনওদিনই ছিল না।[20] এই বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত হওয়া সম্ভবপর হয় নি, কারণ এই বিষয়ে তৎকালীন কোন লিখিত বিবরণ নাই। কিন্তু এই কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার ব্যতীত অপর কোথাও সোস্যালিস্ট রেভলিউশনারী পার্টি নামটির উল্লেখ পাই নি।

নবগঠিত ইণ্ডিয়ান প্রোলেটারিয়ান রেভলিউশনারী পার্টি'র (আই. পি. আর. পি.) প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় চন্দননগরে ১৯৩১ সালেই। আই. পি. আর. পি.-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছয় জন—বিজয় মোদক, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, নিরাপদ মুখার্জী, ফণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কালীচরণ ঘোষ ও বিনয় চৌধুরী।[21] এঁদের সঙ্গেই আই. পি. আর. পি. দলে যোগ দেন মনোরঞ্জন হাজরা, প্রমথ দত্ত, স্বতীশ (মাণিক) বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়, কৃপানাথ দত্ত, ভূপালদাস বসু, হেলারাম চট্টোপাধ্যায়

(বর্ধমান), আনন্দ পাল প্রমুখ। পরে আই. পি. আর. পি.-তে আসেন সুশীতল রায়চৌধুরী, দয়াল কুমার, ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, অপূর্ব মুখার্জী (কলকাতা), দেবব্রত মুখার্জী (হাওড়া), বীরেন ঘোষ, সিরাজুল হক, মহীতোষ নন্দী, হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ (বর্ধমান), জগন্নাথ সেন (বর্ধমান), বিপ্লদবরণ রায় (বর্ধমান), সন্তোষ ভড় প্রমুখ। বর্ধমান জেলার বিনয় চৌধুরীর মাধ্যমে আই. পি. আর. পি.-এর সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করতেন ঐ জেলায় হরেকৃষ্ণ কোঙার ও সরোজ মুখোপাধ্যায়, তবে হরেকৃষ্ণ কোঙারই আই. পি. আর. পি.-এর সঙ্গে অধিকতর যুক্ত ছিলেন।[২২]

১৯৩১ সালে আই. পি. আর. পি. প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার প্রথম সম্পাদক হলেন পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী। মেদিনীপুর জেলায় তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডি ও ডগলাসকে পর পর হত্যা করা হয়েছে। সেই মামলায় জড়িয়ে ১৯৩২ সালের ফেব্রুআরি মাসে পাঁচু-গোপাল ভাদুড়ী, কালীচরণ ঘোষ, নিরাপদ মুখার্জী প্রমুখকে গ্রেফ্‌তার করা হয়।[২৩] পাঁচু-গোপাল ভাদুড়ী গ্রেফ্‌তার হয়ে যাওয়ায় বিজয় মোদক আই. পি. আর. পি.-এর সম্পাদক হন। কিন্তু বিজয় মোদকের বিরুদ্ধে গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা থাকায় তিনি গোপনে সম্পাদক হিসাবে দলকে পরিচালনা করতে বাধ্য হন। প্রকাশ্যে সম্পাদক হিসাবে কাজ করতে থাকেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে "*The Statesman*" পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক ওয়াটসনকে হত্যা প্রচেষ্টার অজুহাতে বিজয় মোদক, সুশীতল রায়চৌধুরী, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখকে গ্রেফ্‌তার করা হয়।[২৪] বিজয় মোদক গ্রেফ্‌তার হয়ে যাওয়ায় ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আই. পি. আর. পি.-এর সম্পাদক হন। ১৯৩৩ সালের শেষদিকে (সম্ভবত ডিসেম্বরে) ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেফ্‌তার হয়ে যাওয়ায় আই. পি. আর. পি.-এর চতুর্থ ও শেষ সম্পাদক হন জগন্নাথ সেন।[২৫]

আই. পি. আর. পি.-এর সঙ্গে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বঙ্কিম মুখার্জীর প্রকৃত সম্পর্ক

জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত ফাইলে[২৬] ও বঙ্গীয় সরকারের পুলিস ফাইলে[২৭] সর্বত্র আই. পি. আর. পি.-কে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ও বঙ্কিম মুখার্জীর পার্টি হিসাবে উল্লেখ করা আছে। তাই সুবোধ রায় সম্পাদিত বইতে ও পঞ্চানন সাহা লিখিত প্রবন্ধে উল্লেখ দেখা যায়—"Dr. Bhupendra Nath Datta and Bankim Mukherjee are its leaders."[২৮] সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের লেখার উল্লেখ আগেই করেছি।[২৯] কিন্তু বিজয় মোদক, কালীচরণ ঘোষ, মনোরঞ্জন হাজরা, তুষার চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাল, কৃপানাথ দত্ত প্রমুখ যাঁরা আই. পি. আর. পি.-এর প্রতিষ্ঠা করেন এবং জন্মলগ্ন থেকেই এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁদের কারোর লেখাতেই এই তথ্যের উল্লেখ দেখতে পাই না যে, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ ও বঙ্কিম মুখার্জী এই দলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নেতা

ছিলেন। বিজয় মোদক, মনোরঞ্জন হাজরা ও আনন্দ পাল তাঁদের সাক্ষাৎকারে আমার কাছে ডঃ দত্ত ও বঙ্কিম মুখার্জীর সঙ্গে তাঁদের দলের প্রকৃত সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করেন। তৎকালীন কমিউনিস্ট আন্দোলনে মার্কসবাদে সুপণ্ডিত ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অবদান অপরিসীম। বহু যুবককে কমিউনিস্ট মতাদর্শে দীক্ষা দিয়ে ডঃ দত্তই কমিউনিস্ট পার্টির দিকে টেনে আনেন। বহু "সন্ত্রাসবাদী" বিপ্লবী যুবককে ডঃ দত্তই "সন্ত্রাসবাদী" পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ও নিষ্ফলতা সম্পর্কে অবগত করেন। আর বঙ্কিম মুখার্জী ছিলেন তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা। আই. পি. আর. পি.-এর সংগঠকদের উদ্যোগে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বঙ্কিম মুখার্জী হুগলী জেলার উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, হুগলী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে মার্কসবাদ ও শ্রমিক আন্দোলনের উপর ক্লাস নেন ও বক্তৃতা দেন। এছাড়াও আই. পি. আর. পি.-এর যে-কোনও সভাসমিতিতে তাঁদের আহ্বান জানানো হত; আই. পি. আর. পি.-এর বহু উদ্যোগের সঙ্গেও তাঁরা জড়িত ছিলেন। তাঁদের দু'জনের চিন্তাধারার সঙ্গে আই. পি. আর. পি.-এর চিন্তাধারার যথেষ্ট মিল ছিল। তাছাড়াও আই. পি. আর. পি.-এর মুখপত্র "গণনায়ক" পত্রিকাতেও তাঁরা নিয়মিত লিখতেন। এই সমস্ত কারণেই পুলিসের মধ্যে এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় যে, আই. পি. আর. পি. দলের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও প্রধান নেতা ছিলেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বঙ্কিম মুখার্জী।[৩০]

আই. পি. আর. পি. এবং "সাম্য" ও "গণনায়ক" পত্রিকা

১৯৩২ সালে আই. পি, আর. পি.-এর মুখপত্র হিসাবে "সাম্য" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। হাতে লেখা এই বাংলা পত্রিকাটি সাইক্লোস্টাইল করে প্রকাশ করা হত। পত্রিকাটি সাপ্তাহিক হিসাবে ঘোষিত হলেও যখনই প্রয়োজন হত তখনই কেবলমাত্র প্রকাশিত হত। পত্রিকাটিতে শ্রমিক-কৃষকের কথা লেখা হত আর থাকত "সন্ত্রাসবাদী" পদ্ধতির সমালোচনা ও তার বিরুদ্ধে বক্তব্য। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন বিজয় মোদককে গ্রেফ্‌তার করা হয়, তখন তাঁর কাছে ছিল "সাম্য" পত্রিকার বাণ্ডিল, যাতে ছিল "সন্ত্রাসবাদী" পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা। পত্রিকাটি পরে পাক্ষিক রূপ নেয়। ২/২, ওয়েলিংটন স্ট্রীট্, কলকাতায় তখন আই. পি. আর. পি.-এর একটি কেন্দ্র ছিল। সেখানে থাকতেন ননীগোপাল মুখার্জী ও মনোরঞ্জন হাজরা। কেন্দ্রটির বিপরীত দিকে বাজারের ভিতরে দোতলায় একটি ছোট ঘরে সাইক্লোস্টাইল মেশিন ছিল, সেখান থেকেই পত্রিকাটি মনোরঞ্জন হাজরা ও ননীগোপাল মুখার্জী সাইক্লো করে প্রকাশ করতেন।[৩১]

"সাম্য" পত্রিকাটি একটি গোপন ও নিষিদ্ধ পত্রিকা ছিল। ১৯৩৩ সালে "সাম্য" পত্রিকার পরিবর্তে আই. পি. আর. পি.-এর মুখপত্র হিসাবে "গণনায়ক" নামে একটি মুদ্রিত সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। এই পত্রিকাটি ছিল দলের প্রকাশ্য মুখপত্র। "গণনায়ক" পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি লেনিনের জন্মদিনে ১৯৩৩ সালের ২২

এপ্রিল দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি প্রকৃতপক্ষে সম্পাদনা ও পরিচালনা করতেন ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং পরবর্তী সংখ্যা থেকেই "গণনায়ক"-এর সম্পাদক হিসাবে ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়েরই নাম থাকত। পত্রিকা প্রকাশের কাজে প্রধান উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন হাজরা, কৃপানাথ দত্ত, ভূপালসাধন বসু, হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। "গণনায়ক" পত্রিকায় শ্রমিক-কৃষকের কথা ও গণবিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা লেখা হত এবং "সন্ত্রাসবাদী" পদ্ধতির সমালোচনা করা হত। পত্রিকাটিতে সরাসরি **"শ্রেণীসংগ্রাম জয়যুক্ত হোক্", "চাষী-মজুর শাসন প্রতিষ্ঠিত হউক্"** প্রভৃতি ডাক দেওয়া হত। পত্রিকাটিতে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত **"কৃষকের কথা"** শিরনামায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। নিয়মিত লেখা থাকত বঙ্কিম মুখার্জীর। ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় Karl Marx-এর লেখা *"Wage, Labour and Capital"* অনুবাদ করে "গণনায়ক"-এ প্রকাশ করেন। ভূপাল বসু অনূদিত *"Moscow Has A Plan"* এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৩২] সরোজ মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ তৎকালীন "কলকাতা কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি"-র নেতারাও "গণনায়ক" পত্রিকায় লিখতেন। "গণনায়ক" পত্রিকার ১৯৩৪ সালের ১৩ জানুআরি ও ১০ ফেব্রুআরি সংখ্যা দুটিতে বঙ্কিম মুখার্জী ও সোমনাথ লাহিড়ীর দুটি যৌথ লেখা প্রকাশিত হয়। সোমনাথ লাহিড়ীর একটি চিঠি প্রকাশিত হয় পত্রিকাটির ১০ মার্চ ১৯৩৪ সংখ্যায়। "গণনায়ক" পত্রিকার ১ মে ১৯৩৪ সংখ্যায় **"দেশজোড়া বিপ্লবের দিন ঘনিয়ে এসেছে! চাষী কী করবে?"** —এই শিরনামায় **"বিপ্লবী সঙ্ঘের লাল নিশানের তলে সারা দেশের চাষী তোমরা এক হয়ে দাঁড়াও"**—এই আহ্বান জানিয়ে এবং **"চাষী মজুর শাসন প্রতিষ্ঠিত হউক্"**—এই বক্তব্য রেখে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৩৩]

"গণনায়ক" পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি তৎকালীন বাংলা সরকারের চোখে ছিল রাজদ্রোহাত্মক এবং এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশের জন্য "গণনায়ক" সম্পাদক বাংলা সরকারের প্রেস অফিসার কর্তৃক সতর্কিত হন। জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত ফাইলে এবং বাংলা সরকারের পুলিস-ফাইলে প্রবন্ধগুলির নাম ইংরেজিতে থাকায় এবং মূল বাংলা প্রবন্ধগুলি না পাওয়ায় আমি ইংরেজি শিরনামাতেই প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করছি। (১) *"Suggestions about a new path"*—২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩। (২) *"India on the Path of Revolution"*—৪ ও ১১ নভেম্বর ১৯৩৩। (৩) *"The Form of Freedom"*—২ ডিসেম্বর ১৯৩৩। (৪) *"Lenin Day"*—২৭ জানুআরি ১৯৩৪। (৫) *The Present Programme of Workers"*—৩ ও ১০ ফেব্রুআরি ১৯৩৪। (৬) *"Terrorism & the Masses"*—৩ ও ১০ ফেব্রুআরি ১৯৩৪। (৭) *"To The Workers"*—৩ ও ১০ ফেব্রুআরি ১৯৩৪। (৮) *"Subhas Babu's Samyavadi Sangha"*—২৪ ফেব্রুআরি ১৯৩৪।[৩৪]

মহাফেজখানা সূত্রে ও পুলিস সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৩৪ সালের

এপ্রিল মাসে "গণনায়ক" পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।[৩৫] কিন্তু এই তথ্য সঠিক নয়, কারণ ১৯৩৪ সালের ১ মে প্রকাশিত "গণনায়ক" পত্রিকার উল্লেখ আগেই করেছি।[৩৬] সম্ভবত ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসের পর "গণনায়ক" পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।[৩৭]

আই. পি. আর. পি.-এর কার্যকলাপ

আই. পি. আর. পি. দলের মূল কর্মক্ষেত্র হুগলী জেলা হলেও বর্ধমান ও হাওড়া জেলাতেও আই. পি. আর. পি.-এর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। কলকাতাতেও ২/২, ওয়েলিংটন স্ট্রীটে আই. পি. আর. পি.-এর একটি কেন্দ্র ছিল। এছাড়াও ২৪ পরগণা, নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলাতেও এই দল সক্রিয় ছিল। নোয়াখালির বিখ্যাত কৃষক নেতা মুখলেশ্বর রহমানের সঙ্গেও আই. পি. আর. পি.-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শেষদিকে ১৯৩৪ সালে যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের শচীন মিত্রের সঙ্গেও আই. পি. আর. পি.-এর তরফ থেকে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন "কলকাতা কমিটি"-র সঙ্গেও আই. পি. আর. পি.-এর পারস্পরিক সমালোচনা-সহযোগিতার এক মিশ্র সম্পর্ক ছিল। "সন্ত্রাসবাদী" পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করলেও আই. পি. আর. পি. বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী "সন্ত্রাসবাদী" দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখত। উদ্দেশ্য ছিল "সন্ত্রাসবাদী" পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ও নিষ্ফলতা সম্পর্কে অবহিত করে এই দলগুলির তরুণ সদস্যদের আই. পি. আর. পি.-তে নিয়ে আসা। এই উদ্দেশ্যে এই দল বাংলার বাইরেও অন্যান্য রাজ্যে গোপন বিপ্লবী "সন্ত্রাসবাদী" দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত।[৩৮]

"সন্ত্রাসবাদী" পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা আই. পি. আর. পি.-এর পক্ষ থেকে করা হলেও এই দলের কোনও কোনও সদস্য "সন্ত্রাসবাদী" পদ্ধতিতে বিশ্বাস সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন নি। বিশেষ করে কোনও কোনও সদস্য মনে করতেন যে দল পরিচালনার জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ডাকাতি করা যেতে পারে। এই বিষয় নিয়ে আই. পি. আর. পি.-এর সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। দল হিসাবে আই. পি. আর. পি. এই সমস্ত কাজ অনুমোদন না করলেও কোনও কোনও সদস্য ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক ডাকাতির রাস্তা নেন। এই প্রসঙ্গে দুটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম ঘটনা হল-মানকুণ্ডুতে একটি ট্যাক্সি দখল করে সেটি নিয়ে শ্রীরামপুরে treasury ডাকাতি করতে যাবার সময় পথে ধরা পড়েন সাম্যবিহারী মুখার্জী ও দেবেন ভট্টাচার্য। বিচারে তাঁদের দশ বছর জেল হয়। এই দুজনই ছিলেন আই. পি. আর. পি.-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শোনা যায় যে, এই কাজে আই. পি. আর. পি-এর প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও অন্যতম প্রধান নেতা পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর অনুমোদন ছিল। দ্বিতীয় ঘটনা হল— বর্ধমান জেলার মেমারীতে বেগুট নামক স্থানে এক সশস্ত্র রাজনৈতিক ডাকাতি হয়। ঘটনাস্থলেই হরেকৃষ্ণ কোঙার ধরা পড়ে যান। বিচারে হরেকৃষ্ণ কোঙারের পাঁচ বছর

সশ্রম কারাদণ্ড হয় ও তিনি আন্দামানে প্রেরিত হন। হরেকৃষ্ণ কোঙার আই. পি. আর. পি.-এর সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই বেগুট রাজনৈতিক ডাকাতির সঙ্গে আই. পি. আর. পি.-র প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যতম প্রধান নেতা বিনয় চৌধুরীও জড়িত ছিলেন। বিনয় চৌধুরী আত্মগোপনকারী অবস্থায় বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বিপ্লবী যুবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে থাকেন এবং পরে হাওড়া জেলার চেঙ্গাইলের ল্যাডলো জুট মিলে শ্রমিকের কাজ নিয়ে সেখানে শ্রমিকদের সংগঠিত করতে থাকেন। এই সময় একদিকে আই. পি. আর. পি.-এর সঙ্গে এবং অপরদিকে সরোজ মুখার্জীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৯৩৩ সালের মে মাসে একদিন চেঙ্গাইল যাবার পথে পুলিস বরিশালের আত্মগোপনকারী বিপ্লবী নলিনী দাস সন্দেহে বিনয় চৌধুরীকে চলন্ত বাস থেকে গ্রেফ্‌তার করে। বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে তাঁর বিচার করে তাঁকে চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁর সেদিনের সঙ্গী মনোরঞ্জন হাজরা পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে নেমে পালিয়ে যান।[৩৯]

কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন দুটি রাজনৈতিক ডাকাতির ঘটনা দিয়ে বিচার করে আই. পি. আর. পি.-কে "আধা-সন্ত্রাসবাদী" সংগঠন আখ্যা দেওয়া সঠিক হবে না, যেটা পুলিসের তরফ থেকে করার চেষ্টা হয়েছিল। আই. পি. আর. পি.-কে বিচার করতে হবে তার তিন বছরের জীবনের সমগ্র কাজের মাপকাঠিতে। গণবিপ্লবের লক্ষ্য সামনে রেখে কৃষক-শ্রমিককে সংগঠিত করা ও তাঁদের আন্দোলনের পথে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল আই. পি. আর. পি-র প্রধান কাজ। তদুপরি আমাদের মনে রাখা দরকার, তৎকালীন সি. পি. আই.-এর মত দেশব্যাপী গণ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করে বাইরে থেকে সমগ্র আন্দোলনটিকেই "বুর্জোয়া সংস্কারবাদী" আখ্যা দিয়ে সমালোচনা করার নেতিবাচক ও ভ্রান্ত নীতি আই. পি. আর. পি. অবলম্বন করে নি। বরং আই. পি. আর. পি. নেতৃত্ব চেষ্টা করেছিলেন এই আন্দোলনে সম্পূর্ণভাবে যোগ দিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব দ্বারা নির্দিষ্ট আন্দোলনের সীমারেখা অতিক্রম করে অন্তত আংশিকভাবে ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে এই আন্দোলনকেই গণ-অভ্যুত্থানের রূপ দিতে। ব্যর্থতা এসেছিল শক্তির অভাবে, ভ্রান্ত নীতি অবলম্বনের ফলে নয়। একই সঙ্গে আই. পি. আর. পি.-র তৎকালীন নেতৃত্ব এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে শ্রমিক-কৃষকের পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি; সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টি থেকে পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলা যাবে না, এর জন্য কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন—মতপার্থক্য যদি থাকেই তবে তার সমাধান করতে হবে কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরে গিয়ে, তার থেকে পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে নয়। ফলে ১৯৩৩ সাল থেকেই পরিলক্ষিত হতে থাকে আই. পি. আর. পি. সদস্যদের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের প্রচেষ্টা।

শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে আই. পি. আর. পি-র কাজ

আই. পি. আর. পি-এর উদ্যোগে এই দলের কর্মী আনন্দ পালের নেতৃত্বে হুগলী জেলার

তৎকালীন সদর মহকুমায় সুগন্ধ্যা ও আমনানে কৃষক সমিতি গঠিত হয়। আই. পি. আর. পি-এর স্বতীশ (মাণিক) বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন হাজরা ও প্রমথ দত্তের নেতৃত্বে হুগলী জেলার রাজ্যধরপুর, পিয়ারপুর ও মাথলা অঞ্চলে কৃষক সমিতি গড়ে ওঠে। আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে হুগলী জেলার সমগ্র আরামবাগ মহকুমায় ইউনিয়ন বোর্ডের "ট্যাক্স-বন্ধ" আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্বারভাবে "খাজনা-বন্ধ" আন্দোলনও শুরু হয়। ১৯৩২ সালের গোড়ার দিকেই এই "খাজনা-বন্ধ" আন্দোলন শুরু করার ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন আই. পি. আর. পি.-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও অন্যতম প্রধান নেতা বিজয় মোদক। আই. পি. আর. পি-এর সদস্যরা এই "খাজনা-বন্ধ" আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৩২ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে চন্দননগরের আনন্দ পাল, শ্রীরামপুর-চাতরার প্রমথ দত্ত, বর্ধমানের হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, আরামবাগের মনোরঞ্জন রায়, জনাই-এর নিরাপদ মুখার্জী ও বালীর সুনীল চ্যাটার্জী—এই ছয় জন আই. পি. আর. পি-এর নির্দেশে আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার অন্তর্গত পশ্চিম অমরপুর গ্রামে (কামারপুকুর গ্রামের সংলগ্ন) হরিচরণ কাইতির বাড়িতে একটি ঘাঁটি করে ঐ অঞ্চলে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের একটি প্রচেষ্টা চালান। পরিকল্পনার মধ্যে ছিল—থানা আক্রমণ, অস্ত্রশস্ত্র লুণ্ঠন এবং গেরিলা যুদ্ধ করা। হেলারাম চট্টোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা ছিল বর্ধমানের দামোদর তীরের সেহারাবাজার থেকে উচানল হয়ে হুগলীর গোঘাট, আরামবাগ থেকে মেদিনীপুরের ঘাটাল অবধি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কৃষক অভ্যুত্থান। এই পরিকল্পনাটি ছিল তারই অংশ। ছয় মাস চেষ্টার পর পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়। ১৯৩৩ সালের ১৮ ও ১৯ মার্চ নিখিল বঙ্গ কৃষক সম্মিলনীর এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় মেদিনীপুর জেলার ঘাটালে। এই সম্মেলনের সংগঠকদের মধ্যে মনোরঞ্জন হাজরা প্রমুখ আই. পি. আর. পি-এর সদস্যরা ছিলেন। এই সম্মেলন থেকে যে কর্মসমিতি নির্বাচিত হয়, তার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন আই. পি. আর. পি.-এর জগন্নাথ সেন এবং অন্যতম সদস্য ছিলেন ঐ দলের হেলারাম চট্টোপাধ্যায়। ১৯৩৩ সালের ৪ জুন বর্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ঐ জেলার হাটগোবিন্দপুরে। সভাপতিত্ব করেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯৩৩ সালের ১১ জুন হুগলী জেলা সদর-মহকুমার কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঐ জেলার কাশশেওড়া গ্রামে। নির্বাচিত সভাপতি স্থানীয় কৃষক উমাকান্ত দাস অসুস্থ থাকায় সভাপতিত্ব করেন তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। উভয় সম্মেলনই সংগঠনের ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগ গ্রহণ করেন আই. পি. আর. পি.-এর সদস্যবৃন্দ।[৪০]

কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনেও আই. পি. আর. পি.-এর সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। আই. পি. আর. পি.-এর সদস্য কলকাতায় ডক-শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়ন সংগঠনের কাজ করতেন। আই. পি. আর. পি.-এর সদস্য হরিপদ চৌধুরী কলকাতায় ঝাড়ুদারদের মধ্যে ইউনিয়ন সংগঠনের কাজ করতেন।[৪১] ১৯৩২ সালে গোন্দলপাড়া চটকল শ্রমিকদের নিয়ে চটকল শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হল।[৪২] এই

শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আই. আর. পি.-এর সদস্যদের ভূমিকা ছিল। ১৯৩৩-৩৪—এই দুই বছর ধরে আই. পি. আর. পি.-এর সদস্যরা কমিউনিস্ট পার্টি ও তার প্রকাশ্য সংগঠন ওয়ার্কার্স্ পার্টি অফ ইণ্ডিয়ার সদস্যদের সঙ্গে একযোগে হুগলী জেলার চন্দননগর, রিষড়া প্রভৃতি স্থানের চটকল শ্রমিকদের, হাওড়ার গ্যাঞ্জেস্ জুট মিলের শ্রমিকদের, গার্ডেনরীচের ক্লাইভ জুট মিলের শ্রমিকদের, কলকাতার ঝাড়ুদারদের, বেলেঘাটার হাড়কলের শ্রমিকদের, আলমবাজারের উইম্কো দিয়াশলাই কারখানার শ্রমিকদের, টিটাগড় ও রানিগঞ্জের কাগজকলের শ্রমিকদের এবং অন্যান্য আরও কলকারখানার শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে লিপ্ত থাকেন। গ্যাঞ্জেস জুট মিলের ও ক্লাইভ জুট মিলের ধর্মঘটে, বেলেঘাটার হাড়কলে ধর্মঘটে, উইম্কো দিয়াশলাই কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘটে, কলকাতার ঝাড়ুদারদের ধর্মঘটে এবং রানিগঞ্জের ও টিটাগড়ের কাগজকলের শ্রমিকদের ধর্মঘটে আই. পি. আর. পি.-এর সদস্যদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই দলের ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় বেলেঘাটার হাড়কল শ্রমিক ধর্মঘটে (১৯৩৪ সালের ১৮ এপ্রিল থেকে শুরু হয়) এবং আলমবাজারের উইম্কো দিয়াশলাই কারখানার শ্রমিক ধর্মঘটে (১৯৩৪ সালের ১ ফেব্রুআরি থেকে শুরু হয়) অন্যতম অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণকারী ছিলেন।[৪৩]

আই. পি. আর. পি.-এর বিলোপ এবং এই দলের সদস্যদের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান

১৯৩৩ সাল থেকেই আই. পি. আর. পি. দলের সদস্যরা যাঁরা তখনও কারারুদ্ধ হন নি, তাঁদের সংগঠনের পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে ৪১, জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটে বঙ্কিম মুখার্জীর মধ্যস্থতায় কমিউনিস্ট পার্টির আব্দুল হালিমের সঙ্গে আই. পি. আর. পি. দলের মনোরঞ্জন হাজরা ও স্বতীশ ব্যানার্জীর একটি গোপন মিটিং হয়। উক্ত মিটিং-এ হালিমের কথামুযায়ী স্থির হয় যে, আই. পি. আর. পি. দলের সদস্যরা প্রত্যেকে সি. পি. আই.-এর সদস্যপদের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করবেন, তারপর কাজের ভিত্তিতে তাঁদের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ দেওয়া হবে। ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীরামপুরের চাতরায় এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আই. পি. আর. পি.-এর একটি গোপন মিটিং ডাকা হয়। সেই মিটিং-এ দলের মধ্যে মতভেদ তীব্র হয়ে ওঠে। সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়, হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়, ভূপাল বসু প্রমুখ সি. পি. আই.-তে তখনই যোগ দিতে রাজী হলেন না। তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা চলতে লাগল। এর মধ্যেই ১৯৩৩ সালের শেষের দিকেই, ডিসেম্বর মাসে, মনোরঞ্জন হাজরা, তুষার চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ দত্ত, স্বতীশ ব্যানার্জী ও আনন্দ পাল সি. পি. আই.-এর সদস্যপদের জন্য আবেদন করেন। ১৯৩৪ সালের মে মাসে উত্তরপাড়ার সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে অনুষ্ঠিত আই. পি. আর. পি. দলের শেষ মিটিং-এ মতবিরোধের কোনও সমাধান হল না। সত্যব্রত

চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সি. পি. আই.-তে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। এই মিটিং-এর পর আই. পি. আর. পি. নিষ্ক্রিয় ও প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।[৪৪]

১৯৩৪ সালেই আনন্দ পালকে সম্পাদক করে কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রথম হুগলী জেলা সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়। চন্দননগরেই হয় জেলা কেন্দ্র। আনন্দ পাল (সম্পাদক), স্মৃতীশ (মাণিক) বন্দ্যোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন হাজরা, প্রমথ দত্ত, মনোরঞ্জন রায় (আরামবাগ) প্রমুখ এই জেলা সংগঠনী কমিটির সদস্য হন। মোট ১৭ জন এই সময় পার্টি সভ্য হন। বিজয় মোদক, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, কালীচরণ ঘোষ প্রমুখ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্য হন।[৪৫]

১৯৩৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মনোরঞ্জন হাজরাকে গ্রেফ্‌তার করা হয়। তাঁর পরে আই. পি. আর. পি.-এর অবশিষ্ট সকল সদস্যকেই, যাঁরা সি. পি. আই.-তে যোগ দিয়েছিলেন ও দেন নি, গ্রেফ্‌তার করা হয়। আই. পি. আর. পি.—এই অধ্যায়টির পরিসমাপ্তি ঘটে।[৪৬]

১৯৩৪ সালের ২৩ জুলাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'কে সারা ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।[৪৭] কিন্তু শুধু এতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সন্তুষ্ট থাকল না। ১৯৩৫ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন বাংলা সরকার একটি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ১৩টি রাজনৈতিক ও শ্রমিক সংগঠনকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করল। নিষিদ্ধ সংগঠনগুলির মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি'র "কলকাতা কমিটি" ও ইণ্ডিয়ান প্রোলেটারিয়ান রেভলিউশনারী পার্টি' ছিল।[৪৮] কিন্তু এ যেন হল "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা"। কারণ ১৯৩৫ সালের ৭ মার্চ নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার বেশ আগেই ১৯৩৪ সালেই ইণ্ডিয়ান প্রোলেটারিয়ান রেভলিউশনারী পার্টি' বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

সূত্রনির্দেশ :

১. সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' ও আমরা, প্রথম খণ্ড (১৯৩০-১৯৪১), গণশক্তি পত্রিকা দপ্তর, কলকাতা, মে, ১৯৮৫, পৃ ৪৯, ৬২-৬৪, ৭১-৭২।

২. রণেন সেন, বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি' গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০'-৪৮), বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, মে, ১৯৮১, পৃ ৬৭।

৩. Ranen Sen, 'Communist Movement in Bengal in the Early Thirties', *Marxist Miscellany*, No 6, January, 1975, New Delhi, p. 7; রণেন সেন, 'বাঙলায় ত্রিশ দশকের প্রথমার্ধের কমিউনিস্ট আন্দোলন,' কমিউনিস্ট, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র অর্ধশতক পূর্তি উপলক্ষে-

সি. পি. আই. দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ ১৬৬।

৪. ধরণী গোস্বামী, 'ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ত্রিশের দশকের এক অধ্যায়,' (দ্বিতীয় পর্ব), পরিচয়, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৫, অগ্রহায়ণ, ১৩৮০ বাংলা সন (বা. স.), ডিসেম্বর, ১৯৭৩, কলকাতা, পৃ ৫০৪।

৫. Subodh Roy (ed), *Communism in India : Unpublished Documents*, (Vol. 1), (1925-1934), National Book Agency, Calcutta, 1980, pp. 395-399.

৬. Panchanan Saha, 'The Communist Movement in India : The Formative Period,' *Problems of National Liberation*, Vol. 1V, No. 1, December. 1980, Calcutta, pp. 37-41.

৭. Satyendra Narayan Mazumdar, *In Search of A Revolutionary Ideology and A Revolutionary Programme : A Study in the Transition from National Revolutionary Terrorism to Communism*, People's Publishing House, New Delhi, December, 1979, pp. 208-212.

৮. Ibid., p. 208.

৯. সাধারণভাবে সেই যুগের জাতীয় বিপ্লবীদের বিপ্লবী "সন্ত্রাসবাদী" বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তৎকালীন বিপ্লবীদের হেয় করার উদ্দেশ্যেই "সন্ত্রাসবাদী" শব্দটি ব্যবহার করেছিল। নিঃসন্দেহে এই বিপ্লবীদের কর্মপদ্ধতি ছিল "সন্ত্রাসবাদী", যে পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য এবং যে সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করেই তাঁদের অনেকেরই কমিউনিজমে উত্তরণ। কিন্তু যেহেতু শুধুমাত্র "সন্ত্রাসবাদী" শব্দটি ব্যবহার করে তৎকালীন বিপ্লবী আন্দোলনের পূর্ণ চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলা সম্ভবপর নয়, সেহেতু আমি তাঁদের সম্বন্ধে "জাতীয় বিপ্লবী" কথাটি ব্যবহার করছি।

১০. তুষার চট্টোপাধ্যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে হুগলী জেলা, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৮৩, পৃ ৭৬-৭৭, ৮২; আনন্দ পালের ডায়েরী থেকে—হুগলী জেলায় বিপ্লবী আন্দোলন ও অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার কথা, সঙ্কলন ও সম্পাদনা—মণীন্দ্রনাথ কুণ্ডু ও সুধীরকুমার দত্ত, প্রকাশক—সুনীলকুমার ঘোষ, চন্দননগর, ১৯৮২, পৃ ২-৪; কালীচরণ ঘোষ, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে চন্দননগরের ভূমিকা,' প্রগতি, সংকলন-সংখ্যা, শারদীয়; ১৩৯০ বা. স., ১৯৮৩, চন্দননগর, পৃ ৪-৫; তুষার চট্টোপাধ্যায়, 'চন্দননগর যুব সমিতির কথা,' প্রগতি, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৫-২৮; কমল চট্টোপাধ্যায়, 'চন্দননগর: কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম পর্যায়,' দেশহিতৈষী, শারদ সংখ্যা, ১৩৮৮ বা. স., ১৯৮১,

কলকাতা, পৃ ১২০-২১ ; লেখকের সঙ্গে আনন্দ পালের সাক্ষাৎকার—১৯. ১০. ১৯৮৬, ২২. ১০. ১৯৮৬ ; লেখকের সঙ্গে সন্তোষ নন্দীর সাক্ষাৎকার—১৯. ১০. ১৯৮৬ ; লেখকের সঙ্গে কমল চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার—১৩. ১২. ১৯৮৬।

১১. লেখকের সঙ্গে বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার—১৮. ১০. ১৯৮৬, ৬. ১২. ১৯৮৬, ১২. ৮. ১৯৮৯ ; লেখকের সঙ্গে মনোরঞ্জন হাজরার সাক্ষাৎকার—১৯. ১১. ১৯৮৬, ১৩. ৮. ১৯৮৯ ।

১২. বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার—১৮. ১০. ১৯৮৬, ৬. ১২. ১৯৮৬, ১২. ৮. ১৯৮৯ ।

১৩. তুষার চট্টোপাধ্যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে হুগলী জেলা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৮৬-৮৭ ; কালীচরণ ঘোষ, পূর্বোল্লিখিত, প্রগতি, পৃ ৫ ; তুষার চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, প্রগতি, পৃ ২৫-২৮ ।

১৪. বিজয় মোদক, 'আমার দেখা অতুল্যদা', *Atulya Ghosh (August 28, 1904—April 18, 1986)—A Commemoration Volume*, Dr. B. C. Roy Memorial Committee, Calcutta, পৃষ্ঠায় ক্রমিক সংখ্যা অনুল্লিখিত ; বিজয় মোদক, 'হুগলী জেলার কৃষক আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়', নিম্ন-দামোদর বার্তা, শারদ সংখ্যা, ১৩৯৩ বা. স., ১৯৮৬, আরামবাগ, পৃ ৬৯ ; বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার—১৮. ১০. ১৯৮৬, ৬. ১২. ১৯৮৬, ১২. ৮. ১৯৮৯ ।

১৫. বিজয় মোদক, পূর্বোল্লিখিত, *Atulya Ghosh—A Commemoration Volume* ; বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার ।

১৬. মনোরঞ্জন হাজরা, 'ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামে উত্তরপাড়ার ভূমিকা', উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার—১২৫তম বর্ষ পূর্তি—স্মরণিকা, এপ্রিল, ১৯৮৪, উত্তরপাড়া, পৃ ৯৯ (আঞ্চলিক ইতিহাস পর্ব) ; মনোরঞ্জন হাজরার সাক্ষাৎকার—১৯. ১১. ১৯৮৬, ১৩. ৮. ১৯৮৯ ।

১৭. বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার ।

১৮. বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার—১৮. ১০. ১৯৮৬, ৬. ১২. ১৯৮৬, ১২. ৮. ১৯৮৯ ; মনোরঞ্জন হাজরার সাক্ষাৎকার—১৯. ১১. ১৯৮৬, ১৩. ৮. ১৯৮৯ ।

১৯. বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার—১২. ৮. ১৯৮৯ ।

২০. মনোরঞ্জন হাজরার সাক্ষাৎকার—১৩. ৮. ১৯৮৯ ।

২১. বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার—১৮. ১০. ১৯৮৬, ৬. ১২. ১৯৮৬, ১২. ৮. ১৯৮৯ ; কালীচরণ ঘোষ, পূর্বোল্লিখিত, প্রগতি, পৃ ৬ ; কৃপানাথ দত্ত, "*I. P. R. P.*" এবং "গণনায়ক" পত্রিকা প্রসঙ্গে—একটি অপ্রকাশিত চিঠি। সাপ্তাহিক "বসুমতী"র ৭৩ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যায় (বৃহস্পতিবার, ১১ বৈশাখ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, ১৯৬৯), ১৭৮২ পৃষ্ঠায়, সাগর বিশ্বাস লিখিত "নির্বাচনের পরে" শিরোনামায় বিধানসভা সদস্য মনোরঞ্জন হাজরার একটি পরিচিতি প্রকাশিত হয়। সেই পরিচিতির কিছু অংশের প্রতিবাদস্বরূপ কৃপানাথ দত্ত ৩. ৫. ১৯৬৯. তারিখে

সাপ্তাহিক "বসুমতী"র সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে এই চিঠিটি লেখেন। চিঠিটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশের জন্য প্রেরণ না করায় অপ্রকাশিতই থেকে যায়। চিঠিটির বিষয়বস্তু ছিল "*I. P. R. P.*" এবং তার মুখপত্র "গণনায়ক" পত্রিকা।

২২. মনোরঞ্জন হাজরার সাক্ষাৎকার—১৯. ১১. ১৯৮৬, ১৩. ৮. ১৯৮৯; মনোরঞ্জন হাজরা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৯৯-১০০; তুষার চট্টোপাধ্যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে হুগলী জেলা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১১২; আনন্দ পালের সাক্ষাৎকার—১৯. ১০. ১৯৮৬, ২২. ১০. ১৯৮৬; ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র হুগলী জেলা কমিটির ত্রয়োদশ সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত, প্রয়াত সংগঠক ও শহীদ স্মরণে, ১৯৮৫, হুগলী জেলা কমিটি, সি. পি. আই. (এম)-এর সম্পাদক বিজয় মোদক কর্তৃক সম্পাদিত ও ঐ সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে সভাপতি শান্তিপ্রিয় দাসগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত, বিপ্লবী ফণীন্দ্র নগর, উত্তরপাড়া, ১৯৮৫, পৃষ্ঠার ক্রমিক সংখ্যা অনুল্লিখিত; (এই পুস্তিকায় আই. পি. আর. পি.-র সংগঠক হিসাবে ৩৫ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই ৩৫ জন ব্যতীতও আই. পি. আর. পি.-র সংগঠক হিসাবে আরও কয়েকজন ছিলেন, যাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম আমি উল্লেখ করেছি।); কৃপানাথ দত্ত, পূর্বোল্লিখিত—একটি অপ্রকাশিত চিঠি।

২৩. বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার—১৮. ১০. ১৯৮৬, ৬. ১২. ১৯৮৬, ১২. ৮. ১৯৮৯; কালীচরণ ঘোষ, পূর্বোল্লিখিত, প্রগতি, পৃ ৬।

২৪. বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার; কালীচরণ ঘোষ, প্রগতি, পৃ ৬।

২৫. বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার।

২৬. Home / Poll. / F. No. 7 / 20 / 1934 & K. W., Serial Nos. 1-4.

২৭. Intelligence Branch (I. B.), Government of Bengal—File No. 929 / 1935 (Year—1935); Intelligence Branch (I.B.) Government of Bengal—File No. 1201 / 1933 (Year—1933).

২৮. Subodh Roy (ed.), op. cit., p. 395; Panchanan Saha, op. cit., *Problems of National Liberation (hereafter P. N. L.)*, p. 37.

২৯. Satyendra Narayan Mazumdar, op. cit., p. 208.

৩০. বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার—১৮. ১০. ১৯৮৬, ৬. ১২. ১৯৮৬, ১২. ৮. ১৯৮৯; মনোরঞ্জন হাজরার সাক্ষাৎকার—১৯. ১১. ১৯৮৬, ১৩. ৮. ১৯৮৯; আনন্দ পালের সাক্ষাৎকার—১৯. ১০. ১৯৮৬, ২২. ১০. ১৯৮৬।

৩১. বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার; মনোরঞ্জন হাজরার সাক্ষাৎকার; কৃপানাথ দত্ত, পূর্বোল্লিখিত; Home / Poll. / F. No. 7 / 20 / 1934 & K. W., Serial Nos. 1-4; Subodh Roy (ed.), op. cit., p. 399; Panchanan Saha, op. cit., *P. N. L.*, p. 38.

৩২. বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার ; মনোরঞ্জন হাজরার সাক্ষাৎকার ; মনোরঞ্জন হাজরা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১০০ ; কৃপানাথ দত্ত, পূর্বোল্লিখিত ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৩৪ ; Home / Poll. / F. No. 7 / 20 / 1934 & K. W., Serial Nos. 1-4 ; Subodh Roy (ed.), op, cit.. p. 399 ; Panchanan Saha, op. cit., *P. N. L.*, p. 38 ; I. B., File No. 1201 / 1933 ; I. B., File No. 929 / 1935.

৩৩. সোমনাথ লাহিড়ী রচনাবলী, (প্রথম খণ্ড), (১৯৩১-১৯৪৫), মনীষা, কলকাতা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫, পৃ ১৫৮-১৬৩ ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৩৪, ২৫৯ ।

৩৪. Home / Poll. / F. No. 7 / 20 / 1934 & K. W., Serial Nos. 1-4 ; I.B., File No. 929 / 1935 ; Subodh Roy (ed.), op. cit., p. 399 ; Panchanan Saha, op. cit., *P. N. L.*, p. 38.

৩৫. Home / Poll. / F. No. 7 / 20 / 1934 ; I. B., File No. 929 / 1935; Roy (ed.), op. cit., p. 399 ; Saha, op. cit., *P. N. L.*, p. 38.

৩৬. সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৩৪ ।

৩৭. মনোরঞ্জন হাজরার সাক্ষাৎকার ; বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার ; কৃপানাথ দত্ত, পূর্বোল্লিখিত ।

৩৮. মনোরঞ্জন হাজরার সাক্ষাৎকার ; বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার ; কৃপানাথ দত্ত, পূর্বোল্লিখিত ।

৩৯. মনোরঞ্জন হাজরার সাক্ষাৎকার ; মনোরঞ্জন হাজরা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১০১ ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৬৫-৬৮ ।

৪০. "গণনায়ক", (সাপ্তাহিক), প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, শনিবার, ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০, ৩ জুন, ১৯৩৩ ; "গণনায়ক", (সাপ্তাহিক), প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা, শনিবার, ৩ আষাঢ়, ১৩৪০, ১৭ জুন, ১৯৩৩ ; আনন্দ পালের ডায়েরী থেকে, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৯-১১ ; আনন্দ পালের সাক্ষাৎকার ; বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার ; মনোরঞ্জন হাজরার সাক্ষাৎকার ; মনোরঞ্জন হাজরা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১০০ ; কমল চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১২১-১২৪ ।

৪১. বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার ।

৪২. কমল চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১২২ ।

৪৩. Home/ Poll. / F. No. 7 / 20 / 1934 ; I.B., File No. 929/1935 ; Roy (ed.), op. cit., pp. 395-397 ; Saha, op. cit., *P. N. L.*, pp. 38-40 ; মার্ক্স-পন্থী, আবদুল হালিম সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৪০ বা. স., ১৯৩৪, পৃ ১২২-১২৩ ; মার্ক্স-পন্থী, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪১ বা. স., মে-দিবস বিশেষ সংখ্যা, ১৯৩৪, পৃ ১৭২ ।

৪৪. মনোরঞ্জন হাজরার সাক্ষাৎকার ; মনোরঞ্জন হাজরা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১০০-১০১ ।

৪৫. আনন্দ পালের ডায়েরী থেকে, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৮ ; আনন্দ পালের সাক্ষাৎকার ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৭৮-১৭৯ ; কমল চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১২২ ।

৪৬. মনোরঞ্জন হাজরার সাক্ষাৎকার ; তুষার চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১১৭-১৮ ।

৪৭. I. B., File No. 929/1935 ; Panchanan Saha, op cit., *P. N. L.*, p. 46 ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৮৮ । সরোজ মুখোপাধ্যায় অবশ্য তারিখ ভুল করে ২৩ জুলাই-এর জায়গায় লিখেছেন ২৮ জুলাই ।

৪৮. Home/Poll. / F. No. 24/15 / 1935 ; I. B., File No. 929/1935 ; Panchanan Saha, op. cit., *P. N. L.*, p. 46.

সাম্যরাজ পার্টি : স্বরাজের বিকল্প পথসন্ধান

বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু বিশের দশকের শেষভাগে ও তিরিশের দশকের প্রথমভাগে কমিউনিস্ট আন্দোলন বিকাশের ক্ষেত্রে এবং কমিউনিজম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে সাম্যরাজ পার্টি'র ভূমিকা। স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্যেই প্রচলিত পথ ত্যাগ করে সাম্যরাজ পার্টি করেছিল এই বিকল্প পথের অন্বেষণ। সাম্যরাজ পার্টি-সংক্রান্ত ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত বিবরণ নিতান্তই অপ্রতুল। বাংলার তথা ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম দুই পথিকৃৎ সদ্যপ্রয়াত সরোজ মুখোপাধ্যায়ের বইতে[১] এবং রণেন সেনের বইতে[২] ও অন্য দুটি প্রবন্ধে[৩] সাম্যরাজ পার্টি'র উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তা নিতান্তই উল্লেখ, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। প্রখ্যাত অনুশীলন বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট ধরণী গোস্বামীর স্মৃতিচারণেও সাম্যরাজ পার্টি'র উল্লেখ আছে।[৪] David M. Laushey[৫] এবং Horace Williamson[৬]-এর লেখাতেও সাম্যরাজ পার্টি'র উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সরোজ মুখোপাধ্যায়, রণেন সেন, ধরণী গোস্বামী ও David Laushey-এর লেখায় সাম্যরাজ পার্টি'র উল্লেখ তিন থেকে পাচ লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। একমাত্র Horace Williamson-এর বইতে সাম্যরাজ পার্টি সংক্রান্ত ১৮ লাইনের আলোচনা আছে। তৎকালীন সংবাদপত্রেও সাম্যরাজ পার্টি'র উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় সাম্যরাজ পার্টি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ রচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী প্রাগুক্ত উৎসগুলি ব্যতীতও সংকলিত হয়েছে মূলতঃ বঙ্গীয় পুলিস-সূত্র, জাতীয় মহাফেজখানা এবং সাম্যরাজ পার্টি'র সদস্যসহ এই পার্টি সম্পর্কে অবহিত বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার থেকে। সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক তথ্য সংকলনের কাজে আমায় সর্বাধিক সাহায্য করেছেন অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারসূত্রে সংগৃহীত সাম্যরাজ পার্টি সংক্রান্ত তথ্য তিনি নির্দ্বিধায় আমার হাতে তুলে দিয়েছেন লেখার কাজে। এই অনাবিল সাহায্যের কোনও প্রতিদান সম্ভব নয়, কোনও আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশই এর জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারেনা।

সাম্যরাজ পার্টি'র জন্ম ও প্রাথমিক কার্যকলাপ

সাম্যরাজ পার্টি'র প্রকৃত প্রতিষ্ঠাকাল যথেষ্ট বিতর্কিত। এই সম্পর্কে কোনও প্রাথমিক দলিলের অভাবে এই বিতর্কের কোনও সুষ্ঠু সমাধানও সম্ভব নয়। কয়েকটি বইতে ছাপ মারা সাম্যরাজ পার্টি'র রাবার-স্ট্যাম্প অনুযায়ী এই পার্টি'র প্রতিষ্ঠাকাল ১৯১৯।[৭] কিন্তু অন্য কোনও সূত্রেই এই প্রতিষ্ঠাকাল সমর্থিত হয় নি। সাম্যরাজ পার্টি'র সদস্যরা এবং এই পার্টি সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিরা কেউই তাঁদের সাক্ষাৎকারে ১৯১৯-কে পার্টি-প্রতিষ্ঠার বছর বলেন নি। কোনও লিখিত বিবরণেই এবং বঙ্গীয় পুলিস সূত্রেও ১৯১৯ সালে সাম্যরাজ পার্টি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয় নি। তদুপরি ১৯১৯ সালে সাম্যরাজ পার্টি'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা ছিলেন নেহাতই বালক অথবা কিশোর। সুতরাং অন্য কোনও

বিশ্বাসযোগ্য সূত্রের অভাবে ১৯১৯-কে সাম্যরাজ পার্টি'র প্রতিষ্ঠাসন হিসাবে গণ্য করা সম্ভব নয়। অবশ্য এই রাবার-স্ট্যাম্প রহস্যের কোনও সমাধান হয় নি।

১৯২৫ অথবা ১৯২৬ সালে অঘোর সেন[৮] ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে আসেন। ঢাকায় তাঁর যোগাযোগ ছিল জাতীয় বিপ্লববাদী দল[৯] বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি. ভি.)-এর সঙ্গে। কলকাতায় এসে অঘোর সেন উঠলেন ১২, পাইকপাড়া রোডের একটি বাড়িতে। ঢাকায় অঘোর সেন জাতীয় বিপ্লববাদী আন্দোলনের ও "সন্ত্রাসবাদী" কর্মপদ্ধতির সীমাবদ্ধতা বুঝতে পেরেছিলেন। কলকাতায় এসে অঘোর সেন কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং গণ-আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। উপলব্ধি করেন শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার এবং শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীচেতনার ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা। বিশিষ্ট বন্ধু টালার হরিদাস গাঙ্গুলীর ভাই বাদল গাঙ্গুলীর[১০] ও টালার কুমুদনাথ (নাদু) দত্তের[১১] সঙ্গে অঘোর সেনের যোগাযোগ হয়। অঘোর সেনের মাধ্যমেই বাদল গাঙ্গুলীর ও কুমুদনাথ দত্তের কমিউনিজমে দীক্ষা। ১২, পাইকপাড়া রোডের বাড়িতে থাকতেন স্কুলছাত্র অতুলকৃষ্ণ রায়।[১২] অতুল রায়েরও কমিউনিজমে প্রথম পাঠ অঘোর সেনের কাছেই।[১৩]

১৯২৮ সালের গোড়া থেকেই অঘোর সেন, বাদল গাঙ্গুলী, কুমুদনাথ দত্তের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক কাজকর্ম শুরু হয়। ১৯২৮ সালেই তিনজনে একটি পার্টি গঠন করেন। পার্টির নামকরণ করা হয়—"সাম্যরাজ পার্টি"। সাম্যরাজ পার্টি'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা বাংলাদেশে নতুন পার্টি গঠনের পূর্বে স্বরাজ্য দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং স্বরাজ্য দলের র‍্যাডিকাল সদস্যরূপে পরিচিত ছিলেন। স্বরাজ্য দলের নামের অনুকরণেই তাঁরা নতুন পার্টি'র নামকরণ করলেন "সাম্যরাজ পার্টি"। মার্কসবাদকে মতাদর্শ, গণবিপ্লবকে পথ এবং স্বাধীনতা লাভ ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করেই সাম্যরাজ পার্টি'র আত্মপ্রকাশ। অঘোর সেন, বাদল গাঙ্গুলী, কুমুদনাথ দত্ত প্রমুখ সাম্যরাজ পার্টি'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা বিশ্বাস করতেন, গান্ধী পরিচালিত অহিংস অসহযোগ বা আইন-অমান্য আন্দোলন অথবা অপরদিকে বিপ্লবী "সন্ত্রাসবাদী" আন্দোলন, উভয়ের কোনওটিই স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃত পথ নয়, স্বাধীনতা লাভের বিকল্প পথের অনুসন্ধান প্রয়োজন—এই বিকল্প পথ হচ্ছে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের পথ, গণ-আন্দোলনের পথ, গণবিপ্লবের পথ।[১৪]

১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর সাম্যরাজ পার্টি'র প্রথম অফিস হয় ১২, পাইকপাড়া রোডে। ঐ বাড়িতেই অঘোর সেন ও অতুলকৃষ্ণ রায় থাকতেন। এছাড়াও কুমুদনাথ দত্তের ১৪, কালীকুমার ব্যানার্জী লেনের (টালা) বাড়িতেও পার্টির আলোচনা-সভা বসত।[১৫] এই দুটি বাড়ি ছাড়াও টালাতেই কুমুনাথ দত্তের বাড়ির পশ্চিমদিকে একটি খোলার চালের ঘরে পার্টি'র আলোচনা সভা বসত। ঘরটি ছিল অবাঙ্গালী শ্রমিক বস্তিতে। ঐ ঘরে বসার জায়গার নিতান্ত অভাব থাকায় অনেক সময় রাস্তায় দাঁড়িয়েই আলোচনা চলত।[১৬] একে একে সাম্যরাজ পার্টি'র সদস্যসংখ্যা বাড়তে থাকে।

অতুলকৃষ্ণ রায় ১৯২৮ সালেই সাম্যরাজ পার্টি'তে যোগ দেন। ১৯২৮ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে এই পার্টি'তে যোগ দেন যশোদা ভৌমিক, সুধীর দত্ত, ননী সেনগুপ্ত, সুব্রত মুখার্জী, সন্তোষ রায়, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, ধরণী সেন, ক্ষিতীশ ঘোষ প্রমুখ। সুধীর ঘোষ, সান্যাল (এঁর নাম জানা যায় নি), শঙ্কর ব্যানার্জী প্রমুখ হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোশিয়েশন (এইচ. এস. আর. এ.)-এর কয়েকজন সদস্যও এই সময়ের মধ্যে সাম্যরাজ পার্টি'তে যোগ দেন।[১৭] এই পর্যায়ে ১৯৩০ সাল অবধি এইচ. এস. আর. এ.-র সঙ্গে সাম্যরাজ পার্টি'র ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং ১৯৩০ সাল নাগাদ এইচ. এস. আর. এ.-র বেশ কয়েকজন সদস্য সাম্যরাজ পার্টিতে যোগ দেন।[১৮]

সরোজ মুখোপাধ্যায়, রণেন সেন, David Laushey প্রমুখ লিখেছেন, সাম্যরাজ পার্টি'র প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৩০ সালে।[১৯] প্রকৃত ঘটনা হল ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত সাম্যরাজ পার্টি' ১৯৩০ সালে আনুষ্ঠানিক রূপ নেয়। ঐ বছর শ্যামবাজারের ৩, ভবনাথ সেন স্ট্রীট্ (কলকাতা-৪)-এ একটি কাঠের দোতলা বাড়ির খুবই ছোট একটি ঘরে পার্টি'র সাইনবোর্ড লাগিয়ে পার্টি' অফিস খোলা হল। সাইনবোর্ডে পার্টি'র নাম লেখা ছিল—উপরে "সাম্যরাজ পার্টি", নীচে "কমিউনিস্ট পার্টি' অভ্ বেঙ্গল"। ১৯৩০ সাল থেকেই পার্টি'র পূর্ণাঙ্গ নামকরণ হল—"সাম্যরাজ পার্টি', কমিউনিস্ট পার্টি' অভ্ বেঙ্গল।"[২০] এই সময়েই ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ও বঙ্কিম মুখার্জীর সঙ্গে সাম্যরাজ পার্টি'র যোগাযোগ হয়। ডঃ দত্ত ও বঙ্কিম মুখার্জী ভবনাথ সেন স্ট্রীটের পার্টি' অফিসে আসতেন। অঘোর সেন ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে ভূপেন দত্তের ও বঙ্কিম মুখার্জীর মার্কসবাদ, শ্রমিক আন্দোলন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হত। তাঁরা সাম্যরাজ পার্টি'র সদস্যদের মার্কসবাদের ক্লাসও নিতেন।[২১]

১৯২৮ সালের ৩ ফেব্রুআরি বোম্বাইতে সাইমন কমিশন্-এর পদার্পণের দিন সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই দিন থেকে দেশব্যাপী সাইমন কমিশন্-বিরোধী বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়। কলকাতায় এই বিক্ষোভে সাম্যরাজ পার্টির সদস্যরা লাল পতাকা নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে কলকাতার পার্ক সার্কাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অধিবেশনেও সাম্যরাজ পার্টি'র সদস্যরা যোগ দিয়েছিলেন।[২২]

১৯৩০ সালে ও তার পরবর্তী সময়ে কলকাতায় ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সাম্যরাজ পার্টির কাজকর্ম

১৯৩০ সাল থেকেই অঘোর সেন, বাদল গাঙ্গুলী, কুমুদনাথ দত্ত প্রমুখ সাম্যরাজ পার্টি'র সদস্যরা শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে ও নেতৃত্ব দিতে থাকেন এবং শ্রমিকদের নিজস্ব অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে সংগঠিত করার জোরদার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। তিরিশের দশকের গোড়ায় সাম্যরাজ পার্টি'র নেতৃত্বে তিনটি শ্রমিক ইউনিয়ন ছিল।

প্রথমটির নাম ছিল কাশীপুর মিউনিসিপ্যালিটি স্ক্যাভেন্‌জার্স্‌ ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নটি ছিল কাশীপুর ও চিৎপুর অঞ্চলের মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদারদের ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন কালীপ্রসাদ চৌধুরী। দ্বিতীয় ইউনিয়নটির নাম ছিল কার্টার্স্‌ ইউনিয়ন। এটি ছিল গাড়োয়ানদের ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নটিরও সভাপতি ছিলেন কালীপ্রসাদ চৌধুরী। আর তৃতীয়টির নাম ছিল মোটর ট্রান্সপোর্ট্‌ ওয়ার্কার্স্‌ ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নটির সম্পাদক ছিলেন প্রতাপ সিং।[২৩] প্রতাপ সিং ছিলেন কলকাতার শিখদের কমিউনিস্ট সংগঠন বেঙ্গল কীর্তি-কিষাণ পার্টির সঙ্গে যুক্ত।[২৪] সাম্যরাজ পার্টির সঙ্গে বেঙ্গল কীর্তি-কিষাণ পার্টির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং মোটর ট্রান্সপোর্ট্‌ ওয়ার্কার্স্‌ ইউনিয়নে উভয় পার্টির সদস্যরা যৌথভাবে কাজ করতেন।

১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে, ঠিক ছটপূজার আগে, সাম্যরাজ পার্টির নেতৃত্বাধীন কাশীপুর মিউনিসিপ্যালিটি স্ক্যাভেনজার্স্‌ ইউনিয়নের ডাকে কাশীপুর ও চিৎপুর অঞ্চলের মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদারদের এক ধর্মঘট হয়। ধর্মঘটী ঝাড়ুদারদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার মধ্যে প্রধানতম ছিল ছটপূজার জন্য অগ্রিম (অ্যাড্‌ভান্স্‌) দাবি করা। এই প্রধান দাবিটি সহ অন্যান্য দাবি আদায় সম্ভব হলে ধর্মঘটের সফল নিষ্পত্তি ঘটে। এই ধর্মঘটে ঝাড়ুদারদের উপদেষ্টা ছিলেন অঘোর সেন, বাদল গাঙ্গুলী, কুমুদনাথ দত্ত প্রমুখ সাম্যরাজ পার্টির নেতারা এবং পার্টির তরফ থেকে সুধীর দত্ত ধর্মঘটী ঝাড়ুদারদের নেতৃত্ব দেন। অতুলকৃষ্ণ রায় প্রমুখ পার্টি কর্মীরা ধর্মঘটে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিলেন।[২৫]

অঘোর সেন, বাদল গাঙ্গুলী, কুমুদনাথ দত্ত প্রমুখ সাম্যরাজ পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্যরা চটকল শ্রমিকদের মধ্যেও কাজ করতেন এবং চটকল শ্রমিকদেরও অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়াভিত্তিক ধর্মঘটে সংগঠিত করার চেষ্টা করতেন।[২৬] অবশ্য সাম্যরাজ পার্টির একক প্রচেষ্টায় কোনও চটকলেই ধর্মঘট হয় নি; সমস্ত চটকল ধর্মঘটই হয়েছে সব পার্টিসহ শ্রমিক নেতৃত্বের যৌথ প্রচেষ্টায়।

বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলনে বাদল গাঙ্গুলীর বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ১৯৩১ সালের ৩-৭ জুলাই কলকাতায় অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (এ. আই. টি. ইউ. সি.) একাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে এ. আই. টি. ইউ. সি. দ্বিধাবিভক্ত হয়। কমিউনিস্টরা ও সমমতাবলম্বী সহযোগীরা এ. আই. টি. ইউ. সি. ত্যাগ করে পাল্টা সংগঠন তৈরি করেন—রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (রেড টি. ইউ. সি.)। এই রেড টি. ইউ. সি.-র অন্যতম সহ-সভাপতি ছিলেন বাদল গাঙ্গুলী।[২৭]

১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বেঙ্গল লেবার পার্টির নেতৃবৃন্দের, বিশেষ করে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের, প্রচেষ্টায় ক্যালকাটা পোর্ট্‌ অ্যাণ্ড্‌ ডক্‌ ওয়ার্কার্স্‌ ইউনিয়ন নামে পোর্ট ও ডক শ্রমিকদের ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। লেবার পার্টির নেতৃত্বাধীন এই ইউনিয়নের অন্যতম সহ-সভাপতি ছিলেন বাদল গাঙ্গুলী। তখন তিনি সাম্যরাজ পার্টির নেতা হিসাবেই লেবার পার্টিতে যোগ দিয়েছেন।[২৮] ১৯৩৪ সালের ২৮ নভেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর, মোট ১৯ দিন, ১৪,০০০ ডক শ্রমিক এই ইউনিয়নের নেতৃত্বে ধর্মঘটে

সামিল হন।[২৯] এই ধর্মঘটের প্রধান নেতা ছিলেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার (ইউনিয়নের ট্রাস্টী) ও শিশির রায় (ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক)। বাদল গাঙ্গুলী সহ ইউনিয়নের ও লেবার পার্টি'র অন্যান্য নেতৃস্থানীয় সদস্যরাও এই ধর্মঘটে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সম্পূর্ণ দাবি আদায় করতে সক্ষম না হলেও এই ডক শ্রমিক ধর্মঘট শ্রমিক আন্দোলনে এক নতুন জীবন নিয়ে আসে।

শ্যামবাজারের ৩, ভবনাথ সেন স্ট্রীট-এ সাম্যরাজ পার্টি'র মূল অফিসটি অবস্থিত হলেও কুমুদনাথ দত্তের ১৪, কালীকুমার ব্যানার্জী লেনের বাড়িতেও সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে ১৯৩১ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্টি'র একটি শাখা অফিস খোলা হয়। ক্রমশঃ এটিই পার্টি'র মূল অফিস হয়ে দাঁড়ায়।[৩০] চরিত্রগতভাবে সাম্যরাজ পার্টি' অত্যন্ত জঙ্গী সংগঠন বলে পরিচিত ছিল। লাল উর্দি পরে পার্টি'র ভলান্টিয়ার্স'-রা কুমুদনাথ দত্তের বাড়িতে প্যারেড্ করতেন।[৩১] যেন আসন্ন "সশস্ত্র গণবিপ্লবে"র মহড়া চলত।

অন্যান্য ঘটনার মধ্য দিয়েও সাম্যরাজ পার্টি'র এই জঙ্গী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, যদিও এই জঙ্গী মনোভাবের বাস্তব প্রয়োগ বিশেষ দেখা যায় নি। ১৯৩১ সালের ২৯ মার্চ থেকে করাচীতে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়। করাচী কংগ্রেসের কিছুদিন পর ১৯৩১ সালেই সরোজ মুখোপাধ্যায়, বিনয় চৌধুরী প্রমুখের উদ্যোগে বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনের সময়ই সরোজ মুখোপাধ্যায়, বিনয় চৌধুরী প্রমুখ কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন কংগ্রেস কর্মীদের উদ্যোগে (তখনও তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্য হন নি) বর্ধমান টাউন হলে বর্ধমান বিভাগীয় সমাজবাদী সম্মেলন ও যুব সম্মেলন আয়োজিত হয়। সমাজবাদী সম্মেলন ও যুব সম্মেলনে যোগদানের জন্য উদ্যোক্তারা কলকাতার সমস্ত পরিচিত রাজনৈতিক গ্রুপকেই আমন্ত্রণ জানান। সদ্যগঠিত কমিউনিস্ট পার্টি'র "কলকাতা কমিটির"-র সদস্যরা ছাড়াও সোমনাথ লাহিড়ী (তখনও তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন নি), সাম্যরাজ পার্টি'র অঘোর সেন, বাদল গাঙ্গুলী প্রমুখও আমন্ত্রিত হন। বর্ধমান বিভাগীয় সমাজবাদী সম্মেলনে লাল পতাকা তোলেন বঙ্কিম মুখার্জী এবং সভাপতি ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মুদ্রিত অভিভাষণ পড়েন। যুব সম্মেলনে সভাপতি বঙ্কিম মুখার্জীও মুদ্রিত অভিভাষণ পড়েন।[৩২] সাম্যরাজ পার্টি'র তিন জঙ্গী নেতা অঘোর সেন, বাদল গাঙ্গুলী ও কুমুদনাথ দত্ত লাল জামা, লাল প্যান্ট ও লাল জুতো পরে সমাজবাদী সম্মেলনে যোগ দেন। ঐ সম্মেলনে এই তিনজন অত্যন্ত আক্রমণাত্মক কংগ্রেস-বিরোধী স্লোগান দেন এবং রক্তাক্ত বিপ্লবের ডাক দেন।[৩৩] বিচক্ষণ সভাপতি, পোড় খাওয়া মার্কসবাদী বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত অবশ্য ঐ প্রস্তুতিবিহীন হঠকারী ডাক অনুমোদন করেন নি এবং সেই মুহূর্তের রক্তাক্ত বিপ্লবের ডাকে সম্মেলনে উপস্থিত অন্যান্য প্রতিনিধিরাও গলা মেলান নি।

ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গেও সাম্যরাজ পার্টি'র যোগাযোগ ছিল এবং বাদল গাঙ্গুলী ছাত্র রাজনীতিতেও সক্রিয় ছিলেন। এই যোগাযোগের সূত্রপাত বিশের দশকের শেষ

ভাগ থেকেই। ১৯২৮ সালের ২২-২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের (এ. বি. এস. এ.) প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[৩৪] এই সম্মেলন থেকেই এ. বি. এস. এ.-র জন্ম হলেও ১৯২৮ সালের ৩ ফেব্রুআরি (সাইমন কমিশন্-বিরোধী বিক্ষোভের সূত্রপাতের দিন)-কেই সর্বসম্মতিক্রমে এই সংগঠনের জন্ম-তারিখ হিসাবে গণ্য করা হয়।[৩৫] ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জওহরলাল নেহরু এবং প্রধান অতিথি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সম্মেলন উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ডঃ ডব্লিউ. এস. আর্কুহার্ট্।[৩৬] সভাপতির অভিভাষণে নেহরু দৃঢ়ভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা বলেন এবং সর্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটানোর আহ্বান জানান।[৩৭] সুভাষচন্দ্র বসুও তাঁর বক্তৃতায় সমাজতন্ত্রের কথা বলেন, তবে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য নেহরুর বক্তব্য থেকে ভিন্নধর্মী ছিল।[৩৮] এই সম্মেলনে বাদল গাঙ্গুলী অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি কার্যনির্বাহী কমিটিরও অন্যতম সদস্য ছিলেন।[৩৯]

১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে এ. বি. এস. এ.-র দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ময়মনসিংহে। এই সম্মেলনে এ. বি. এস. এ. দ্বিখণ্ডিত হয়। এ. বি. এস. এ.-র সদস্যদের একাংশ মূল সংগঠন ছেড়ে বেরিয়ে এসে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন্ (বি. পি. এস. এ.) নামে একটি নতুন ছাত্র সংগঠন তৈরি করেন।[৪০] সংগঠন ভাগ হওয়ার পর বাদল গাঙ্গুলী এ. বি. এস. এ.-র সঙ্গেই ছিলেন।

কট্টর গান্ধীবিরোধী জঙ্গী নেতা বাদল গাঙ্গুলী "কমরেড গ্যাং" নামে পরিচিত ছিলেন।[৪১] বাদল গাঙ্গুলী সম্পর্কিত আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা এই প্রসঙ্গে একান্ত প্রয়োজন। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে বাগবাজারের পশুপতি বসুর বাড়িতে এ. বি. এস. এ.-র তৃতীয় সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। অন্যতম বক্তা ছিলেন সরোজ মুখোপাধ্যায়।[৪২] ঐ সম্মেলনে বাদল গাঙ্গুলী একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও অত্যন্ত সাহসী প্রস্তাব পেশ করেন—"There is no God." প্রস্তাবটি প্রথমে গৃহীত হয়। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত জানতে পেরে প্রচণ্ড আপত্তি করেন। তাঁর আপত্তিতেই গৃহীত প্রস্তাবটির উপর আবার ভোটগ্রহণ করা হয় ও প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়।[৪৩] সেই যুগে এইরকম একটি প্রস্তাব পেশ করা বাদল গাঙ্গুলীর মনের জোরেরই পরিচয় বহন করে।

১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে "মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা" সূত্রে বন্দী ফিলিপ স্প্রাট মুক্তি পেয়ে কলকাতায় আসেন। তিনি সাম্যরাজ পার্টির অফিসে আসতেন। সাম্যরাজ পার্টি'র তরফ থেকে স্প্রাটকে একটি সংবর্ধনা দেওয়া হয়।[৪৪] ১৯৩৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর স্প্রাট পুনরায় গ্রেফতার হন। ১৯৩৬ সালের ২৪ জুন "মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা" সূত্রে বন্দী মুজফ্ফর আহ্মদ মুক্তি পান। ৫ জুলাই সত্যেন্দ্রনাথ

মজুমদারের সভাপতিত্বে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে মুজফ্ফর আহ্‌মদকে গণ-সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অঘোর সেন প্রমুখ সাম্যরাজ পার্টির সদস্যরা ঐ সংবর্ধনা সভায় যোগ দেন এবং আয়োজকদের অন্যতম ছিলেন।[৪৫]

১৯৩১ সালের গোড়ার দিকে কমিউনিস্ট পার্টির "কলকাতা কমিটি" গঠনের পর থেকেই এই দলের সঙ্গে সাম্যরাজ পার্টির যোগাযোগ স্থাপিত হয়। উভয় দলের মধ্যে পারস্পরিক সমালোচনা-সহযোগিতার এক মিশ্র সম্পর্ক ছিল। শ্রমিক আন্দোলনে ও ছাত্র আন্দোলনে "কলকাতা কমিটি"-র সদস্যদের সঙ্গে সাম্যরাজ পার্টির সদস্যরা একযোগে কাজ করতেন। কমিউনিস্ট পার্টিসদস্য শ্রমিকনেতা মহম্মদ ইসমাইলের সঙ্গে ও কমিউনিস্ট পার্টিসদস্য ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ মুখার্জীর সঙ্গে অঘোর সেন প্রমুখ সাম্যরাজ পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্যরা একসঙ্গে কাজ করতেন। এছাড়াও ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ও বঙ্কিম মুখার্জীর সঙ্গে সাম্যরাজ পার্টির সদস্যদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রধান ট্রাম শ্রমিক নেতা মহম্মদ ইসমাইলের ডাকা ক্যালকাটা ট্রাম্‌ওয়েজ্ ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন-এর বিভিন্ন মিটিং-এ অঘোর সেন প্রমুখ যোগ দিতেন। তিরিশের দশকের শেষভাগে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা প্রমোদ দাসগুপ্তের সঙ্গে অঘোর সেনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়।[৪৬]

অন্যান্য কমিউনিস্ট গ্রুপের সঙ্গেও সাম্যরাজ পার্টি যোগাযোগ রাখত। যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের সঙ্গেও একত্রে কাজ করতে সাম্যরাজ পার্টি আগ্রহী ছিল, যদিও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি।[৪৭] "কারখানা" গ্রুপের নেতা এ. এম. এ. জামানের সঙ্গেও শ্রমিক সংগঠনসূত্রে সাম্যরাজ পার্টির সদস্যদের যোগাযোগ ছিল।[৪৮]

১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের নেতৃত্বে বেঙ্গল লেবার পার্টি গঠিত হয়। ১৯৩৩ সাল থেকেই লেবার পার্টির নিয়ন্ত্রণ চলে আসে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্টদের হাতে। প্রথমাবস্থায় লেবার পার্টি ছিল বিভিন্ন কমিউনিস্ট ও অ-কমিউনিস্ট গ্রুপের একটি প্রকাশ্য মঞ্চ। ১৯৩৩ সালে অঘোর সেন, বাদল গাঙ্গুলী প্রমুখ সাম্যরাজ পার্টির নেতারা প্রকাশ্য প্ল্যাট্‌ফর্ম (মঞ্চ) হিসাবে লেবার পার্টিকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে সাম্যরাজ পার্টির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে লেবার পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৩৪ সালেই লেবার পার্টির নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের ও তাঁর সহযোগীদের হাতে চলে যাওয়ায় অঘোর সেন লেবার পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। বাদল গাঙ্গুলী কিন্তু লেবার পার্টি ত্যাগ করেন নি। তিনি ছিলেন লেবার পার্টির প্রকাশ্য মঞ্চের অন্যতম নেতৃস্থানীয় সদস্য এবং লেবার পার্টির নেতৃত্বাধীন ক্যালকাটা পোর্ট্ অ্যাণ্ড্ ডক্ ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়নের অন্যতম সহ-সভাপতি। এমনকি সাম্যরাজ পার্টির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার পরেও বাদল গাঙ্গুলী লেবার পার্টির প্রকাশ্য মঞ্চটির সদস্য ছিলেন, যদিও তিনি কোনওদিনই লেবার পার্টির আভ্যন্তরিক কমিউনিস্ট গ্রুপটির (পরে ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে এই গ্রুপটির নাম হয় বলশেভিক পার্টি) সদস্য হন নি এবং তাঁদের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্তও ছিলেন না।[৪৯]

১৯৩২ সাল থেকেই সাম্যরাজ পার্টির দুই শীর্ষস্থানীয় নেতা অঘোর সেন ও বাদল

গাঙ্গুলীর মধ্যে মতবিরোধের সূত্রপাত হয়। অঘোর সেন ও বাদল গাঙ্গুলী উভয়েই "সন্ত্রাসবাদী" পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন এবং প্রকাশ্য গণ-আন্দোলনের শক্তিতে আস্থাশীল ছিলেন। তৎসত্ত্বেও কর্মপদ্ধতির প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। অঘোর সেন সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ্য কাজকর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং পার্টির কোনও গোপন কাজকর্মে তাঁর অনুমোদন ছিল না। অপরদিকে বাদল গাঙ্গুলী প্রকাশ্য কাজের সঙ্গে সঙ্গেই পার্টির গোপন কাজকর্মের উপরও জোর দিতেন। বাদল গাঙ্গুলী মনে করতেন, সাম্যরাজ পার্টির আণ্ডারগ্রাউণ্ড অবস্থায় কাজ করা উচিত। এই মতপার্থক্যের ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে সাম্যরাজ পার্টি দ্বিখণ্ডিত না হলেও অঘোর সেন ও বাদল গাঙ্গুলী পরস্পর সম্পর্করহিতভাবে নিজের নিজের মতানুযায়ী কাজ করতে থাকেন। সাম্যরাজ পার্টির মধ্যে পরিষ্কার দুটি গ্রুপের সৃষ্টি হয়। এই বিতর্কে ও মতপার্থক্যে অতুলকৃষ্ণ রায় ছিলেন অঘোর সেনের অনুগামী।[৫০]

সাম্যরাজ পার্টির কার্যকলাপ খুব বিস্তৃতি লাভ না করে করলেও এবং এই পার্টির প্রভাব খুব ব্যাপ্ত না হলেও বঙ্গীয় পুলিস সূত্রে বিশেষ গুরুত্বসহকারে এই পার্টির উল্লেখ দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয় হল, পুলিস-রিপোর্টে সাম্যরাজ পার্টিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বঙ্গীয় পুলিস সাম্যরাজ পার্টির কমিউনিজম প্রচারকে যথেষ্টই গুরুত্ব দিত।[৫১]

তিরিশের দশকের পূর্ববাংলায় সাম্যরাজ পার্টির কার্যকলাপ

সাম্যরাজ পার্টির মূল কেন্দ্রটি কলকাতায় অবস্থিত হলেও এবং প্রধান কাজকর্মের জায়গা কলকাতা হলেও ১৯৩০ সাল থেকেই পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলায় অঘোর সেনের ও বাদল গাঙ্গুলীর প্রচেষ্টায় পার্টির প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে। এই দুজনের প্রচেষ্টায় ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় সাম্যরাজ পার্টির শাখা স্থাপিত হয়। এছাড়াও চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি জেলাতেও সাম্যরাজ পার্টি প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়।[৫২]

পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলার মধ্যে প্রথম ঢাকায় সাম্যরাজ পার্টির শাখা স্থাপিত হয় ১৯৩০ সালে। ময়মনসিংহের ভূপেন্দ্র (মাখন) বর্মনের সহায়তায় ১৯৩০ সালে সন্তোষ মুখার্জী ঢাকা জেলায় সাম্যরাজ পার্টির শাখা খোলেন। ১৯৩১ সাল থেকে ক্রমশঃ ঢাকা জেলায় সাম্যরাজ পার্টির কাজকর্ম স্তিমিত হয়ে আসে।[৫৩]

পূর্ববাংলার ময়মনসিংহ জেলায় সাম্যরাজ পার্টি তিরিশের দশকের প্রথমভাগে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে বিনয়কুমার (অন্ধা) বসুর নেতৃত্বে ময়মনসিংহ জেলার যুগান্তর দলের সদস্যরা মার্কসবাদে আকৃষ্ট হয়ে দল ছেড়ে বেরিয়ে এসে জেলায় সাম্যরাজ পার্টির গোড়াপত্তন করেন। এই নতুন সংগঠন সাম্যরাজ পার্টির ময়মনসিংহ শাখা হিসাবে পরিচিত ছিল। ময়মনসিংহ সাম্যরাজ পার্টি পরিচালিত হতো কলকাতার ৩, ভবনাথ সেন স্ট্রীটের সাম্যরাজ পার্টির মূল অফিসটি থেকে। ময়মনসিংহ সাম্যরাজ পার্টির কার্যনির্বাহী কমিটি সাতজন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয়ঃ

(১) বিনয়কুমার বসু (সম্পাদক), (২) নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী (সহ-সম্পাদক), (৩) আব্দুল জলিল, (৪) যতীন বল (কোষাধ্যক্ষ), (৫) সত্য বাগচী, (৬) কৈজুদ্দিন হুসেন এবং (৭) ফজলু ।[৫৪]

ময়মনসিংহ সাম্যরাজ পার্টি কোচোয়ান, মিল্ শ্রমিক, কুলী ও ঝাড়ুদারদের মধ্যে কাজ করতে থাকে। মাঝিমাল্লাদের মধ্যেও সাম্যরাজ পার্টি সক্রিয় ছিল। এই অসংগঠিত শ্রমজীবীদের সাম্যরাজ পার্টি ইউনিয়নে সংগঠিত করতে চেষ্টা করে এবং ধর্মঘট করারও চেষ্টা চালায়। ধর্মঘট করতে না পারলেও এই শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে ময়মনসিংহ সাম্যরাজ পার্টি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল ।[৫৫]

ময়মনসিংহ সাম্যরাজ পার্টি অসংগঠিত শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ন্যূনতম দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। জনসভা, বিক্ষোভ ও ধর্মঘট এই আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় ও রূপ হিসাবে স্থির হয়েছিল ।[৫৬]

ময়মনসিংহ জেলার ইয়ং কমরেডস্ লীগের প্রাক্তন সদস্যদের সঙ্গেও সাম্যরাজ পার্টির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কিন্তু কলকাতায় সাম্যরাজ পার্টির আভ্যন্তরীণ মতবিরোধের প্রতিফলন পড়ে ময়মনসিংহ সাম্যরাজ পার্টিতেও। অঘোর সেনের ও বাদল গাঙ্গুলীর অনুগামীদের মধ্যে পার্টির নেতৃত্ব দখলের লড়াই শুরু হয়। ময়মনসিংহ সাম্যরাজ পার্টির আব্দুল জলিল ছিলেন বাদল গাঙ্গুলীর অনুগামী। ১৯৩২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই অঘোর সেন ও বাদল গাঙ্গুলীর মধ্যে মতবিরোধের সূত্রপাত হয়। তারই জের টেনে ময়মনসিংহ সাম্যরাজ পার্টির অঘোর সেনের অনুগামীরা চেষ্টা করতে থাকেন, যাতে আব্দুল জলিল পার্টির নেতৃত্ব দখল করে নিতে না পারেন। ময়মনসিংহ পার্টির অঘোর সেনপন্থীরা জলিলকে প্রতিহত করবার জন্য ঠিক করেন, প্রথমে ইয়ং কমরেডস্ লীগের কিশোরগঞ্জ শাখার প্রাক্তন কমিটি সদস্য ও সংগঠক মণীন্দ্র চক্রবর্তীকে সাম্যরাজ পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হবে এবং তিনি সম্মত না হলেও প্রাক্তন কংগ্রেস কর্মী ক্ষিতীশ দত্তরায়কে এই অনুরোধ জানানো হবে ।[৫৭]

এই নেতৃত্ব-সংক্রান্ত বিরোধ ময়মনসিংহ সাম্যরাজ পার্টিকে নিঃসন্দেহে ধাক্কা দিয়েছিল, কিন্তু পার্টির কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় নি। ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে ময়মনসিংহ সাম্যরাজ পার্টি গণ-জাগরণের উদ্দেশ্যে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী প্রচার-অভিযানের ও আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কামিনী ঘোষ ।[৫৮]

সাম্যরাজ পার্টির বিলোপ

রণেন সেন লিখেছেন, ১৯৩৩ সাল নাগাদ সাম্যরাজ পার্টি অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং ১৯৩৪ সালে অঘোর সেন সহ এই দল থেকে কয়েকজন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন ।[৫৯] অপরদিকে তৎকালীন সাম্যরাজ পার্টির সদস্য অতুলকৃষ্ণ রায়ের বক্তব্য, তীব্র অন্তর্বিরোধ সত্ত্বেও সাম্যরাজ পার্টির ঐক্যবদ্ধ অস্তিত্ব ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে অবধি বজায় ছিল। অঘোর সেন কখনই ১৯৩৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন

নি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী অঘোর সেন সম্ভবত চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে প্রমোদ দাসগুপ্তের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। বাদল গাঙ্গুলী, কুমুদনাথ দত্ত, অতুলকৃষ্ণ রায় প্রমুখ কেউই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন নি।[৬০] এই প্রসঙ্গে তৃতীয় বক্তব্য পাওয়া গেছে তদানীন্তন সাম্যরাজ পার্টির ঘনিষ্ঠ সহযোগী অরুণ বসুর কাছ থেকে। অরুণ বসুর বক্তব্যানুযায়ী সাম্যরাজ পার্টি ১৯৩৭ সালে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং কয়েকজন পার্টি সদস্য ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। কুমুদনাথ দত্ত কমিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক সদস্য না হলেও আজীবন সহযোগী ছিলেন।[৬১]

সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কোন্ সালে সাম্যরাজ পার্টি বিলুপ্ত হয়, সেই বিষয়টিও যথেষ্ট বিতর্কিত, এবং এই বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত হওয়া সম্ভব নয়। তবে ১৯৩৩-৩৪ সালেও যে সাম্যরাজ পার্টির অস্তিত্ব বজায় ছিল, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে সাম্যরাজ পার্টির ডাকে কাশীপুর-চিৎপুর অঞ্চলে ঝাড়ুদার ধর্মঘট হয়। বঙ্গীয় পুলিসসূত্রেও ১৯৩৪ সাল অবধি সাম্যরাজ পার্টির কাজকর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৪ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির মূল অংশটি ক্রমশ শক্তি অর্জন করতে থাকায় সাম্যরাজ পার্টি হীনবল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সম্ভবতঃ নামসর্বস্ব সাম্যরাজ পার্টির অস্তিত্ব ১৯৩৪ সালের পরেও কয়েক বছর বজায় ছিল।

সাম্যরাজ পার্টি আজ প্রায় বিস্মরণের গহ্বরে। কিন্তু বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের শৈশবাবস্থায় বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েও শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে এবং কমিউনিজম প্রচারের ও প্রসারের ক্ষেত্রে সাম্যরাজ পার্টির ভূমিকা কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস-চর্চার আবশ্যক অঙ্গ।

সূত্রনির্দেশ :

১. সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, প্রথম খণ্ড (১৯৩০-১৯৪১), গণশক্তি পত্রিকা দপ্তর, কলকাতা, মে, ১৯৮৫, পৃ ৬২।

২. রণেন সেন, বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০-'৪৮), বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, মে, ১৯৮১, পৃ ৪২।

৩. Ranen Sen, 'Communist Movement in Bengal in the Early Thirties', *Marxist Miscellany*, No. 6, January, 1975, New Delhi, p. 7; রণেন সেন, 'বাঙলার ত্রিশ দশকের প্রথমার্ধের কমিউনিস্ট আন্দোলন,' কমিউনিস্ট, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অর্ধশতক পূর্তি উপলক্ষে সি. পি. আই. দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিশেষ সংখ্যা, কলিকাতা, পৃ ১৬৬।

৪. ধরণী গোস্বামী, 'ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ত্রিশের দশকের এক অধ্যায়',

(দ্বিতীয় পর্ব), পরিচয়, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৫, অগ্রহায়ণ, ১৩৮০ বাংলা সন (বা. স.), ডিসেম্বর, ১৯৭৩, কলকাতা, পৃ ৫০৪। সম্ভবতঃ স্মৃতিবিভ্রমের কারণে ধরণী গোস্বামী তাঁর লেখায় এই দলের নাম উল্লেখ করেছেন "সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা গ্রুপ" বা সংক্ষেপে "সাং-মৈং-সাং"। কিন্তু সাম্যরাজ পার্টি স্বনামেই পরিচিত ছিল। সাম্যরাজ পার্টি'র এই ধরনের অপর একটি নামের সমর্থন অন্য কোনও সূত্রেই পাওয়া যায় নি।

৫. David M. Laushey, *Bengal Terrorism and the Marxist Left: Aspects of Regional Nationalism in India, 1905-1942*, Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1975, p. 97.

৬. Horace Williamson, *India and Communism*, (With an introduction and explanatory notes by Mahadevaprasad Saha), Editions Indian, Calcutta, 1976, pp. 231-32.

৭. অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সংগ্রহ করা জাগ্রত চীন (লেখক—মণিময় প্রামাণিক, ১৯২৯) এবং ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের গতি ও পরিণতি (লেখক —সন্তোষকুমার মণ্ডল, ১৩৩৭ বা. স., ১৯৩০) বই দুটির বিভিন্ন পৃষ্ঠায় সাম্যরাজ পার্টি'র রাবার স্ট্যাম্পের ছাপ দেখা যায়। এই ইংরেজি রাবার স্ট্যাম্পের ওপরে লেখা Samyaraj Party, মাঝখানে কাস্তে-হাতুড়ি আঁকা এবং একপাশে লেখা Estd. ও অপর পাশে লেখা 1919, এবং তলায় লেখা Bengal. এই রাবার স্ট্যাম্প অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা সাল ১৯১৯ কিন্তু অন্য কোনও প্রামাণিক সূত্রেই সমর্থিত হয় নি।

৮. অঘোর সেনের জন্ম ১২ এপ্রিল ১৯০২ এবং মৃত্যু ১৩ জানুআরি ১৯৮১। তাঁর আদি বাড়ি ছিল ফরিদপুরের মাদারীপুরে। ঢাকায় তিনি পড়াশুনা করেছেন।

৯. সাধারণভাবে সেই যুগের জাতীয় বিপ্লবীদের বিপ্লবী "সন্ত্রাসবাদী" বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তৎকালীন বিপ্লবীদের হেয় করার উদ্দেশ্যেই "সন্ত্রাসবাদী" শব্দটি ব্যবহার করেছিল। নিঃসন্দেহে এই বিপ্লবীদের কর্মপদ্ধতি ছিল "সন্ত্রাসবাদী"। এই "সন্ত্রাসবাদী" কর্মপদ্ধতির সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য এবং এই সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করেই এই বিপ্লবীদের অনেকেরই কমিউনিজমে উত্তরণ। কিন্তু যেহেতু শুধুমাত্র "সন্ত্রাসবাদী" শব্দটি ব্যবহার করে তৎকালীন বিপ্লবী আন্দোলনের পূর্ণ চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলা সম্ভবপর নয়, সেহেতু আমি তাঁদের সম্বন্ধে "জাতীয় বিপ্লবী" ও "জাতীয় বিপ্লববাদী" আখ্যা দুটি ব্যবহার করছি। অবশ্য তাঁদের কর্মপদ্ধতি আলোচনার ক্ষেত্রে আমি "সন্ত্রাসবাদী" শব্দটিরই আশ্রয় গ্রহণ করছি।

১০. বাদল গাঙ্গুলীর জন্ম ১০ ডিসেম্বর ১৯০৭ এবং মৃত্যু ২৩ জানুআরি ১৯৮৫। তাঁর বাড়ি ছিল কলকাতার টালায়।

১১. কুমুদনাথ (নাড়ু) দত্তের জন্ম ৯ ফেব্রুআরি ১৯১১ এবং মৃত্যু ৯ এপ্রিল ১৯৬৮। তাঁর বাড়ি ছিল টালায় ১৪, কালীকুমার ব্যানার্জী লেনে।

১২. অতুলকৃষ্ণ রায়ের জন্ম ১৯০৯ সালে (১৩১৬ বা. স.) কলকাতায় ১২, পাইকপাড়া রোডের বাড়িতে। অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সাম্যরাজ পার্টি'র সদস্য অতুলকৃষ্ণ রায়ের সাক্ষাৎকার নেন ১৭. ৫. ১৯৮৮. এবং আমি অতুল রায়ের সাক্ষাৎকার নিই ১৭. ১২. ১৯৮৯। সাম্যরাজ পার্টি'র জন্ম ও কার্যকলাপ সম্পর্কিত বহু তথ্য তাঁর সাক্ষাৎকার থেকে গৃহীত হয়েছে। সাম্যরাজ পার্টি'র এই একজনই জীবিত সদস্যের সন্ধান পাওয়া গেছে।

১৩. লেখকের সঙ্গে অতুলকৃষ্ণ রায়ের সাক্ষাৎকার—১৭. ১২. ১৯৮৯।

১৪. লেখকের সঙ্গে অতুলকৃষ্ণ রায়ের সাক্ষাৎকার—১৭. ১২. ১৯৮৯ ; লেখকের সঙ্গে অরুণ বসুর সাক্ষাৎকার—৪. ৬. ১৯৮৮, ১০. ১২. ১৯৮৯। কুমুদনাথ দত্ত ছিলেন অরুণ বসুর (জন্ম ১৯১৯) মামা। মামার মাধ্যমেই অরুণ বসু সাম্যরাজ পার্টি'র কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি সাম্যরাজ পার্টি'র সহযোগী ও এই পার্টি'র কাজকর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, যদিও কোনওদিনই তিনি সদস্য হন নি। পরবর্তীকালের প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা অরুণ বসু চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। (অরুণ বসুর সাক্ষাৎকার—৪. ৬. ১৯৮৮, ১০. ১২. ১৯৮৯)।

১৫. অরুণ বসুর সাক্ষাৎকার—১০. ১২. ১৯৮৯ ; অতুলকৃষ্ণ রায়ের সাক্ষাৎকার—১৭. ১২. ১৯৮৯।

১৬. অতুলকৃষ্ণ রায়ের সাক্ষাৎকার—১৭. ১২. ১৯৮৯।

১৭. অতুল রায়ের সাক্ষাৎকার—১৭. ৫. ১৯৮৮ (রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য), ১৭. ১২. ১৯৮৯ (লেখক)।

১৮. Horace Williamson, op. cit., pp. 231-32 ; David M. Laushey., op cit, p 97.

১৯. সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৬২ ; রণেন সেন, বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪২ ; Ranen Sen, op. cit., *Marxist Miscellany*, p. 7 ; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, কমিউনিস্ট, পৃ ১৬৬ ; Laushey, op. cit., p. 97.

২০. অতুল রায়ের সাক্ষাৎকার—১৭. ৫. ১৯৮৮ (রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য), ১৭. ১২. ১৯৮৯ (লেখক)।

২১. অতুল রায়ের সাক্ষাৎকার।

২২. লেখকের সঙ্গে অরুণ বসুর সাক্ষাৎকার—১০. ১২. ১৯৮৯।

২৩. অতুল রায়ের সাক্ষাৎকার—১৭. ৫. ১৯৮৮ (রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য), ১৭. ১২. ১৯৮৯ (লেখক)।

২৪. Intelligence Branch (I. B.), Government of Bengal—File No. 929 / 1935 (Year—1935).

২৫. লেখকের সঙ্গে অতুল রায়ের সাক্ষাৎকার—১৭. ১২. ১৯৮৯।

২৬. অরুণ বসুর সাক্ষাৎকার—১০. ১২. ১৯৮৯।

২৭. Home / Poll. / F. No. 7 / 20/1934 & K. W., Serial Nos. 1—4 ; Subodh Roy (ed.), *Communism in India : Unpublished Documents*, (Volume 1), (1925—1934), National Book Agency, Calcutta, 1980, pp. 377-78 ; রণেন সেন, বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪২-৪৫।

২৮. Home / Poll. / F. No. 7/20 / 1934 & K. W., Serial Nos. 1—4 ; Subodh Roy (ed.), op. cit., pp 408-09.

২৯. Home / Poll. / F. No. 7 / 20 / 1934 & K. W., Serial Nos. 1—4 ; Subodh Roy (ed.), op. cit., p. 416 ; নয়া মজদুর, লাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির মুখপত্র, নিতাই ব্যানার্জী সম্পাদিত, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, ৮ ডিসেম্বর, শনিবার, ১৯৩৪, পৃ ৪। 'নয়া মজদুর' পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী ধর্মঘট ২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হয়।

৩০. অতুল রায়ের সাক্ষাৎকার—১৭. ১২. ১৯৮৯ (লেখক)।

৩১. অরুণ বসুর সাক্ষাৎকার—১০. ১২. ১৯৮৯।

৩২. সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪৫-৪৭।

৩৩. ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও স্নেহভাজন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার প্রথম অফিস-সম্পাদক রমেন্দ্রনাথ দত্তের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১৯৮৮ সালের ২৬ মার্চ। এই তথ্য ঐ সাক্ষাৎকার থেকে গৃহীত।

৩৪. Satyendra Narayan Mazumdar, *In Search of A Revolutionary Ideology and A Revolutionary Programme : A Study in the Transition from National Revolutionary Terrorism to Communism*, People's Publishing House, New Delhi, December, 1979, p. 145 ; গৌতম চট্টোপাধ্যায়, স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ, চারুপ্রকাশ, কলকাতা, মার্চ, ১৯৮০, পৃ ২৬ ; ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা, যশোর-খুলনা যুবসঙ্ঘের উদ্যোগে প্রকাশিত, প্রধান সম্পাদক—সুকুমার মিত্র, প্রকাশক—শশাঙ্কশেখর ঘোষ ও কুমার মিত্র, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৭৯, পৃ ১৬২ ; লেখকের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের সাক্ষাৎকার—১১. ৭. ১৯৮৬।

৩৫. Satyendra Narayan Mazumdar, op. cit., p. 145.

৩৬. Ibid., p. 145 ; সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের সাক্ষাৎকার—১১. ৭. ১৯৮৬।

৩৭. *The Amrita Bazar Patrika*, Calcutta, September 23, 1928, p. 3 and September 25, 1928, p. 4; Satyendra Narayan Mazumder, op. cit., pp. 145-49; সত্যেন মজুমদারের সাক্ষাৎকার—১১. ৭. ১৯৮৬; গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৬-২৭।

৩৮. Mazumdar, op. cit., pp. 149-50; সত্যেন মজুমদারের সাক্ষাৎকার।

৩৯. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে শৈলেন মুখার্জীর সাক্ষাৎকার—২৮. ৯. ১৯৮৮। এ. বি. এস. এ.-র সদস্য শৈলেন মুখার্জী পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

৪০. Mazumdar, op. cit., p. 150; সত্যেন মজুমদারের সাক্ষাৎকার; গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৯; ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৬৫।

৪১. সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের সাক্ষাৎকার—১১. ৭. ১৯৮৬।

৪২. লেখকের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের সাক্ষাৎকার—১১. ৭. ১৯৮৬; রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে শৈলেন মুখার্জীর সাক্ষাৎকার—২৮. ৯. ১৯৮৮; রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে ধরিত্রী গাঙ্গুলীর সাক্ষাৎকার—২৫. ৭. ১৯৮৮। ধরিত্রী গাঙ্গুলী ছিলেন রাজনীতিক্ষেত্রে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামী। তিরিশের দশকের ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী রায়পন্থী ধরিত্রী গাঙ্গুলী বাংলাদেশের সেই সময়ের রাজনীতিতে একটি পরিচিত নাম ছিলেন।

৪৩. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে ধরিত্রী গাঙ্গুলীর সাক্ষাৎকার (২৫. ৭. ১৯৮৮) ও শৈলেন মুখার্জীর সাক্ষাৎকার (২৮. ৯. ১৯৮৮)।

৪৪. অতুল রায়ের সাক্ষাৎকার—১৭. ৫. ১৯৮৮ (রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য), ১৭. ১২. ১৯৮৯ (লেখক)।

৪৫. অতুল রায়ের সাক্ষাৎকার—১৭. ১২. ১৯৮৯ (লেখক)।

৪৬. অতুল রায়ের সাক্ষাৎকার—১৭. ১২. ১৯৮৯ (লেখক)।

৪৭. সুরেশ দাসগুপ্তের আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিচারণ (অপ্রকাশিত), ১৯৭৮, পৃ ৩৩ (১৯৭৮ সালে লিখিত অপ্রকাশিত ৪২ পৃষ্ঠা পাণ্ডুলিপির ৩৩ পৃষ্ঠা)। যশোর-খুলনা যুব সঙ্ঘের সদস্য সুরেশ দাসগুপ্ত প্রথমে লেবার পার্টিতে ও সেখান থেকে পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

৪৮. অতুল রায়ের সাক্ষাৎকার—১৭. ১২. ১৯৮৯ (লেখক)।

৪৯. লেখকের সঙ্গে সুরেশ দাসগুপ্তের সাক্ষাৎকার (১৪. ৮. ১৯৮৭), প্রমোদ সেনের সাক্ষাৎকার (২০. ৮. ১৯৮৭) ও কমল সরকারের সাক্ষাৎকার (২৮. ৪. ১৯৮৯, ৩. ৫. ১৯৮৯ ও ২৫. ৮. ১৯৮৯)। এঁরা সকলেই সেই সময় বেঙ্গল লেবার পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্য ছিলেন। বর্তমানে কমল সরকার সুপরিচিত সি. পি. আই. (এম.) নেতা।

৫০. Horace Williamson, op. cit., p. 232; Intelligence Branch (I.

B.), Government of Bengal—File No. 1201 / 1933 (Year—1933) ; অতুল রায়ের সাক্ষাৎকার—১৭. ৫. ১৯৮৮ (রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য), ১৭. ১২. ১৯৮৯ (লেখক) ।

৫১. Intelligence Branch (I. B.), Government of Bengal,—File No. 1201 / 1933 (Year—1933).

৫২. I. B., File No. 1201 / 33.

৫৩. I. B., File No. 1201 / 33.

৫৪. I. B., File No. 1201 / 33.

৫৫. I. B., File No. 1201 / 33.

৫৬. I. B., File No. 1201 / 33.

৫৭. I. B., File No. 1201 / 33.

৫৮. I. B., File No. 1201 /. 33.

৫৯. রণেন সেন, বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪২ ; Ranen Sen, op cit., *Marxist Miscellany*, p. 7 ; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, কমিউনিস্ট, পৃ ১৬৬ ।

৬০. অতুল রায়ের সাক্ষাৎকার—১৭. ১২. ১৯৮৯ (লেখক) ।

৬১. অরুণ বসুর সাক্ষাৎকার—১০. ১২. ১৯৮৯ ।

তিরিশের দশকে বাংলায় কয়েকটি কমিউনিস্ট সংগঠনের ভূমিকা

তিরিশের দশকে বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের শৈশবাবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতীত আরও বেশ কয়েকটি কমিউনিস্ট সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল। আত্মপ্রকাশের কয়েক বছরের মধ্যেই এই কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির অধিকাংশই হয় অবলুপ্ত হয়ে যায়, নয় মূল কমিউনিস্ট পার্টিতে মিশে যায়। কিন্তু এই স্বল্পকালীন স্বাধীন অস্তিত্বের যুগে এই কমিউনিস্ট সংগঠনগুলি কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা রেখেছিল, সেটি নিঃসন্দেহে আলোচনার দাবি রাখে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এই সংগঠনগুলি আজ প্রায় বিস্মৃতির অন্তরালে। বর্তমান নিবন্ধের বিষয়বস্তু এই ধরনের ছটি বিস্মৃতপ্রায় কমিউনিস্ট সংগঠন: ইউথ লীগ, বেঙ্গল, ছাত্র-যুব সংসদ, লীগ এগেন্‌স্ট্ গান্ধীজ্‌ম্ (League Against Gandhism), ইয়ং কমিউনিস্ট পার্টি, অজিত দাসগুপ্তের গোপন কমিউনিস্ট গ্রুপ ও ওয়ার্কার্স্ লীগ (Workers' League)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাত্র-যুব সংসদ ব্যতীত অন্যান্য সবকটি কমিউনিস্ট সংগঠনের সঙ্গেই অজিত দাসগুপ্ত যুক্ত ছিলেন। সেই হিসাবে বলা যেতে পারে, বর্তমান নিবন্ধে আলোচিত এই সংগঠনগুলির যোগসূত্র অজিত দাসগুপ্ত।

আলোচ্য ছটি সংগঠনের মধ্যে একমাত্র লীগ এগেন্‌স্ট্ গান্ধীজ্‌ম্ সম্পর্কেই কিছু প্রকাশিত বিবরণ পাওয়া যায়, যদিও সেটি এই সংগঠন-সম্পর্কিত কোনও পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য যথেষ্ট নয়। অন্যান্য সংগঠনগুলির ক্ষেত্রে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত বিবরণ নিতান্তই অপ্রতুল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ফলে আলোচ্য সংগঠনগুলির সম্যক্ চিত্র পাঠকদের সামনে তুলে ধরার জন্য আমাকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করতে হয়েছে বঙ্গীয় পুলিসসূত্র ও জাতীয় মহাফেজখানা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর। অবশ্য সেই যুগের কমিউনিস্ট পার্টির সংবাদপত্র এবং দৈনিক সংবাদপত্র থেকেও লীগ এগেন্‌স্ট্ গান্ধীজ্‌ম্ সম্পর্কে তথ্য আহরণ করেছি। এই ধরনের অপ্রতুল তথ্যসূত্রের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারের মাধ্যমেই এই সংগঠনগুলির সম্যক্ বিবরণ লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস চালিয়েছি।

ইউথ লীগ, বেঙ্গল

১৯৩০ সালে বেঙ্গল ইউথ লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। অজিত দাসগুপ্ত ছিলেন এই সংগঠনের প্রথম সম্পাদক। বেঙ্গল ইউথ লীগের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ আইন-অমান্য আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও এই আন্দোলনের গণভিত্তিকে সুদৃঢ় করা। এই উদ্দেশ্যে বেঙ্গল ইউথ লীগের সদস্যরা আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। রাজবন্দী কালিপদ মুখার্জী ছিলেন এই সংগঠনের অন্যতম প্রধান নেতা। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের (১৮ এপ্রিল ১৯৩০) সমর্থনে, হিজলী বন্দীনিবাসে বিনাবিচারে বন্দী নিরস্ত্র দেশপ্রেমিকদের উপর অকস্মাৎ গুলিবর্ষণের এবং সন্তোষকুমার মিত্রের ও তারকেশ্বর সেনগুপ্তের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১)

প্রতিবাদে এবং সুভাষচন্দ্র বসুকে গ্রেফ্‌তারের প্রতিবাদে দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতির ও বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন্ (বি. পি. এস. এ.)-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় বেঙ্গল ইউথ লীগ বিভিন্ন মিটিং-এর আয়োজন করে। ঐ সমস্ত মিটিং-এ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেওয়া হয়। পরিণামে বেঙ্গল ইউথ লীগ নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

১৯৩৪ সালের শেষাশেষি কলকাতায় পোর্ট্ ও ডক্ শ্রমিকদের ধর্মঘট চলাকালীন (২৮ নভেম্বর—১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৪) অজিত দাসগুপ্তের প্রচেষ্টায় এই সংগঠনটি পুনরুজ্জীবিত হয়। পুনরুজ্জীবিত সংগঠনটির নাম ও চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয়। নতুন নাম হয় ইউথ লীগ, বেঙ্গল। ইউথ লীগ, বেঙ্গল কমিউনিস্ট মতাদর্শে তার বিশ্বাস ঘোষণা করে। ১৪৪, আমহার্স্ট্ স্ট্রীটে সংগঠনের অফিস খোলা হয়। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি'র ও বেঙ্গল লেবার পার্টি'র সদস্যরাও এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ও এই সংগঠনের সদস্য ছিলেন। সংগঠনটির উচ্চ পদাধিকারীরা সকলেই ছিলেন বেঙ্গল লেবার পার্টি'র নেতৃস্থানীয় সদস্য। ইউথ লীগ, বেঙ্গল-এর সভাপতি ও প্রধান সংগঠক অজিত দাসগুপ্ত স্বয়ং ছিলেন বেঙ্গল লেবার পার্টি'র অন্যতম নেতা। এই সংগঠনের সহ-সভাপতি সুশীল চ্যাটার্জী, সম্পাদক শ্রী নারায়ণ ঝা, সহ-সম্পাদক নন্দলাল বসু এবং দুই নেতৃস্থানীয় সদস্য কমল সরকার ও জ্যোতির্ময় নন্দী ছিলেন বেঙ্গল লেবার পার্টি'র অগ্রণী সদস্য। এই সংগঠনের অন্যতম সদস্য শামসুল হুদা ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র কলকাতা কমিটির নেতৃস্থানীয় সদস্য।

কমিউনিস্ট পার্টি'র ও অন্যান্য সমস্ত কমিউনিস্ট গ্রুপের সমর্থন নিয়ে এবং তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে ইউথ লীগ, বেঙ্গল কাজ করত। ক্যালকাটা পোর্ট্ অ্যাণ্ড ডক্ ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়নের ডাকে অনুষ্ঠিত পোর্ট ও ডক শ্রমিকদের ধর্মঘটের সময় (এই সময়েই সংগঠনটি পুনরুজ্জীবিত হয়) ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে ইউথ লীগ, বেঙ্গল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে বিভিন্ন মিটিং-মিছিলের আয়োজন করা এই সংগঠনের নিয়মিত কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১]

ছাত্র-যুব সংসদের সহযোগিতায় ইউথ লীগ, বেঙ্গল-এর পক্ষ হতে "বেকার পরিষদ" ("Unemployed Council") নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। বেকারদের জন্য চাকরির দাবির পাশাপাশি রাজনৈতিক আন্দোলনেও "বেকার পরিষদ"-এর ভূমিকা ছিল। ১৯৩৪—১৯৩৫ সালে ইউথ লীগ, বেঙ্গল প্রধানত দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ও বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন মিটিং-মিছিল সংগঠিত করার কাজে এবং বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রচার ও প্রসারের কাজে লিপ্ত ছিল। ১৯৩৪ সালের ৫ ডিসেম্বর ধর্মঘটী পোর্ট ও ডক শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সাহায্য দানের জন্য জনগণের নিকট আবেদনের উদ্দেশ্যে রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে ইউথ লীগ, বেঙ্গল একটি মিটিং করে। ১৯৩৫ সালের ২১ জানুআরি ইউথ লীগ, বেঙ্গল-এর প্রধান উদ্যোগে "বেকার পরিষদ" ("Unemployed Council")-এর ডাকে

"লেনিন দিবস" উদ্‌যাপিত হয়। "লেনিন দিবস" পালনকে সফল করে তোলার ব্যাপারে ইউথ লীগ, বেঙ্গল-এর নিরলস প্রচেষ্টা ছিল।[২]

ইউথ লীগ, বেঙ্গল-এর উদ্যোগে ও আহ্বানে ১৯৩৪ সালের ২২, ২৯ ও ৩০ নভেম্বর এবং ১৮, ১৯, ২২, ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ্য গণ-সমাবেশ ও মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভাগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি'র শামসুল হুদা, বেঙ্গল লেবার পার্টি'র নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও প্রমোদ সেন (আদি পদবী সেনগুপ্ত হলেও সেন হিসাবেই অধিক পরিচিত), সাম্যরাজ পার্টি'র বাদল গাঙ্গুলী (বাদল গাঙ্গুলী লেবার পার্টি'র প্রকাশ্য মঞ্চটিরও অন্যতম সদস্য ছিলেন) এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতারা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ঐ সমাবেশগুলিতে কাস্তে-হাতুড়ি প্রতীকচিহ্নখচিত লাল পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল এবং লাল পতাকা নিয়ে মিছিল করা হয়েছিল। মিছিলে ও সমাবেশে "ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ", "লাল ঝাণ্ডা কি জয়", "মজদুর-কিষাণ হুকুমত কি জয়", "সরমাইদারি বরবাদ" প্রভৃতি জঙ্গী কমিউনিস্ট স্লোগান দেওয়া হয়েছিল। সমাবেশ-গুলিতে কমিউনিস্ট বক্তারা অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং ধর্মঘটী পোর্ট ও ডক শ্রমিকদের অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।[৩]

১৯৩৪ সালের ২৩ জুলাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'কে সারা ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু শুধু এতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সন্তুষ্ট থাকল না। ১৯৩৫ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন বাংলা সরকার একটি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে অত্যন্ত বিপজ্জনক বিবেচনায় বাংলাদেশের ১৩টি রাজনৈতিক ও শ্রমিক সংগঠনকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করল। অন্যতম প্রধান নিষিদ্ধ সংগঠন ছিল কমিউনিস্ট পার্টি'র কলকাতা কমিটি। ইউথ লীগ, বেঙ্গলও বাংলা সরকারের এই আদেশানুসারে বে-আইনী ঘোষিত হয়।[৪]

ছাত্র-যুব সংসদ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র কলকাতা কমিটির দুই নেতৃস্থানীয় সদস্য শামসুল হুদার ও সরোজ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ১৯৩৪ সালে কলকাতায় ছাত্র-যুব সংসদ নামে একটি কমিউনিস্ট মতাবলম্বী সংগঠনের জন্ম হয়। বাঁকুড়ার অভয় আশ্রম গ্রুপের জগদীশ পালিতও এই সংসদের অন্যতম নেতৃস্থানীয় সংগঠক ছিলেন। ইউথ লীগ, বেঙ্গল-এর মতই তার সমসাময়িক ও সহযোগী সংগঠন ছাত্র-যুব সংসদের অফিস ছিল ১৪৪, আমহার্স্ট স্ট্রীটে।

কমিউনিস্ট পার্টি'র কলকাতা কমিটিই ছাত্র-যুব সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করত। ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ইউথ লীগ, বেঙ্গল-এর সঙ্গে একযোগে ছাত্র-যুব সংসদ "বেকার সপ্তাহ" ("Unemployed week") পালন করে। এবং "বেকার পরিষদ" ("Unemployed Council") গঠন করে ইউথ লীগ, বেঙ্গল ও ছাত্র-যুব সংসদের

যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গণ-সমাবেশ ও মিটিংগুলিতে লাল পতাকা উত্তোলন করা হ'ত এবং জঙ্গী কমিউনিস্ট স্লোগান্ দেওয়া হ'ত। কমিউনিস্ট বক্তাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বক্তৃতার সুর থাকত অত্যন্ত আক্রমণাত্মক। ছাত্র-যুব সংসদের সদস্যরা ধর্মঘটী পোর্ট ও ডক্ শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য চাঁদা তোলার ব্যাপারে রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করেছিলেন।[৫]

১৯৩৫ সালের ৭ মার্চ অত্যন্ত বিপজ্জনক কমিউনিস্ট সংগঠন বিবেচনায় বাংলা সরকারের আদেশে নিষিদ্ধ ১৩টি সংগঠনের অন্যতম ছিল ছাত্র-যুব সংসদ।[৬]

লীগ এগেন্স্ট্ গান্ধীজ্‌ম্ (League Against Gandhism)

গান্ধীর ডাণ্ডি অভিযান শুরু হল ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ—সূত্রপাত ঘটল দেশব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ আইন-অমান্য আন্দোলনের। ৬ এপ্রিল ১৯৩০ ডাণ্ডির সমুদ্রতীরে গান্ধী লবণ আইন ভঙ্গ করলেন। সমস্ত রকম সাম্রাজ্যবাদী দমন-পীড়ন ও সন্ত্রাস অগ্রাহ্য করে আইন অমান্য আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু ১৯৩১ সালের ৫ মার্চ স্বাক্ষরিত হল গান্ধী-আরউইন চুক্তি। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গান্ধী-নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেস দেশের সর্বত্র আইন-অমান্য আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে তার আপসকামী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আরও একবার দিল দেশের মানুষকে, আরও একবার হতাশ করল মুক্তি আন্দোলনে সামিল দেশবাসীকে। ১৯৩২ সালের ৪ জানুআরি গান্ধী কারারুদ্ধ হলেন। গান্ধী কারারুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আইন-অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হল। আইন-অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন প্রথম পর্যায়ের মাত্রাকেও অনেক দূর ছাড়িয়ে গেল। তবুও স্বাধীনতাকামী জনগণ লড়াই ছাড়েন নি। পাশবিক সন্ত্রাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জাতীয় আন্দোলন চলল ১৯৩৩ সালের মে মাস পর্যন্ত প্রায় দেড় বছর, যদিও ১৯৩২ সালের শেষভাগ থেকেই আন্দোলনের তেজ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসতে থাকে। ১৯৩৩ সালের মে মাসে গান্ধীর পরামর্শে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি সাময়িকভাবে আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে গান্ধীর পরামর্শে কংগ্রেস গণ আইন-অমান্য আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করল। পরিবর্তে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। ১৯৩৪ সালের ৭ এপ্রিল তাঁর বিবৃতিতে গান্ধী এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহও প্রত্যাহারের কথা বললেন। ১৯৩৪ সালের মে মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহও প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আইন-অমান্য আন্দোলনের নিঃশর্ত পরিসমাপ্তি ঘোষণা করল। জুন মাসে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল। কংগ্রেস বৈধ সংগঠন হিসাবে স্বীকৃত হল।[৭] কিন্তু ১৯৩৪ সালের ২৩ জুলাই ব্রিটিশ সরকারের আদেশে কমিউনিস্ট পার্টি সারা ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষিত হল।

লীগ এগেন্স্ট্ গান্ধীজ্‌ম্ সম্পর্কে আলোচনার জন্য এই পটভূমিকাটি একান্ত প্রয়োজন।

১৯৩৪ সালের একদম গোড়ার দিকে (জানুআরি অথবা ফেব্রুআরি মাসে) সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের সাথে সাথেই গান্ধী-নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের আপসকামী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগী বঙ্কিম মুখার্জী (বঙ্কিম মুখার্জী ১৯৩৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন), বেঙ্গল লেবার পার্টি এবং অন্যান্য বামপন্থী দল সহ সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলি একযোগে গান্ধী বয়কট কমিটি নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এই গান্ধী বয়কট কমিটি ছিল সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও গান্ধী-নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসবিরোধী বামপন্থী শক্তিগুলির সম্মিলিত মঞ্চ। কয়েকটি ঘরোয়া মিটিং-এর পর একটি সভায় গান্ধী বয়কট কমিটি নাম পরিবর্তন করে সংগঠনটির নাম রাখা হয় লীগ এগেন্স্‌ট্‌ গান্ধীজ্‌ম্‌ (League Against Gandhism) বা গান্ধীবাদবিরোধী সংঘ। আইন-অমান্য আন্দোলনের নিঃশর্ত প্রত্যাহার, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস প্রচেষ্টা, বিপ্লবী রাজবন্দী ও আন্দামান বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নে নীরবতা প্রভৃতি কারণে গান্ধীর তীব্র সমালোচনার ও গান্ধী-বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গেই লীগ এগেন্স্‌ট্‌ গান্ধীজ্‌ম্‌ বা গান্ধীবাদবিরোধী সংঘ একেবারে গান্ধীবাদের মূল নীতিসমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।[৮] লীগ এগেন্স্‌ট্‌ গান্ধীজ্‌ম্‌-এর তৎকালীন সংগঠকদের বক্তব্য অনুযায়ী ব্যক্তি গান্ধীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নয়, গান্ধী-দর্শনের "সামন্ততান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রে"র বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই এই সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছিল।[৯] কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সরোজ মুখোপাধ্যায় গান্ধী বয়কট কমিটির সম্পাদক হন। সংগঠনটির নাম পরিবর্তিত হয়ে লীগ এগেন্স্‌ট্‌ গান্ধীজ্‌ম্‌ হওয়ার পরও সরোজ মুখোপাধ্যায়ই সম্পাদক ছিলেন।[১০] আব্দুল হালিম এই গান্ধীবাদবিরোধী সংঘ গড়ে তোলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।[১১] উপরোক্ত দুজন এবং রণেন সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, বঙ্কিম মুখার্জী, শামসুল হুদা, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, কমল সরকার প্রমুখ কমিউনিস্ট পার্টির ও বেঙ্গল লেবার পার্টির প্রথম সারির নেতারা ছাড়াও লেবার পার্টির কমিউনিস্ট সদস্য ও পরবর্তীকালের ইউথ লীগ, বেঙ্গল-এর সভাপতি অজিত দাসগুপ্ত লীগ এগেন্স্‌ট্‌ গান্ধীজ্‌ম্‌ গঠনের ও এই সংঘের কাজকর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন।[১২] ১৯৩৪ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে লীগ এগেন্স্‌ট্‌ গান্ধীজ্‌ম্‌-এর ডাকে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি গান্ধীবিরোধী বিক্ষোভ-সমাবেশ, মিটিং ও মিছিল হয়।

কমিউনিস্ট লীগ অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নেতা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তীব্র গান্ধীবিরোধী হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন, কিন্তু কিছু মতপার্থক্যের কারণে তিনি এই লীগ এগেন্স্‌ট্‌ গান্ধীজ্‌ম্‌-এ যোগ দেন নি। অবশ্য তিনি লীগের কাজকর্মে সহযোগিতা করতেন এবং লীগের জনসভায় সভাপতিত্বও করেছেন। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের **সাম্রাজ্যবাদবিরোধীই কংগ্রেসবিরোধী** নামক পুস্তিকার মূল বক্তব্যই ছিল—"বর্তমান সময়ে গান্ধীবাদ বিরোধিতাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা"।[১৩]

১৯৩৪ সালের ২৭ ফেব্রুআরি গান্ধী কলকাতায় আসবেন বলে ঠিক ছিল।

গান্ধীবাদবিরোধী সংঘ স্থির করে, গান্ধী কলকাতায় এলে তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। এই উপলক্ষে ৫ ফেব্রুআরি ১৯৩৪ কলকাতার অ্যালবার্ট হলে গান্ধী বয়কট কমিটির (তখনও লীগ এগেন্স্ট্ গান্ধীজ্‌ম্ নাম হয় নি) উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ক্যালকাটা পোর্ট্ অ্যাণ্ড্ ডক্ ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়নের সভাপতি শের খানের (বেঙ্গল লেবার পার্টি) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় প্রধান বক্তা ও প্রস্তাব উত্থাপক ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী। সোমনাথ লাহিড়ীর প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেন বঙ্কিম মুখার্জী ও ধরণী গোস্বামী। তাঁরা ছাড়াও সরোজ মুখার্জী, রজনী মুখার্জী, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রমুখ বক্তৃতা করেন। ঐ সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়: "এই সভা গান্ধীবাদকে ভারতের জমিদার ধনী কলওয়ালাদের মতবাদ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্তম্ভস্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে এবং আরো বলিতেছে যে গান্ধীবাদ ভারতের শোষিত শ্রমিক ও কৃষকদের প্রকৃত স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় শত্রু।"[১৪]

গান্ধীকে ও গান্ধীবাদকে তীব্র আক্রমণ করে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক মুখপত্র **মার্ক্স্‌পন্থী** পত্রিকায় (প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৪০) 'গান্ধীর কলিকাতা আগমন' শীর্ষক প্রবন্ধে সোমনাথ লাহিড়ী লিখলেন, "গান্ধীবাদ বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সহিত সমসূত্রে ভারতের জমিদারী সামন্ত প্রথাকে ও ধন সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষার জন্য ব্যস্ত। ভারতীয় বুর্জোয়া স্বার্থসিদ্ধির আন্দোলনে জয়লাভ করিবার জন্য শোষকশ্রেণীর হৃদয়ের পরিবর্তন, অহিংসা, সত্য, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রভৃতির ধাপ্পা দিয়া গণশ্রেণীকে অধীনে রাখিবার জন্যই গান্ধীবাদের জন্ম। গান্ধীবাদ ভারতের প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতা, শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর মুক্তির প্রধান শত্রু। গান্ধীবাদ শোষিত, বঞ্চিত, সর্বহারা গণশ্রেণীর নিকট আফিমের নেশা।"[১৫] প্রবন্ধটিতে লেখা হল—"কিন্তু শুধু গান্ধীকে বয়কট করিলেই আমাদের কর্তব্য সমাধা হইবে না। গান্ধীবাদ যে সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক, যে ধনিক-শ্রেণীর দর্শন, সেই বিষম হানিকর গান্ধীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আজ আমাদের তীব্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে।...

গান্ধীবাদের মোহগ্রস্ত বিপ্লবী যুবকগণকে আমাদের নিবেদন, তাঁহারা দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া বস্তুবাদীর দৃষ্টিতে অকল্যাণকর গান্ধীকে বুঝিতে চেষ্টা করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে বিনষ্ট করার সঙ্কল্প লইয়া মজুরশ্রেণীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিন।"[১৬]

সেবার শেষ পর্যন্ত গান্ধীর কলকাতায় আসা স্থগিত হয়ে গেল। সেই প্রসঙ্গে মার্ক্স্‌পন্থী পত্রিকায় লেখা হল—"বাংলায় গান্ধী আসুক আর নাই আসুক, গান্ধীবাদ যে বিশ্বাসঘাতকতার জাল রচনা করে শোষিতদের হাত-পা বেঁধে রেখেছে সেই জালকে ছিঁড়ে ফেলতেই হবে। গান্ধীকে বয়কট করার জন্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভিত্তিতে কলিকাতায় যে কমিটি হয়েছে তার কাজ গান্ধী কলিকাতায় আসা বা না আসার উপর নির্ভর করে না। তার কাজ বরাবর চলতে থাকবে তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবার জন্য।"[১৭]

গান্ধীর কলকাতায় আসার পরবর্তী দিন ধার্য হয় ২১ জুলাই ১৯৩৪। এপ্রিল মাস

থেকে লীগ এগেন্স্‌ট্‌ গান্ধীজ্‌ম্‌-এর (তখন এই নাম হয়ে গেছে) কাজকর্মে নতুন জোয়ার আসে। ১৯৩৪ সালের ২৫ এপ্রিল কলকাতার অ্যালবার্ট হলে লীগ এগেন্স্‌ট্‌ গান্ধীজ্‌ম্‌ (গান্ধীবাদ-বিরোধী সংঘ)-এর ডাকে এই দফায় প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১৮] এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আনুষ্ঠানিকভাবে লীগের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত না হলেও গান্ধী-বিরোধিতার কারণে লীগের মিটিং-এ সভাপতিত্ব করেছেন। গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে প্রচারের উদ্দেশ্য এবং গান্ধীর কলকাতা আগমনের সময় তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে সভা আহূত হয়েছিল। এই সভায় সোমনাথ লাহিড়ী, সরোজ মুখার্জী, আব্দুল হালিম, বঙ্কিম মুখার্জী প্রমুখ বক্তৃতা দেন। সরোজ মুখার্জী তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, ধনতন্ত্রের সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত স্বাধীনতা আসা সম্ভব নয়। সভায় বোম্বাইতে শ্রমিক ধর্মঘটে শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয় এবং গাড়ওয়ালি সৈন্যদের মুক্তি দাবি করা হয়। সভায় কলকাতায় দিয়াশলাই মজুরদের লড়াইতে তাঁদের বীরত্বের প্রশংসা করে এবং গান্ধীবাদকে "ভারতের গণশ্রেণীর মুক্তির শত্রু" হিসাবে ঘোষণা করে প্রস্তাব পাস করা হয়।[১৯]

১৯৩৪ সালের ১০ মে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জালালুদ্দিন হাসেমীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় রণেন সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, শামসুল হুদা, গেন্দা সিং প্রমুখের নেতৃত্বে গান্ধীবাদ-বিরোধী সংঘের একটি মিছিল উপস্থিত হয়। ঐ মিছিলের তরফ থেকে "গান্ধীবাদ ধ্বংস হোক" স্লোগান দেওয়া হয়। রণেন সেন ও সোমনাথ লাহিড়ী "ব্রিটিশরাজ বরবাদ" ধ্বনি দিয়ে বক্তৃতা দেন।[২০]

১৯৩৪ সালের ১১ মে কলকাতার হাজরা পার্কে প্রতাপ চন্দ্র গুহরায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গান্ধীজীর সংবর্ধনা সমিতির জনসভায় গান্ধীবাদ-বিরোধী সংঘের তরফ থেকে "ধনিকের দালাল কংগ্রেস ও গান্ধীবাদ ধ্বংস হোক্" স্লোগান্ তোলা হয়।[২১] ঐ সভায় "গান্ধীজী কলকাতায় এলে তাঁকে কালো পতাকা দেখানো হোক্"—এই মর্মে একটি লিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করে রণেন সেন বক্তৃতা দিতে থাকেন। ফলে কংগ্রেসীদের সঙ্গে সংঘের সদস্যদের ধস্তাধস্তি হতে থাকে। পুলিশ সভা বে-আইনী ঘোষণা করে।[২২] আলিপুর কোর্টের পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট এল. কে. সেনের রায়ে (১৯৩৪ সালের ৩ অক্টোবর এই রায় দেওয়া হয়) বাদল গাঙ্গুলী, প্রমোদ সেন, মনোরঞ্জন সুর, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, কমল সরকার, রণেন সেন, আব্দুল হালিম, বিপিন চক্রবর্তী, সরোজ মুখার্জী ও সোমনাথ লাহিড়ী—গান্ধীবাদ-বিরোধী সংঘের এই দশ জন প্রথম সারির নেতার দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়।[২৩]

১৯৩৪ সালের ১৭ মে গান্ধী-বিরোধী প্রচারপত্র বিলির অপরাধে পুলিস বিতর্কিত শ্রমিক নেতা এ. এম. এ. জামানকে গ্রেফ্‌তার করে।[২৪]

১৯৩৪ সালের ১৪ জুলাই লীগ এগেন্স্‌ট্‌ গান্ধীজ্‌ম্‌-এর ডাকে কলকাতায় অ্যালবার্ট হলে আবার একটি জনসভা হয়। ঐ জনসভায় সভাপতিত্ব করেন

বঙ্কিম মুখার্জী। কমিউনিস্ট পার্টির ও বেঙ্গল লেবার পার্টির প্রথম সারির নেতারা ছাড়াও রজনী মুখার্জী প্রমুখ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামীরা এবং অন্যান্য শ্রমিক নেতারাও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই জনসভার কয়েকদিন আগেই সোমনাথ লাহিড়ী ধর্মঘটের সমর্থনে ইস্তাহারে প্রকাশের ও রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত হয়ে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রেরিত হয়েছেন। ঐ জনসভায় "গান্ধীজীর ক্রিয়াকলাপ, মতবাদ, জাতীয় আন্দোলনের প্রতি 'বিশ্বাসঘাতকতা,' বন্দীমুক্তির ব্যাপারে মৌনতা প্রভৃতির নিন্দা করে তাঁকে কলকাতায় অবস্থানকালে কালো পতাকা দেখানো হোক"[২৫]—এই মর্মে রণেন সেন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বক্তৃতা করেন। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার রণেন সেনের প্রস্তাব সমর্থন করেন, কিন্তু রজনী মুখার্জী ও তাঁর অনুগামীরা বলেন যে, গান্ধীবাদের নিন্দা না করে শুধু বন্দীমুক্তির দাবিটাই করা হোক্।[২৬] ফলে বচসা শুরু হয়। সভায় গোলমাল হতে থাকায় পুলিস সভা বে-আইনী ঘোষণা করে। এবার পুলিসের সঙ্গে লীগের নেতৃবৃন্দের তুমুল বচসা শুরু হয়। এই বচসা ও গোলমাল উপলক্ষ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের প্রচণ্ড দমন নীতি নেমে আসে গান্ধীবাদ-বিরোধী সংঘের উপর।[২৭] বঙ্কিম মুখার্জী, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার আব্দুল হালিম, শামসুল হুদা, রণেন সেন, সরোজ মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন রায়, কমল সরকার, নিত্যানন্দ চৌধুরী, রজনী মুখার্জী প্রমুখ ২১ জন সংঘের নেতাকে গ্রেফ্‌তার করে পুলিস তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করে। এই মামলাই পরে বিখ্যাত "অ্যালবার্ট্‌ হল কেস" নামে অভিহিত হয়।[২৮] দু'মাস মামলা চলার পর ম্যাজিস্ট্রেট সুকুমার সেন তাঁর বিখ্যাত রায়ে পুলিসের আচরণের সমালোচনা করে তীব্র ভৎর্সনা করেন এবং ধৃত সকলকে বিনাশর্তে মুক্তি দেন। এই মামলায় মুক্তি পেলেও সংঘের নেতারা হাজরা পার্কের মামলায় কারারুদ্ধ হন।[২৯]

১৯ জুলাই ১৯৩৪ গান্ধীবাদ-বিরোধী সংঘের ডাকে আরও একটি গান্ধী-বিরোধী বিক্ষোভ-সমাবেশ হয়। ক্যালকাটা পোর্ট্‌ অ্যাণ্ড ডক্ ওয়ার্কার্স্‌ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শিশির রায়ের (বেঙ্গল লেবার পার্টি) নেতৃত্বে পোর্ট ও ডক্ শ্রমিকরা খিদিরপুর থেকে ময়দানের মনুমেন্ট পর্যন্ত গান্ধীবিরোধী এক বিক্ষোভ-মিছিলে সামিল হন। ঐ দিনই সন্ধ্যায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গান্ধী-বিরোধী এক বিক্ষোভ-মিটিং হয়। ঐ মিটিং-এ "পূর্ণ স্বাধীনতা"র লক্ষ্য এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এবং সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শ্রমিক আন্দোলন দমন করার জন্য গান্ধী-নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব পাস করা হয়।[৩০]

২১ জুলাই ১৯৩৪ গান্ধীবাদ-বিরোধী সংঘের ডাকে আবার গান্ধী-বিরোধী বিক্ষোভ-মিছিল ও সমাবেশ হয়। ঐ দিনই দেশবন্ধু পার্কে গান্ধীজীর সংবর্ধনা সভায় লীগ এগেন্‌স্ট্‌ গান্ধীজম্‌-এর সদস্যরা গান্ধী-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং ইস্তাহার বিলি করেন। ২১ জুলাই ১৯৩৪ যখন কমিউনিস্ট পার্টির ধরমবীর সিং-এর নেতৃত্বে গান্ধীবাদ-বিরোধী সংঘের সদস্যরা বিক্ষোভ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মিছিল করে দেশবন্ধু পার্কে

গান্ধীজীর সংবর্ধনা সভায় এসে উপস্থিত হন, তখন গান্ধীজী সভাস্থল ত্যাগ করে চলে গেছেন। সংঘের সদস্যরা সভাস্থলে কমিউনিস্ট পার্টি'র কলকাতা কমিটির সাইক্লোস্টাইল করা ইস্তাহার (ইস্তাহারের তারিখ ছিল ২০ জুলাই ১৯৩৪) বিলি করেন। ঐ ইস্তাহারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, তার তল্পিবাহক পুলিস ও পুঁজিবাদকে তীব্র আক্রমণ করে জনগণকে কমিউনিস্ট পার্টি'র নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানানো হয়। ইস্তাহারে বলা হয়, একমাত্র সশস্ত্র গণবিপ্লবের মাধ্যমেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদকে ধ্বংস করা সম্ভব। ইস্তাহারের শেষে "গান্ধীবাদ নিপাত যাক্," "ব্রিটিশ-রাজ ধ্বংস হোক্", "কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হও," "সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হও" প্রভৃতি স্লোগান্ লেখা ছিল।[৩১]

সারা ১৯৩৪ সাল ধরেই লীগ এগেন্স্ট্ গান্ধীজ্‌ম্ সক্রিয় ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক ইংরেজি মুখপত্র *Ganashakti* (Vol. 1, No. 2, October, 1934) পত্রিকায় লীগ এগেন্স্ট্-এর গান্ধীজম্-এর সম্পাদক-এর তরফে আহ্বান জানিয়ে লেখা হয়—Socialist-minded Youths, National revolutionaries! Break away from the clutches of the treacherous leadership of the Indian National Congress and Congress Socialist Party and join the fight against constitution through the League Against Gandhism under the leadership of the working class who is the most unflinching and successful leader of the National Struggle, and help in the creation of a strong anti-imperialist bloc, to fight for national emancipation."[৩২]

১৯৩৪ সালের শেষাশেষি লীগ এগেন্স্ট্ গান্ধীজ্‌ম্-এর কাজকর্মের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি ঘটে। এই প্রসঙ্গে আমি সরোজ মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি: "আমাদের উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, গান্ধীবাদ-বিরোধী সংঘ একটা সাময়িক ব্যাপার, বর্তমানে গান্ধী নেতৃত্বের সমালোচনার প্রয়োজন বলে আমরা একত্রে এইভাবেই কর্মসূচী নিয়েছি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের মধ্যেও আছে, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের মধ্যে আছে, আর কমিউনিস্ট পার্টির তো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন বৈপ্লবিক সংগ্রামের কর্মসূচী রয়েছে।"[৩৩]

১৯৩৬ সালের জানুআরি মাসে লীগ এগেন্স্ট্ গান্ধীজ্‌ম্‌কে পুনরুজ্জীবিত করার একটা প্রচেষ্টা করা হয়। এই প্রচেষ্টায় এবার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা ছিলেন না। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা "যুক্ত ফ্রন্ট" তত্ত্ব অনুযায়ী কংগ্রেসে প্রবেশ করে কংগ্রেসকেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের মূল ও প্রকাশ্য মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করে কাজ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এই প্রচেষ্টায় স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের সায় ছিল না। প্রধানত বেঙ্গল লেবার পার্টি'র সদস্যরাই এবার লীগ এগেন্স্ট্ গান্ধীজ্‌ম্‌কে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা চালান।

এই প্রয়াসে তাঁরা সঙ্গী হিসাবে পান সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কমিউনিস্ট লীগকে। বেঙ্গল লেবার পার্টি'র ও কমিউনিস্ট লীগের সদস্যদের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯৩৬ সালের ৩ জানুআরি থেকে ২৬ জানুআরি বিভিন্ন মিটিং হয়। ১৯৩৬ সালের ২৬ জানুআরি লীগ এগেন্স্ট্ গান্ধীজ্‌ম্-এর উদ্যোগে কংগ্রেস-বিরোধী বিক্ষোভ-সমাবেশ হয়। এই বিক্ষোভ-সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, শিশির রায় প্রমুখ।[৩৪] এই মিটিং-এর পরই লীগের কাজকর্মের উপর আবার যবনিকা নেমে আসে।

ইয়ং কমিউনিস্ট পার্টি ও অজিত দাসগুপ্তের গোপন কমিউনিস্ট গ্রুপ

যশোর-খুলনা যুব সংঘের প্রাক্তন সদস্য কালিপদ বসুর প্রচেষ্টায় ১৯৩৬ সালের জানুআরি মাসের গোড়ার দিকে ইয়ং কমিউনিস্ট পার্টি নামে একটি নতুন কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে ওঠে। ইয়ং কমিউনিস্ট পার্টি নামে এই কমিউনিস্ট গ্রুপের প্রধান দুই নেতা ছিলেন কালিপদ বসু ওরফে রণজিৎ রায়চৌধুরী ও রমণী চক্রবর্তী। রণজিৎ রায়চৌধুরী ছদ্মনামেই কালিপদ বসু এই যুগে রাজনৈতিকভাবে অধিক পরিচিত ছিলেন। ইয়ং কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রধান কর্মস্থল ছিল স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা। কলকাতায় তালতলা, চিৎপুর ও খিদিরপুর অঞ্চলেই এই গ্রুপ বেশি সক্রিয় ছিল। কলকাতার এই অঞ্চলগুলিতে শাখা খোলা ছাড়াও হাওড়া শহর, ঘুসুড়ী, বালি এবং জামশেদপুরেও ইয়ং কমিউনিস্ট পার্টি শাখা খুলতে সক্ষম হয়। ইয়ং কমিউনিস্ট পার্টি'র অফিস ছিল ২০৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে। এখানেই অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসেরও (এ. আই. টি. ইউ. সি.) অফিস ছিল। ৫২, কৈলাস বসু স্ট্রীটে এই গ্রুপের প্রায়শই মিটিং হ'ত। বেঙ্গল লেবার পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে অজিত দাসগুপ্ত যে গোপন কমিউনিস্ট গ্রুপ গঠন করেন, তার সঙ্গে ইয়ং কমিউনিস্ট পার্টি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ করত। প্রাক্তন যুগান্তর দলের খগেন রাউথের মাধ্যমে ইয়ং কমিউনিস্ট পার্টি'র সঙ্গে জাতীয় বিপ্লববাদীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ইয়ং কমিউনিস্ট পার্টি প্রধানত শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের কাজেই লিপ্ত ছিল। ইয়ং কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বাস করত সশস্ত্র গণসংগ্রামে। পুলিসের অভিযোগ অনুযায়ী ইয়ং কমিউনিস্ট পার্টি অস্ত্রসংগ্রহের কাজও চালাত। যথারীতি পুলিসের তরফ থেকে এই গ্রুপকে "কমিউনিস্ট-টেররিস্ট" বা "টেরো-কমিউনিস্ট" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৩৬ সালের ফেব্রুআরি মাসে কমিউনিস্ট পার্টি'র স্বতীশ (মাণিক) ব্যানার্জীর সঙ্গে ইয়ং কমিউনিস্ট পার্টি'র যোগাযোগ স্থাপিত হয়, যদিও এই যোগাযোগ বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। ১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি এই গ্রুপ বিলুপ্ত হয়।[৩৫]

ইয়ং কমিউনিস্ট পার্টি'র পাশাপাশিই অজিত দাসগুপ্তের গোপন কমিউনিস্ট গ্রুপের উল্লেখ করা প্রয়োজন। বেঙ্গল লেবার পার্টি'র অন্যতম নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট সদস্য অজিত দাসগুপ্ত মতবিরোধের কারণে ১৯৩৫ সালের শেষাশেষি লেবার পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে এসে একটি গোপন কমিউনিস্ট গ্রুপ গঠন করেন। এই গ্রুপ ইয়ং কমিউনিস্ট পার্টি'র

সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করত। অজিত দাসগুপ্তের এই গোপন কমিউনিস্ট গ্রুপ বেঙ্গল লেবার পার্টি রিভোল্টিং গ্রুপ বলে পরিচিত ছিল। এই রিভোল্টিং গ্রুপের প্রধান সদস্যরা ছিলেন অজিত দাসগুপ্ত, নেপাল ভট্টাচার্য, সুবোধ দাসগুপ্ত, হীরেন চ্যাটার্জী ও শচীশ চক্রবর্তী (কুমিল্লা)। বেঙ্গল লেবার পার্টির সুশীল চ্যাটার্জীও অজিত দাসগুপ্তের কমিউনিস্ট গ্রুপের কাজকর্মের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। অজিত দাসগুপ্তের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বেঙ্গল লেবার পার্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে কাজ করে সেগুলি ভিতর থেকে দখল করা। এই কাজে অজিত দাসগুপ্তের প্রধান সহায় ছিলেন সুশীল চ্যাটার্জী। সুশীল চ্যাটার্জীর ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্মের প্রধান ক্ষেত্র ছিল বালিগঞ্জের হুকুমচাঁদ (পরে নাম হয় ভার্তিয়া) ইলেকট্রিক স্টীল্ অ্যাণ্ড্ আয়রন্ কোম্পানি এবং কিছুটা পরিমাণে ম্যাকিন্টস্ বার্ন্। উল্টাডাঙ্গা জুট মিলসেও অজিত দাসগুপ্তের কমিউনিস্ট গ্রুপের সদস্যরা এবং ইয়ং কমিউনিস্ট পার্টির রমণী চক্রবর্তী ও অন্যরা একত্রে ট্রেড ইউনিয়ন শুরু করেন। অজিত দাসগুপ্তের কমিউনিস্ট গ্রুপের নেপাল ভট্টাচার্য দীর্ঘদিন ধরেই কলকাতার পোর্ট্ ও ডক্ শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করতেন। এই কমিউনিস্ট গ্রুপের তরফ থেকে তিনি পোর্ট্ ও ডক্ শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ভিত্তিক সাধারণ ধর্মঘটের প্রচেষ্টা চালান।[৩৬] ১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি ওয়ার্কাস্ লীগ গঠনে এই গ্রুপের সদস্যরাই সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিলেন।

ওয়ার্কার্স্‌ লীগ (Workers' League)

ওয়ার্কাস্ লীগ (Workers' League) শ্রমিক আন্দোলনে তার ভূমিকার ও গুরুত্বের কারণে নিঃসন্দেহে একটি পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দাবি রাখে। এই দাবির যথার্থতা সত্ত্বেও আমি বর্তমান নিবন্ধে ওয়ার্কাস্ লীগের কোনও বিস্তারিত বিবরণে যাচ্ছি না, কেবলমাত্র তিরিশের দশকের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনে আমি এই সংগঠনটির উল্লেখ করছি।

১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি অজিত দাসগুপ্তের কমিউনিস্ট গ্রুপ ও ইয়ং কমিউনিস্ট পার্টির মিলিত প্রচেষ্টায় একত্রে নতুন কমিউনিস্ট সংগঠন হিসাবে ওয়ার্কার্স্ লীগ (Workers' League) গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠাকালে ওয়ার্কার্স্‌ লীগের সভাপতি ছিলেন অজিত দাসগুপ্ত, সহ-সভাপতি ছিলেন রতিকান্ত সরকার, সম্পাদক ছিলেন রমণী চক্রবর্তী (ইয়ং কমিউনিস্ট পার্টি) এবং সহ-সম্পাদক ছিলেন জীবন ব্যানার্জী। ওয়ার্কার্স্‌ লীগের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য নেপাল ভট্টাচার্য (পোর্ট্ ও ডক্ শ্রমিক নেতা) পরে সাময়িককালের জন্য লীগের সভাপতি হন। মাঝে কিছু সময়ের জন্য প্রখ্যাত শ্রমিকনেত্রী ডঃ প্রভাবতী দাসগুপ্তা এই সংগঠনের সভানেত্রী (প্রেসিডেন্ট্) হয়েছিলেন, কিন্তু ১৯৩৭ সালের দ্বিতীয় সারা বাংলা চটকল শ্রমিক ধর্মঘটের ঠিক পরেই তাঁর সঙ্গে ওয়ার্কার্স্‌ লীগের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং সমস্ত সংস্রব ছিন্ন হয়।[৩৭] নাম থেকেই পরিষ্কার যে, ওয়ার্কার্স্‌ লীগ প্রধানত শ্রমিক আন্দোলনেই সক্রিয় ছিল। নেপাল ভট্টাচার্যের মাধ্যমে

পোর্ট্‌ ও ডক্‌ শ্রমিকদের মধ্যে ওয়ার্কার্স্‌ লীগের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ওয়ার্কার্স্‌ লীগের নেতৃত্বাধীন পোর্ট্‌ ও ডক্‌ শ্রমিকদের ইউনিয়নের নাম ছিল ক্যালকাটা পোর্ট্‌ ট্রাস্ট এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশন (সি. পি. টি. ই. এ.)। এই ইউনিয়নটির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন নেপাল ভট্টাচার্য।[৩৮] নেট ওয়ার্কার্স্‌ ইউনিয়নও সম্পূর্ণভাবে ওয়ার্কার্স্‌ লীগেরই নিয়ন্ত্রাধীন ছিল।[৩৯] এই ইউনিয়নের সম্পাদক ছিলেন রতিকান্ত সরকার।[৪০] এই দুটি প্রধান ইউনিয়ন ছাড়াও ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড্‌ মেটাল ওয়ার্কার্স্‌ ইউনিয়ন, মোটর ওয়ার্কার্স্‌ ইউনিয়ন, প্রেস ওয়ার্কার্স্‌ ইউনিয়ন, রিক্সা-পুলার্স্‌ ইউনিয়ন প্রভৃতিতেও ওয়ার্কার্স্‌ লীগের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। দ্বিতীয় সারা বাংলা চটকল শ্রমিক ধর্মঘটে (১৯৩৭) লীগের সদস্যরা যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে লীগ কৃষক আন্দোলনেও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা চালাতে থাকে। প্রধান কর্মক্ষেত্র কলকাতা ছাড়া যশোর ও খুলনা জেলাতেও লীগ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। ২/এ, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে ওয়ার্কার্স্‌ লীগের অফিস ছিল। ১৯৩৬ সালেই অজিত দাসগুপ্ত দিল্লীর ওয়ার্কার্স্‌ লীগের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হন। এই যোগাযোগ বাংলার ওয়ার্কার্স্‌ লীগকে আরও কিছুটা শক্তি যোগায়।[৪১] চল্লিশের দশকেও ওয়ার্কার্স্‌ লীগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় ছিল।

উপসংহার

বর্তমান নিবন্ধে স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্বের বিচারে আলোচনার সর্বাধিক জায়গা জুড়ে আছে লীগ এগেন্স্‌ট্‌ গান্ধীজ্‌ম্‌। নিঃসন্দেহে লীগ এগেন্স্‌ট্‌ গান্ধীজ্‌ম্‌ ছিল কমিউনিস্ট পার্টির ও অন্যান্য কমিউনিস্ট গ্রুপের তৎকালীন "বাম-সংকীর্ণতাবাদী" রাজনীতির ফসল, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির ও অন্যান্য কমিউনিস্ট গ্রুপের সেই যুগে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতায় কোনও খাদ ছিল না। এই নিখাদ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমস্ত রকম আপস-প্রচেষ্টার বিরোধিতারই প্রকাশ ঘটে লীগ এগেন্স্‌ট্‌ গান্ধীজ্‌ম্‌ গঠনের মধ্য দিয়ে। এখানেই লীগ এগেন্স্‌ট্‌ গান্ধীজ্‌ম্‌ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা।

সূত্রনির্দেশ :

১. Home / Poll. / F. NO. 7/20/1934 & K. W., Serial Nos. 1-4 ; Subodh Roy (ed.), *Communism in India : Unpublished Documents*, (Volume 1), (1925-1934), National Book Agency, Calcutta, 1980, pp. 421-22.

২. Home / Poll. / F. No. 7/20/1934 & K. W., Serial Nos. 1-4 ; Subodh Roy (ed.), op. cit., p. 422.

৩. Home / Poll. / F. No. 7/20/1934 & K. W., Serial Nos. 1-4 ; Subodh Roy (ed.), op. cit., p. 422.

৪. Home / Poll. / F. No. 24/15/1935 ; I.B., File No. 929/1935 ;

Panchanan Saha, 'The Communist Movement in India : The Formative Period,' *Problems of National Liberation*, Vol. IV, No. 1, December, 1980, Calcutta, p. 46.

৫. Home/Poll./F. No. 7/20/1934 & K. W., Serial Nos. 1-4 ; Subodh Roy (ed.), op. cit., pp. 422-23.

৬. Home/Poll./ /F. No. 24/15/1935 ; I. B., File No. 929/1935 ; Panchanan Saha, op. cit., *P. N. L.*, p. 46.

৭. আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের এবং গান্ধীর ভূমিকার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, R. Palme Dutt, *India To-day*, Manisha, Calcutta, June, 1979, pp. 361-81 ; E. M. S. Namboodiripad, *A History of Indian Freedom Struggle*, Social Scientist Press, Trivandrum, 1986, pp. 396-505 ; A. R. Desai, *Social Background of Indian Nationalism*, Popular Prakashan, Bombay, 1982, pp. 362-72 ; Hirendranath Mukerjee, *India's Struggle for Freedom*, National Book Agency, Calcutta, November, 1962, pp. 178-93 ; Sumit Sarkar, *Modern India : 1885-1947*, Macmillan India Limited, Madras, 1986, pp. 284-3.0 ; Bipan Chandra, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, K. N. Panikkar and Sucheta Mahajan, *India's Struggle for Independence* : 1857-1947, Penguin Books (India) Limited, New Delhi, 1989, pp. 270-95.

৮. রণেন সেন, বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০-'৪৮), বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, মে, ১৯৮১, পৃ ১৬-১৭ ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, প্রথম খণ্ড (১৯৩০-১৯৪১), গণশক্তি পত্রিকা দপ্তর, কলকাতা, মে, ১৯৮৫, পৃ ১৯ ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, 'কমরেড আব্দুল হালিম', নবজীবনের পথে : আব্দুল হালিমের রচনা-সংকলন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৬৬, পৃ ২২ ; মনোরঞ্জন রায়, 'কমরেড আব্দুল হালিম স্মরণে', নবজীবনের পথে : আব্দুল হালিমের রচনা-সংকলন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৯ ; Tanika Sarkar, *Bengal : 1928-1934 : The Politics of Protest*, Oxford University Press, New Delhi, 1987, p. 166 ; Horace Williamson, *India and Communism*, (With an introduction and explanatory notes by Mahadevaprasad Saha), Editions Indian, Calcutta, 1976, p. 195.

এখানে উল্লিখিত মনোরঞ্জন রায় বর্তমান সি. পি. আই. (এম) নেতা মনোরঞ্জন রায় নন। এই মনোরঞ্জন রায় তিরিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির ও লীগ

এগেনস্ট্ গান্ধীজম্-এর অন্যতম নেতৃস্থানীয় সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টি'র মুখপত্র গণশক্তি-র প্রকাশক ও মুদ্রক এবং ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত নব পর্যায়ের গণশক্তি-র সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক ছিলেন। এই কারণে কমিউনিস্ট পার্টি মহলে তিনি মনোরঞ্জন রায় (গণশক্তি) বলে পরিচিত ছিলেন। পার্টি দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর মনোরঞ্জন রায় সি. পি. আই. (এম)-এ যোগ দেন।

৯. লেখকের সঙ্গে নন্দলাল বসুর সাক্ষাৎকার—১৭. ৬. ১৯৮৬। বেঙ্গল লেবার পার্টি'র অন্যতম নেতৃস্থানীয় সদস্য নন্দলাল বসু লীগ এগেনস্ট্ গান্ধীজম্-এও যোগ দিয়েছিলেন। তিরিশের ও চল্লিশের দশকে নন্দলাল বসু প্রথমে বেঙ্গল লেবার পার্টি'র এবং পরে কমিউনিস্ট পার্টি'র অন্যতম নেতা হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন।

১০. সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৭৯।

১১. সরোজ মুখোপাধ্যায়, 'কমরেড আব্দুল হালিম,' নবজীবনের পথে, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২২ ; মনোরঞ্জন রায়, 'কমরেড আব্দুল হালিম স্মরণে,' নবজীবনের পথে, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৯।

১২. লেখকের সঙ্গে নন্দলাল বসুর সাক্ষাৎকার—১৭.৬.১৯৮৬।

১৩. Tanika Sarkar, op. cit., p. 166 ; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৭৭।

১৪. মার্ক্স-পন্থী, আব্দুল হালিম সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৪০ বাংলা সন (বা. স.), ফেব্রুআরি, ১৯৩৪, পৃ ১২২-২৩।

১৫. 'গান্ধীর কলিকাতা আগমন,' মার্ক্স-পন্থী, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১০২ ; সোমনাথ লাহিড়ী, 'গান্ধীর কলিকাতা আগমন,' সোমনাথ লাহিড়ী রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (১৯৩১-১৯৪৫), মনীষা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫, পৃ. ১৪৬। মার্ক্স-পন্থী পত্রিকাটিতে লেখক হিসাবে সোমনাথ লাহিড়ীর নামের উল্লেখ নেই, কিন্তু সোমনাথ লাহিড়ীর রচনা হিসাবে প্রবন্ধটি সোমনাথ লাহিড়ী রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আমি লেখক হিসাবে সোমনাথ লাহিড়ীর উল্লেখ করেছি।

১৬. মার্ক্স-পন্থী, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১০৩ ; সোমনাথ লাহিড়ী রচনাবলী, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৪৭-৪৮।

১৭. মার্ক্স-পন্থী, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১০৭।

১৮. মার্ক্স-পন্থী, আব্দুল হালিম সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪১ বা. স., মে-দিবস বিশেষ সংখ্যা, মে, ১৯৩৪, পৃ ১৭৩।

১৯. মার্ক্স-পন্থী, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৭৩ ; Home/Poll./F. No. 7/20/1934 & K. W., Serial Nos. 1—4 ; Subodh Roy (ed.), op. cit., p. 389 ; Panchanan Saha, op. cit., *P.N.L.*, p. 35.

২০. রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৭৭ ; Subodh Roy (ed.), op. cit., p. 390.

২১. *The Amrita Bazar patrika*, Calcutta, October 4, 1934, p. 3; Subodh Roy (ed.), op. cit., p. 390; নন্দলাল বসুর সাক্ষাৎকার—১৭. ৬. ১৯৮৬।

২২. রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৭৭।

২৩. *The Amrita Bazar patrika*, Calcutta, October 4, 1934, p. 3.

২৪. *The Amrita Bazar patrika*, Calcutta, May 18, 1934, p. 5.

২৫. রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৭৮।

২৬. তদেব, পৃ ৭৮।

২৭. তদেব, পৃ ৭৮-৭৯; সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৭৯-৮০; মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৯।

২৮. রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৭৮-৭৯; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৮০; মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৯; Home/Poll./F. No. 7/20 1934 & K. W., Serial Nos. 1-4; Subodh Roy (ed.), op. cit., pp. 390-91; Tanika Sarkar, op. cit., p. 166; Horace Williamson, op. cit, pp. 195-96.

২৯. রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৭৯-৮১; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৮০।

৩০. Home / Poll. / F. No. 7/20/1934 & K.W., Serial Nos. 1—4; Subodh Roy (ed.), op. cit., p. 414.

৩১. Home / Poll. / F. No. 7/20/1934 & K.W., Serial Nos. 1—4; Home / Poll. / F. No. 22/68/1935; Subodh Roy (ed.), op. cit., pp. 391, 414; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৮০-৮১।

৩২. *Ganashakti*, Organ of the Bengal Provincial Committee (Calcutta Committee re-named), Communist Party of India, Edited by Saroj Mukhopadhyay, Vol. 1, No. 2, October, 1934, Calcutta, p. 2.

৩৩. সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৮০।

৩৪. I.B, File No. 929/1935.

৩৫. I.B., File No. 929/1935.

৩৬. I.B., File No. 929/1935.

৩৭. S.B., File No. S.M. 502/1936.

৩৮. S.B., File No. S.M. 502/1936; লেখকের সঙ্গে অলিমোহন কাউলের সাক্ষাৎকার—২৭.২.১৯৮৭।

৩৯. S.B., File No. 501/1938.

৪০. S.B., File No. S.M. 502/1936.

৪১. S.B., File No. S.M. 502/1936.

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি

বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি :
১৯৩২-১৯৩৯ : সংগঠন ও রাজনীতি

১৯৩২ সাল। গান্ধী পরিচালিত আইন-অমান্য আন্দোলনে ভাটার টান। "সন্ত্রাসবাদী" পথ অবলম্বনকারী জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন চরম সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতনের শিকার। "মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা"য় অভিযুক্ত হয়ে বাংলার প্রথম সারির কমিউনিস্ট ও অন্যান্য অ-কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতাগণ প্রায় সকলেই জেলে বন্দী। অবশ্য রণেন সেন প্রমুখ কয়েকজন তরুণ কমিউনিস্ট "মীরাট মামলা"-পূর্ববর্তী যুগের কমিউনিস্ট আব্দুল হালিমকে সম্পাদক করে পাকাপাকিভাবে "কলকাতা কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অংশ" (যদিও প্রকৃতপক্ষে তখন "কলকাতা কমিটি"র সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কোনও যোগাযোগ স্থাপিত হয় নি)—এই নাম দিয়ে পার্টি গঠন করে নির্বিচার গ্রেফ্‌তার এবং অন্যান্য চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রসারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই মূল "কলকাতা কমিটি" নামক অংশটি বাদেও কলকাতায় এবং বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপ, যেগুলিকে অবলম্বন করে কমিউনিস্ট-মতাবলম্বীরা কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও।

বেঙ্গল লেবার পার্টি'র আত্মপ্রকাশ

এইরকম এক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের নেতৃত্বে বেঙ্গল লেবার পার্টি গঠিত হল। বেঙ্গল লেবার পার্টি'র প্রথম সভাপতি হলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং সহ-সভাপতি অতুল গুপ্ত। বিভিন্ন সংস্কারবাদী নেতাদের নিয়েই বেঙ্গল লেবার পার্টি গঠিত হয়, যাঁদের মধ্যে উপর্যুক্ত দুজন ব্যতীত উল্লেখযোগ্য ছিলেন মৃণালকান্তি বসু, সতীশ সেন, সীমেন্‌স্ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট্ আফতাব আলি, শান্তিরাম মণ্ডল প্রমুখ। এই পার্টি'র অফিস হল ১০ ও ১১, আপার সার্কুলার রোড।[১] বেঙ্গল লেবার পার্টি'র উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষিত হল বঙ্গীয় আইন পরিষদে শ্রমিক আসন (Labour Seats) দখল। বেঙ্গল লেবার পার্টি গঠনের পিছনে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের যে ইচ্ছা কাজ করেছিল, সেটি হল ইংল্যাণ্ডের লেবার পার্টি'র অনুরূপ বাংলায় একটি সম্পূর্ণ সংস্কারবাদী "সমাজতান্ত্রিক" সংগঠন গড়ে তোলা। এই দলের প্রতিষ্ঠাতাদের মনোভাব ছিল, যেহেতু ঐ সময়ে কংগ্রেস অনেকাংশে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে, সেহেতু রাজনৈতিক সক্রিয়তা আনতে দেশে একটি রাজনৈতিক দল প্রয়োজন। এই দলের অর্থাৎ বেঙ্গল লেবার পার্টি'র রাজনৈতিক ভিত্তি হবে শ্রমিকশ্রেণী—এই দলের নেতারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, শ্রমিক আন্দোলনকে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করবেন এবং সম্পূর্ণ সাংবিধানিক পথে শ্রমিকদের দাবিদাওয়া

আদায়ের চেষ্টা করবেন।[২] অর্থাৎ অ-কমিউনিস্ট সংস্কারবাদী নেতাদের প্রকাশ্য রাজনৈতিক platform হিসাবেই বেঙ্গল লেবার পার্টি'র আত্মপ্রকাশ।

বেঙ্গল লেবার পার্টি'র সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৩২ সালের আগস্ট্ মাসে গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি'র অন্যতম নেতা শাপুরজী শাকলাতওয়ালার এবং "লীগ এগেন্স্ট্ ইম্পিরিয়ালিজ্ম্ অ্যাণ্ড্ ফর ন্যাশনাল্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্"-এর সেক্রেটারি রেজিনাল্ড ব্রিজম্যান-এর সংস্পর্শে এসে কমিউনিস্ট হয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে দেশে ফেরেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার দেশে ফেরার ঠিক এক বছর আগে অর্থাৎ ১৯৩১ সালের আগস্ট্ মাসে ইংল্যাণ্ড থেকে কমিউনিস্ট হয়ে দেশে ফেরেন কিরণ বসাক। একইভাবে কমিউনিস্ট হয়ে ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংল্যাণ্ড থেকে দেশে আসেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ছেলে নির্মল সেনগুপ্ত এবং ঐ বছরেরই ডিসেম্বর মাসে দেশে ফেরেন বীরেশ গুহ। ১৯৩২ সালের জানুআরি মাসে নির্মল সেনগুপ্ত আবার ইংল্যাণ্ড ফিরে যান এবং ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পাকাপাকিভাবে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৩৩ সালের গোড়াতেই কমিউনিস্ট নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার বেঙ্গল লেবার পার্টি'তে যোগ দেন। প্রায় তাঁর সঙ্গেই বীরেশ গুহ ও কিরণ বসাক লেবার পার্টি'তে যোগ দেন। ১৯৩৫ সালে বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের সঙ্গে আলোচনা করে লেবার পার্টি'তে যোগ দেন নির্মল সেনগুপ্ত। ১৯৩৩ সালে লেবার পার্টি'তে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লেবার পার্টি'র নেতৃত্বে চলে আসেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার এবং তখন থেকেই লেবার পার্টি'তে কমিউনিস্টদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।[৩]

১৯৩২ সালেই দেবাংশু সেনগুপ্ত সম্পাদিত "ছাত্রদল" পত্রিকাকে কেন্দ্র করে "ছাত্রদল" নামে একটি স্বাধীন মার্কসবাদী গ্রুপ গড়ে ওঠে। এই "ছাত্রদল" নামে কমিউনিস্ট গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রমোদ সেন (আদি পদবী সেনগুপ্ত হলেও সেন হিসাবেই অধিক পরিচিত) ও কমল সরকার। তাঁরা ছাড়াও এই গ্রুপে ছিলেন সুশীল ভদ্র, সুশীল চ্যাটার্জী, দেবাংশু সেনগুপ্ত প্রমুখ। পরে যোগ দেন বিশ্বনাথ দুবে। ১৯৩৩ সালে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের সঙ্গে পার্টি গঠন নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে প্রমোদ সেন ও কমল সরকারের নেতৃত্বে সমগ্র "ছাত্রদল" গ্রুপটিই লেবার পার্টি'তে যোগ দেয়।[৪]

নিত্যানন্দ চৌধুরী ১৯৩৩ সালে লেবার পার্টি'তে যোগ দেন। ১৯৩৩ সালেই লেবার পার্টি'তে যোগ দেন বিশ্বনাথ দুবে, শিশির রায়, সুধা রায় প্রমুখ। এই বছরের শেষভাগেই লেবার পার্টি'তে যোগ দেন সুরেশ দাসগুপ্ত, নন্দলাল বসু, অনন্ত মুখার্জী, বিষ্ণু মুখার্জী, যোগেন সরকার প্রমুখ। ১৯৩৩ সালেই এ. এম. এ. জামান, বিপিন চক্রবর্তী, বাদল গাঙ্গুলী, অঘোর সেন প্রমুখ লেবার পার্টি'তে যোগ দেন। লেবার পার্টি'তে যোগ দেওয়ার আগেই অঘোর সেন, বাদল গাঙ্গুলী প্রমুখ সাম্যরাজ পার্টি নামে একটি দল গঠন করেছিলেন। এই সাম্যরাজ পার্টি প্রকাশ্য platform হিসাবে লেবার পার্টি'কেই

ব্যবহার করত। রজনী মুখার্জী, ধরিত্রী গাঙ্গুলী প্রমুখ রায়পন্থীরাও লেবার পার্টি'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই যোগাযোগ চলে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত। ১৯৩৪ সালেই এ. এম. এ. জামান, বিপিন চক্রবর্তী, অঘোর সেন প্রমুখ লেবার পার্টি ছেড়ে দেন। বাদল গাঙ্গুলী লেবার পার্টি ত্যাগ না করলেও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন।[৫] অর্থাৎ ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত লেবার পার্টি ছিল একটি প্রকাশ্য রাজনৈতিক platform বা মঞ্চ, যাকে বিভিন্ন মার্কসবাদী ও অ-মার্কসবাদী রাজনৈতিক গোষ্ঠী নিজেদের প্রয়োজনমত ব্যবহার করেছে বা করতে চেষ্টা করেছে।

লেবার পার্টি'তে কমিউনিস্টদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

১৯৩৩ সালে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও অন্যান্য কমিউনিস্টরা লেবার পার্টি'তে যোগ দেওয়ার পরই এই পার্টি'র মধ্যে একটা বড় পরিবর্তন ঘটে যায়। লেবার পার্টি পুনর্গঠিত হয় এবং নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা এই পার্টি'র নেতৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিতে থাকেন। ১৯৩৩ সালেই নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার লেবার পার্টি'র জেনারেল সেক্রেটারি হন এবং লেবার পার্টি'র প্রধান সংগঠক ও অবিসংবাদী প্রকাশ্য নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৩৩ সালে লেবার পার্টি'তে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্টদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত লেবার পার্টি'র মধ্যে একটি কমিউনিস্ট ও অপরটি অ-কমিউনিস্ট —এই দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পরস্পরবিরোধী গ্রুপের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। লেবার পার্টি'র অভ্যন্তরস্থ অ-কমিউনিস্ট গ্রুপটিতে ছিলেন নরেশ সেনগুপ্ত, অতুল গুপ্ত, এ. এম. এ. জামান, শান্তিরাম মণ্ডল, বিপিন চক্রবর্তী প্রমুখ। অপরদিকে লেবার পার্টি'র অভ্যন্তরীণ কমিউনিস্ট হিসাবে পরিচিত ছিলেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, নির্মল সেনগুপ্ত, বীরেশ গুহ, কিরণ বসাক, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নিত্যানন্দ চৌধুরী, বিশ্বনাথ দুবে, শিশির রায়, সুধা রায়, সুরেশ দাসগুপ্ত, নন্দলাল বসু, অনন্ত মুখার্জী, বিষ্ণু মুখার্জী, যোগেন সরকার প্রমুখ।[৬] মতাদর্শগতভাবে কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও অঘোর সেন ও বাদল গাঙ্গুলী নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টি'র অভ্যন্তরীণ কমিউনিস্ট গ্রুপটির অন্তর্ভুক্ত বা সহযোগী ছিলেন না। লেবার পার্টি'র কমিউনিস্টরা লেবার পার্টি'র মধ্যেই একটি আভ্যন্তরিক (inner) কমিউনিস্ট গ্রুপ তৈরি করেন ১৯৩৩ সালেই এবং ক্রমশ এই আভ্যন্তরিক কমিউনিস্ট গ্রুপটিই সমস্ত লেবার পার্টি'র উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

লেবার পার্টি'র কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্য

লেবার পার্টি'র কমিউনিস্টরা ১৯৩৩ সালেই তাঁদের উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করেন যে, তাঁরা সক্রিয়ভাবে শ্রমিক আন্দোলন করবেন এবং শ্রমিক আন্দোলনকে একটি রাজনৈতিক মতবাদের নেতৃত্বে পরিচালনা করবেন। তাঁরা ঘোষণা করেন, লেবার পার্টি'র প্রধান ভিত্তি হবে শ্রমিকশ্রেণী কারণ যে-কোনও কমিউনিস্ট পার্টি'রই মূল ভিত্তি হল শ্রমিক-শ্রেণী। তাঁরা স্থির করেন, লেবার পার্টি'র নেতৃত্বাধীন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

আন্দোলনের মধ্য থেকেই শ্রমিকশ্রেণীকে কমিউনিস্ট রাজনীতি শিখিয়ে তাঁদের কমিউনিস্ট করে তোলা হবে এবং লেবার পার্টির নেতৃত্বে নিয়ে আসা হবে। লেবার পার্টির কমিউনিস্টদের প্রধান বক্তব্য ছিল, অর্থনৈতিক আন্দোলনকে এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে সেটা রাজনৈতিক আন্দোলনের স্তরে উন্নত হয়। লেবার পার্টির কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক লাইন ছিল—যদিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বভার আছে বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে, কিন্তু এই নেতৃত্ব দোদুল্যমান ও আপসকামী, সুতরাং শ্রমিকশ্রেণী লেবার পার্টির নেতৃত্বে বুর্জোয়া নেতৃত্বের এই আপসকামী ও দোদুল্যমানতার বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং জঙ্গী শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে আরও জোরদার করে তুলবে।[৭]

১৯৩৩ সালের ২৯ এপ্রিল লেবার পার্টির তরফ থেকে একটি ইস্তাহার প্রকাশিত হয়। এই ইস্তাহারের উপরদিকে লেখা ছিল—"খেটে খাওয়া মানুষের মুক্তিসাধন একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর নিজেদের মাধ্যমেই সম্ভব।" এই ইস্তাহারে যুদ্ধকে "উপনিবেশ পুনর্বিভাজনের জন্য ডাকাতদের বিবাদ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এই ইস্তাহারে বলা হয়, লেবার পার্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে "আইনসঙ্গত এবং সাংবিধানিক উপায়ে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠা করা।[৮] পুলিসের গোপন রিপোর্ট অনুযায়ী এই "আইনসঙ্গত এবং সাংবিধানিক উপায়" কথাটির আড়ালে লেবার পার্টির তরুণ কমিউনিস্ট সদস্যরা বিভিন্ন প্রকাশ্য ও গোপন কমিউনিস্ট কাজকর্মে লিপ্ত হন।[৯]

নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের ভাই নবেন্দু দত্ত মজুমদারের সম্পাদনায় বেঙ্গল লেবার পার্টির ইংরাজী মুখপত্র হিসাবে **"নিউ ফ্রন্ট"** (*"New Front"*) প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর এবং পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই পার্টি-থিসিসটি নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের ব্যাখ্যামূলক টীকাসহ মুদ্রিত হয়।[১০] এই পত্রিকার নাম থেকেই প্রকাশ, "বুর্জোয়া সংবিধানপন্থার নতুন ফ্রন্টের" বিরুদ্ধে বেঙ্গল লেবার পার্টি হচ্ছে "শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রেণীবিচ্যুত বুদ্ধিজীবীদের নতুন ফ্রন্ট"। পার্টির মতে বুর্জোয়া জাতীয় কংগ্রেসের ব্যর্থতা এবং পুরানো প্রতিক্রিয়াশীল ফ্রন্টের পতনের পর দেশে "বুর্জোয়া সংবিধানপন্থার নতুন ফ্রন্টের" উদ্ভব হয়েছে।[১১] এই পত্রিকায় লেবার পার্টির তরফ থেকে জনগণের কাছে শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। লেবার পার্টি জাতীয় কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে এবং মতপ্রকাশ করে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সচেতন লড়াই—অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলন ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে এবং তাদেরই স্বার্থে পরিচালিত হয়ে এসেছে, এবং কংগ্রেস হচ্ছে ভারতের এই আপসকামী বৃহৎ বুর্জোয়াদেরই রাজনৈতিক সংগঠন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই (ক) "জাতির মুক্তি" ও (খ) "শ্রেণীসমূহের মুক্তি" লেবার পার্টির উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষিত হয় এবং লেবার পার্টি ঘোষণা করে, এই উদ্দেশ্যে লেবার পার্টি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ও শ্রেণী সংগ্রামের নেতৃত্ব দেবে এবং প্রয়োজনে কংগ্রেসের হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নেবে।[১২]

লেবার পার্টি'র মধ্যে কমিউনিস্টদের সঙ্গে অ-কমিউনিস্টদের মতবিরোধ

১৯৩৪ সাল অবধি লেবার পার্টি ও তার নেতৃত্বের মধ্যে কমিউনিস্টদের সঙ্গে অ-কমিউনিস্টদের সংঘর্ষ চলে। লেবার পার্টি'র মুখপত্র **"নিউ ফ্রন্ট"** পত্রিকায় ১৯৩৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর "শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আমাদের কর্তব্য" শিরোনামায় পার্টি সভাপতি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়[১৩] এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবন্ধটি পার্টি'র কমিউনিস্ট সদস্যদের দ্বারা তীব্রভাবে সমালোচিত হয়। এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত অ-মার্কসীয়, অ-লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ভারতে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন। তিনি আরও লেখেন যে, ভারতের শ্রমিকশ্রেণী কিভাবে বুর্জোয়াদের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করবে, তিনি জানেন না।[১৪] **"নিউ ফ্রন্ট"** পত্রিকায় ১৯৩৩ সালের ৩ নভেম্বর "মার্কসবাদী" নামের আড়ালে পার্টি'রই কোনও কমিউনিস্ট সদস্য কর্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধে মার্কসীয় বিশ্লেষণের আলোকে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্র সমালোচনা করা হয়।[১৫] ১৯৩৪ সাল অবধি পার্টি'র মধ্যে এই কমিউনিস্ট-অ-কমিউনিস্ট দ্বন্দ্ব চলে। শেষপর্যন্ত ১৯৩৪ সালে লেবার পার্টি নেতৃত্ব তথা পার্টি থেকেই নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সহ অ-কমিউনিস্টরা বিদায় গ্রহণ করেন।[১৬]

শ্রমিক আন্দোলনে লেবার পার্টি'র ভূমিকা

১৯৩৩ সাল থেকেই লেবার পার্টি'র আভ্যন্তরিক কমিউনিস্ট গ্রুপটি শ্রমিকদের মধ্যে কাজ শুরু করেন, শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে সংগঠিত করে রাজনীতি শিক্ষা দিতে থাকেন এবং শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনদের লেবার পার্টি'তে, এমনকি নেতৃত্বেও নিয়ে আসতে থাকেন। শ্রমিকদের মধ্য থেকে লেবার পার্টি'র নেতৃত্বে এসেছেন, এরকম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম—মহম্মদ ইউসুফ, আব্দুর রহমান খাঁ, মাদার খাঁ, শের খাঁ, মহম্মদ সেলিম, আহ্মদ হোসেন, শ্রীনারায়ণ রাও, সীতা শেঠ, জুমরাত আলি, রোদিয়া, জম্বু, বাসুদেব প্রমুখ। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ডকশ্রমিক এবং কয়েকজন ছিলেন চটকল-শ্রমিক।[১৭] এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, শিশির রায়, সুধা রায়, বিশ্বনাথ দুবে, নন্দলাল বসু, নিত্যানন্দ চৌধুরী, জ্যোতির্ময় নন্দী, শ্রীনারায়ণ ঝা, হাফিজ জালালুদ্দিন প্রমুখ বেঙ্গল লেবার পার্টি'র নেতারা নিজেরা শ্রমিক না হলেও শ্রমিকদের সঙ্গে নিজেদের সম্পূর্ণ মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন এবং ফলে অবিসংবাদী শ্রমিক নেতা হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্তন সৈনিক হাফিজ জালালুদ্দিন ডকশ্রমিক আন্দোলনে এবং চটকল-শ্রমিক আন্দোলনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।[১৮]

আন্তর্জাতিকভাবে এই কমিউনিস্ট গ্রুপটি কমিন্টার্ন, সি. পি. এস. ইউ. ও সি. পি. জি. বি.-র সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করতেন, কিন্তু নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য

থাকবেন না বলেন; যদিও বাস্তবে নির্দেশ মানতেন, বিশেষ করে কমিণ্টার্ন-এর নির্দেশ।[১৯]

১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে লেবার পার্টি'র নেতৃবৃন্দের, বিশেষ করে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের, প্রচেষ্টায় ক্যালকাটা পোর্ট্ অ্যাণ্ড্ ডক্ ওয়ার্কার্স' ইউনিয়ন নামে পোর্ট ও ডক শ্রমিকদের অত্যন্ত শক্তিশালী ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। এই ইউনিয়নটির সভাপতি ছিলেন শের খাঁ নামে একজন ডকশ্রমিক—উইঞ্চম্যান, সহ-সভাপতি ছিলেন রায়পন্থী রজনী মুখার্জী, লেবার পার্টি'র বাদল গাঙ্গুলী (সাম্যরাজ পার্টি'র প্রতিষ্ঠাতা-নেতা) এবং লেবার পার্টি'র শ্রমিক নেতা, ডকশ্রমিক, উইঞ্চম্যান মহম্মদ ইউসুফ, সাধারণ সম্পাদক লেবার পার্টি'র শিশির রায় এবং ট্রাস্টী ও প্রধান নেতা লেবার পার্টি'র সাধারণ সম্পাদক নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার।[২০] পুলিসের গোপন রিপোর্ট অনুযায়ী এই ইউনিয়নের প্রথম প্রকাশ্য মিটিং হয় ১৯৩৪ সালের ২১ জানুআরি, ঐ বছরের ৪ ফেব্রুআরি থেকে ২১ অক্টোবর অবধি ইউনিয়নের বিভিন্ন মিটিং হয়, ৯ মার্চ ১৯৩৪ ইউনিয়নটি রেজিস্টার্ড্ হয়, লেবার পার্টি'র কমিউনিস্টরা ডকশ্রমিকদের মধ্যে জঙ্গী, সংগ্রামী মনোভাব, শ্রেণী দৃষ্টি-ভঙ্গী ও রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন, ১৯৩৪ সালের মাঝামাঝি ডকশ্রমিক মহম্মদ ইউসুফ লেবার পার্টি'র সভাপতি নির্বাচিত হন ও ডকশ্রমিক আহ্মদ হোসেন লেবার পার্টির "মজদুর কাউন্সিল"-এর সম্পাদক নির্বাচিত হন, এবং ১৯৩৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর লেবার পার্টি'র কন্ফারেন্সে হাফিজ জালালুদ্দিন লেবার পার্টি'র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[২১] ১৯৩৪ সালের ২৬ নভেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর, মোট ২১ দিন, ১৪,০০০ ডকশ্রমিক এই ইউনিয়নের নেতৃত্বে ধর্মঘটে সামিল হন।[২২] এই ধর্মঘটের প্রধান নেতা ছিলেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও শিশির রায় এবং লেবার পার্টি'র অন্যান্য কমিউনিস্টরা। এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, কমল সরকার, নন্দলাল বসু, রজনী মুখার্জী, মহম্মদ ইউসুফ, শের খাঁ, শ্রীনারায়ণ ঝা, জ্যোতির্ময় নন্দী প্রমুখ গ্রেফ্তার হন।[২৩] সম্পূর্ণ দাবি আদায় করতে সক্ষম না হলেও এই ডকশ্রমিক ধর্মঘট শ্রমিক আন্দোলনে এক নতুন জীবন নিয়ে আসে।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে লেবার পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। শ্রমিকদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করা নিয়ে লেবার পার্টি'র সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লেবার পার্টি বিশেষ পিছিয়ে ছিল না। ঐ সময়কার লেবার পার্টি'র নেতৃত্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও প্রধান—(১) ক্যালকাটা পোর্ট অ্যাণ্ড্ ডক্ ওয়ার্কার্স' ইউনিয়ন, (২) অল-বেঙ্গল আয়রন্ অ্যাণ্ড্ স্টীল্ ওয়ার্কার্স' ইউনিয়ন, (৩) মেটাল অ্যাণ্ড্ এন্জিনীয়ারিং ওয়ার্কার্স' ইউনিয়ন, গার্ডেনরীচ, (৪) অল-বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কার্স' ইউনিয়ন, (৫) বেঙ্গল রাইস-মিল ওয়ার্কার্স' ইউনিয়ন, টালিগঞ্জ, (৬) স্যাক্সবী অ্যাণ্ড্ ফার্মার কোম্পানি ওয়ার্কার্স' ইউনিয়ন (এন্জিনীয়ারিং শিল্প), (৭) ম্যাকিণ্টস্-বার্ন্ ওয়ার্কার্স' ইউনিয়ন (এন্জিনীয়ারিং শিল্প), (৮) হুকুমচাঁদ আয়রন্

অ্যাণ্ড্ স্টীল্ ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন, বালিগঞ্জ (৯) হয়েল-রবসন ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন (রং-এর কারখানা), (১০) ইণ্ডিয়া ফ্যান ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন, (১১) ধুবড়ি ম্যাচ ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন, আসাম (১৯৩৫ সালে লেবার পার্টি'র নেতৃত্বে এই ফ্যাক্টরিতে একটি ধর্মঘট হয়, ফলে ফ্যাক্টরিটি উঠে যায়), (১২) ইস্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন, লিলুয়া, (১৩) রেলওয়ে পোর্টার্স্ ইউনিয়ন, হাওড়া, (১৪) বেঙ্গল পটারিজ ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন, (১৫) টিটাগড়, ব্যারাকপুর, জগদ্দল, নৈহাটি, গৌরীপুর, হাজীনগর, কাঁকিনাড়া, শ্যামনগর প্রভৃতি অঞ্চলের চটকলগুলিতে মজদুর ইউনিয়ন এবং (১৬) শ্যামনগরের ডানবার কটন মিলসে ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন।[২৪]

গোপন পুলিস রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৩৪ সালের ৪ ফেব্রুআরি কলকাতা ময়দানে অক্টারলনি মনুমেণ্টের সামনে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বে, বেঙ্গল লেবার পার্টি'র ডাকে, সুবিশাল শ্রমিক মিছিল ও জনসমাবেশ হয়। এই জনসমাবেশে কাস্তে-হাতুড়ি-তারা—অঙ্কিত কমিউনিস্ট পতাকা (লাল ঝাণ্ডা) উত্তোলন করা হয় এবং "লাল ঝাণ্ডা কি জয়", "ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ", "মজদুর-কিসান হুকুমত কি জয়", "রাশিয়া কি জয়" প্রভৃতি স্লোগান দেওয়া হয়।[২৫] নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার তাঁর বক্তৃতায় বলেন, শ্রমিকশ্রেণী সচেতনভাবে তাদের দুর্দশার বিরুদ্ধে লড়াই করুক এবং একইসঙ্গে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সামিল হোক্, অর্থাৎ রুটির লড়াই ও আজাদির লড়াই একসঙ্গেই চলবে।[২৬]

লেবার পার্টি ও "লীগ এগেন্স্ট্ গান্ধীজ্‌ম্"

১৯৩৪ সালের গোড়া থেকেই লেবার পার্টি'র রাজনৈতিক কাজকর্ম শুরু হয়। লেবার পার্টি'র কমিউনিস্টরা রুটির লড়াই ও আজাদির লড়াই একই সঙ্গে পরিচালনা করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন, কারণ উভয় লড়াই এক সঙ্গেই জড়িত। দ্য ইউথ লীগ, বেঙ্গল-এর প্রেসিডেন্ট এবং লেবার পার্টি'র কমিউনিস্ট সদস্য অজিত দাসগুপ্তের নেতৃত্বে ১৯৩৪ সালের একদম গোড়ার দিকেই (জানুআরি অথবা ফেব্রুআরি মাসে) "গান্ধী বয়কট কমিটি" গঠিত হয়। কিছুদিন পর এর নাম হয় "লীগ এগেন্স্ট্ গান্ধীজ্‌ম্।" "লীগ্ এগেন্স্ট্ গান্ধীজ্‌ম্"-এ লেবার পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টি উভয় দলই যোগ দেয়। এই সময়েই লেবার পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি একত্র বসে গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে একযোগে সংগ্রাম করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়।[২৭] ১৯৩৪ সালের ২৫ এপ্রিল অ্যালবার্ট্ হলে "লীগ এগেন্স্ট্ গান্ধীজ্‌ম্"-এর প্রথম মিটিং হয়। ১৯৩৪ সালের ১১ মে কলকাতার হাজরা পার্কে গান্ধীজীর সংবর্ধনা সমিতির মিটিং "লীগ এগেন্স্ট্ গান্ধীজ্‌ম্" "ধনিকের দালাল কংগ্রেস ও গান্ধীবাদ ধ্বংস হোক্"—এই স্লোগান তুলে ভেঙ্গে দেয়। এই কাজে কমিউনিস্ট পার্টি'র ও লেবার পার্টি'র সদস্যরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সালের ১৯ জুলাই "লীগ এগেন্স্ট্ গান্ধীজ্‌ম্"-এর ডাকে গান্ধী-বিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশ হয়।

সেক্রেটারি শিশির রায়ের নেতৃত্বে ডকশ্রমিকরা খিদিরপুর থেকে ময়দানের মনুমেন্ট্ পর্যন্ত গান্ধী-বিরোধী এক বিক্ষোভ-মিছিলে সামিল হন। ঐ দিনই সন্ধ্যায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গান্ধী-বিরোধী এক বিক্ষোভ-মিটিং হয়। ঐ মিটিং-এ "পূর্ণ স্বাধীনতা"র লক্ষ্য এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এবং সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শ্রমিক আন্দোলন দমন করার জন্য গান্ধী-নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব পাস করা হয়"।[২৮] ১৯৩৪ সালের ২১ জুলাই "লীগ এগেন্স্ট্ গান্ধীজ্‌ম্"-এর ডাকে আবার গান্ধী-বিরোধী বিক্ষোভ-মিছিল ও সমাবেশ হয়। ঐ দিনই দেশবন্ধু পার্কে গান্ধীজীর সংবর্ধনা সভায় "লীগ এগেন্স্ট্-গান্ধীজ্‌ম্"-এর সদস্যরা গান্ধী-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং ইস্তাহার বিলি করেন। লীগের অন্তর্ভূক্ত লেবার পার্টির ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের তরফ থেকে ঐ সভা ভণ্ডুল করার জন্য মিলিত প্রচেষ্টাও চালানো হয়।[২৯] লেবার পার্টির তৎকালীন নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার অনুযায়ী লেবার পার্টির সদস্যরা ব্যক্তি গান্ধীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নয়, গান্ধীদর্শনের "সামন্ততান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রে"র বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই "লীগ এগেন্স্ট্ গান্ধীজ্‌ম্"-এ যোগদান করেছিলেন।[৩০]

ক্যালকাটা কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভব

পুলিসের গোপন রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৩৫ সালের ৩ ফেব্রুআরি বেঙ্গল লেবার পার্টির পৃষ্ঠপোষকতায় একটি গোপন উদ্বোধনী মিটিং-এর মাধ্যমে ক্যালকাটা কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভব হয়। উদ্বোধনী মিটিং-এ প্রমোদ সেন ব্যাখ্যা করেন যে, কলকাতায় শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে, এই অবস্থায় বর্তমানে তাঁদের রাজনৈতিক শিক্ষা দরকার, যে শিক্ষালাভ করে শ্রমিকশ্রেণী সশস্ত্র গণবিপ্লবের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। প্রমোদ সেন বলেন, এই উদ্দেশ্যেই ক্যালকাটা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা। প্রমোদ সেন ও জ্যোতির্ময় নন্দীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার এই পার্টির সদস্যদের নাম স্থির করেন। প্রাথমিকভাবে জ্যোতির্ময় নন্দীকে সেক্রেটারি করে ক্যালকাটা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে ১৫ জনকে নির্বাচিত করা হয়। লেবার পার্টির প্রথম সারির সকল কমিউনিস্ট নেতাই এই পার্টির সদস্য নির্বাচিত হন।[৩১] এই পার্টির পরবর্তী মিটিং হয় ১০ ফেব্রুআরি ১৯৩৫। সেই মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয়, ক্যালকাটা কমিউনিস্ট পার্টি আব্দুল হালিমের পার্টি অর্থাৎ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির "কলকাতা কমিটি"র সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসার প্রচেষ্টা চালাবে।[৩২]

১৯৩৪ সালের ২৩ জুলাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়।[৩৩] ১৯৩৫ সালের ৭ মার্চ বাংলা সরকার একটি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে কলকাতার ১৩টি রাজনৈতিক ও শ্রমিক সংগঠনকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করে। তার মধ্যে প্রথম নাম ছিল ক্যালকাটা কমিউনিস্ট পার্টি, দ্বিতীয় নাম ছিল ক্যালকাটা

পোর্ট্, অ্যাণ্ড্ ডক্ ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন এবং চতুর্থ নাম ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির "কলকাতা কমিটি"।৩৪

লেবার পার্টি তথা বঙ্গদেশভিত্তিক পার্টির তৎকালীন নেতারা সকলেই তাঁদের সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছেন, ক্যালকাটা কমিউনিস্ট পার্টি নামে কোনও পার্টি তাঁরা গঠন করেন নি এবং এই নামের কোনও পার্টির অস্তিত্ব সম্পর্কেও তাঁরা আদৌ অবহিত নন। তাঁদের বক্তব্য, এরকম কোনও পার্টি আদপেই ছিল না। তাঁদের আরও বক্তব্য, লেবার পার্টির আভ্যন্তরিক কমিউনিস্ট গ্রুপটিকেই পুলিস "কলকাতা কমিটি", ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে ক্যালকাটা কমিউনিস্ট পার্টি নাম দেয়, যদিও এই গ্রুপ কোনও দিনই নিজেদের ক্যালকাটা কমিউনিস্ট পার্টি বলে উল্লেখ করে নি। তাঁরা এ কথাও বলেছেন, জ্যোতির্ময় নন্দী সেক্রেটারি—এই রিপোর্টও সম্পূর্ণ ভুল।৩৫ যাই হোক্, লেবার পার্টি নিষিদ্ধ না হলেও এই আভ্যন্তরিক কমিউনিস্ট গ্রুপ (লেবার পার্টির কমিউনিস্টরা নিজেদের যে নামে অভিহিত করেছিলেন) বা ক্যালকাটা কমিউনিস্ট পার্টি (পুলিস লেবার পার্টির কমিউনিস্টদের যে নামে অভিহিত করেছিল) নিষিদ্ধ হয়।৩৬

লেবার পার্টির সদস্যদের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান

লেবার পার্টির কমিউনিস্টদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক মতাদর্শগত যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। উভয়েই কমিউনিস্ট মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও এই পার্থক্যগুলির কারণেই লেবার পার্টির কমিউনিস্টরা কমিউনিস্ট পার্টি থেকে পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন, যদিও বোঝাপড়ায় আসার চেষ্টা তাঁরা প্রথম থেকেই চালাচ্ছিলেন। অপরদিকে কমিউনিস্ট পার্টিও প্রথম যুগে একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর বশবর্তী হয়ে তাঁদের গ্রহণ করতে খুব একটা উৎসুক হয় নি। পার্থক্যগুলি বিশেষভাবে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বোঝাপড়ার দরজা খুলে গেল ১৯৩৫ সালের আগস্ট্ মাসে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে গৃহীত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সাধারণ সম্পাদক জর্জি ডিমিট্রভের "যুক্ত ফ্রন্ট" তত্ত্ব *International Press Correspondence* (*Inprecor*)-এ প্রকাশিত হওয়ার পর।৩৭ *Inprecor*-এ প্রকাশিত ডিমিট্রভের "যুক্ত ফ্রন্ট" তত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি ও লেবার পার্টির আভ্যন্তরিক কমিউনিস্ট গ্রুপ উভয়েই মেনে নেয়, যদিও ভারতের বাস্তব পরিস্থিতিতে "যুক্ত ফ্রন্ট" তত্ত্বের প্রয়োগজনিত ব্যাখ্যা তাদের পৃথক ছিল। লেবার পার্টির কমিউনিস্টরা ও কমিউনিস্ট পার্টি উভয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, দেশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য একটিই কমিউনিস্ট পার্টি থাকা উচিত। এই সিদ্ধান্তের আলোকে মিলনের প্রচেষ্টা উভয় দলই শুরু করে, যদিও মিলনের আগ্রহ মূলত এসেছিল লেবার পার্টির কমিউনিস্টদের তরফ থেকেই। এই মিলন-প্রচেষ্টার পরিণতি হিসাবে ১৯৩৬ সালের গোড়ার দিকে লেবার পার্টির সমস্ত কমিউনিস্ট সদস্যই ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। লেবার পার্টিকে অবশ্য

তুলে দেওয়া হয় নি। স্থির হয়, লেবার পার্টি হবে বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য platform—নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা লেবার পার্টিকেই প্রকাশ্য platform বা legal cover হিসাবে ব্যবহার করবেন। এই মিলনের ফলে লেবার পার্টির নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন, প্রমোদ সেন ও কমল সরকার হন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সদস্য এবং নন্দলাল বসু হন কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য।[৩৮]

লেবার পার্টির সদস্যদের কমিউনিস্ট পার্টি পরিত্যাগ ও বলশেভিক পার্টি গঠন

কিন্তু এই মিলন ছিল "more apparent than real." ফলে এই মিলন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। লেবার পার্টির কমিউনিস্টদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির মূল রাজনৈতিক মতাদর্শগত পার্থক্য দূরীভূত হয় নি, ঐক্যের স্বার্থে উভয় পক্ষই কিছুটা রফা করেন। তার সঙ্গে যোগ হয় উভয় পক্ষের মধ্যে খুঁটিনাটি সাংগঠনিক বিরোধ। কমিউনিস্ট পার্টির আদি সদস্যরা অভিযোগ করতে থাকেন, লেবার পার্টির কমিউনিস্টরা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে নিজেদের গোষ্ঠী অক্ষুণ্ণ রেখে factionalism চালিয়ে পার্টিকে দুর্বল করে ফেলছেন। অপরদিকে লেবার পার্টি থেকে যে কমিউনিস্টরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁরা অভিযোগ করতে থাকেন, তাঁরা সাংগঠনিকভাবে ও কাজের ক্ষেত্রে বিশেষভাবেই অবহেলিত হচ্ছেন, কমিউনিস্ট পার্টির আদি সদস্যরা তাঁদের সুনজরে দেখছেন না এবং প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে তাঁদের কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন।[৩৯] মূল রাজনৈতিক মতাদর্শগত ও বিশ্লেষণগত মতপার্থক্যও ক্রমশ ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকে। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির দ্বিতীয় (গোপন) সম্মেলনের সময় থেকেই লেবার পার্টি গ্রুপের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির আদি সদস্যদের সাংগঠনিক-রাজনৈতিক বিরোধ ক্রমশই মীমাংসার অতীত হয়ে যেতে থাকে। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে ত্রিপুরীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের পরই এ-কথা উভয় গ্রুপের কাছেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বিরোধ এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, আর কোনও মতেই একসঙ্গে চলা সম্ভবপর নয়।[৪০] পরিণতিতে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বাধীন সমগ্র লেবার পার্টি গ্রুপটিই (নিত্যানন্দ চৌধুরী বাদে, আর এই গ্রুপে নতুন যোগ দেন মনোরঞ্জন রায়, নরেশ দাসগুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন) ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।[৪১] আর অপরদিকে কমিউনিস্ট পার্টির ভাষ্য অনুযায়ী তাঁদের পার্টি থেকে বিতাড়িত করা হয়।[৪২] কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টি গ্রুপ ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসেই বলশেভিক পার্টি অভ্ ইণ্ডিয়া নামে একটি নতুন পার্টি গঠন করেন। এই বলশেভিক পার্টি গোপন সংগঠন হিসাবে গড়ে ওঠে, তার প্রকাশ্য ও আইনসঙ্গত platform ছিল পুরাতন বেঙ্গল

লেবার পার্টি।[৪৩] যদিও বলশেভিক পার্টিই ছিল বেঙ্গল লেবার পার্টির core, কিন্তু উভয় পার্টির কাঠামো, সম্পাদক প্রভৃতি সবই পৃথক ছিল। যেমন, ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে গঠিত হওয়ার সময় বলশেভিক পার্টির প্রথম সাধারণ সম্পাদক হন প্রমোদ সেন, কিন্তু তখন প্রকাশ্য সংগঠন বেঙ্গল লেবার পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার।[৪৪]

লেবার পার্টির প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী

লেবার পার্টির প্রতি তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী এবং লেবার পার্টির কমিউনিস্টদের রাজনীতি ও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পর তাঁদের কার্যাবলী সম্পর্কিত তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্লেষণ আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯৪৩ সালের ১৮ থেকে ২১ মার্চ কলকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন্ হলে (ভারত সভা হলে) অনুষ্ঠিত তৃতীয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের শাখা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় (প্রথম প্রকাশ্য) বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলনে গৃহীত তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও এই সম্মেলন থেকে নির্বাচিত প্রাদেশিক সম্পাদক ভবানী সেনের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট (পরবর্তীকালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত) থেকে লেবার পার্টি সংক্রান্ত কিছু অংশ আমি উদ্ধৃত করছি :

"তখন দত্ত মজুমদার প্রভৃতি লেবার পার্টি গঠন করে বাইরে থেকে পার্টির ও পার্টি-নীতির বিরোধিতা করছেন। তাঁদের প্রধান অবলম্বন হল স্বতঃস্ফূর্তি ও অর্থনীতিবাদ অর্থাৎ (১) মজুরদের আগে শুধু অর্থনৈতিক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে কাছে আনতে হবে, রাজনীতি তাদের কাছে বলা উচিত নয়। (২) কমিউনিস্ট পার্টির এখন প্রয়োজন নাই, আগে সব ধরনের মজুরকে লেবার পার্টি নামে একটা বিস্তীর্ণ ও আইনসঙ্গত পার্টিতে আনো। (৩) তখন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে স্বভাবতই অধিকাংশই শ্রেণীচ্যুত বুদ্ধিজীবী—তারাই মজুরদের সংগঠিত করছে ও তাদের বিপ্লবী চেতনা দিচ্ছে। মজুরদের এই বিপ্লবী চেতনা হোক একে দত্ত মজুমদাররা ভয় করতেন। তাই তাঁরা আরও শ্লোগান্ ওঠালেন যে শ্রেণীচ্যুত হলেও বুদ্ধিজীবীদের নেতা হবার অধিকার নেই, এবং মজুর হলেই তাকে নেতা করতে হবে তা তার বিপ্লবী চেতনা নাই বা থাক।"[৪৫]

"পার্টির মধ্যে একটা শক্তিশালী গ্রুপ ছিল 'বঙ্গীয় লেবার পার্টি'। এই গ্রুপের নীতি ও কর্মপন্থা ছিল পার্টির নীতি ও কর্মপন্থার সম্পূর্ণ বিরোধী।......

......দেশের অবস্থা সম্পর্কে পার্টির পলিসি ছিল এই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির সংঘর্ষ দানা বেঁধে উঠ্‌ছে, সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করতে হবে। লেবার পার্টির লোকেরা বলত আমাদের লড়াই দুই ফ্রণ্টে—একদিকে সাম্রাজ্যবাদ, অপরদিকে দেশীয় বুর্জোয়া। কাজেই তাদের মতে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার নীতি ভুল। পার্টির নির্দেশ ছিল কংগ্রেসের ভিতর সোস্থালিস্ট ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা, লেবার পার্টির মতে সোস্থালিস্ট ঐক্য ছিল ভুল পথ। পার্টির নীতি অনুযায়ী কমিউনিস্ট

পার্টি'ই হল শ্রমিকদের বিপ্লবী পার্টি'। সুতরাং তাকেই গড়ে তুলতে হবে। লেবার পার্টি' দলের মত ছিল সারা ভারতে একটা আইনসঙ্গত মজুর পার্টি' (লেবার পার্টি') চাই। তাদের মতে বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টি'র নাকি গণভিত্তি হতে পারে না। আইনসঙ্গত মজুর পার্টি' করার মানে এই যে আমরা সোশ্যালিস্ট ঐক্য চাই না, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি'র বিরুদ্ধে একটা পাল্টা পার্টি' চাই। কমিউনিস্ট পার্টি' সেই লেবার পার্টি'র মধ্যে একটা অংশ হয়ে থাকবে। তাদের এই মতবাদ সমস্তটা এক করলে দেখা যায় যে তারা লেনিনবাদসম্মত বলশেভিক বিপ্লবী পন্থা অনুসরণ করছিল না।…

…জাতীয় ঐক্য না চাওয়া, সেদিনকার অবস্থায় সোশ্যালিস্ট ঐক্য নিন্দনীয় বলে প্রচার করা এবং বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টি'র গণভিত্তি হতে পারে না বলে একটা আইনসঙ্গত মজুর পার্টি নামে পাল্টা পার্টি তৈরী করা—এ হল বিপ্লব বরবাদ করার পন্থা।"[৪৬]

"১৯৩৮ সালের পার্টি কন্‌ফারেন্সের পর দত্ত মজুমদারের দল কোনদিনই পার্টি' শৃঙ্খলার প্রতি সম্মান দেখায় নি। ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করার প্রশ্ন নিয়ে যখন সঙ্কট দেখা দেয় তার অনেক আগেই দত্ত মজুমদারের দল পার্টি'র নেতাদের কাছে দাবী উপস্থিত করে যে পার্টি'র মধ্যে তাদের যদি স্বতন্ত্র দল হিসাবে থাকতে দেওয়া হয়, অর্থাৎ পার্টি'র নীতি তারা পছন্দ হলে মানবে আর পছন্দ না হলে মানবে না, এই শর্তে যদি পার্টি' তাদের সাথে চুক্তি করে তবেই তারা পার্টি'তে থাকবে, নতুবা তারা পার্টি'তে থাকবে না। বলা বাহুল্য পার্টি' এই প্রতিক্রিয়াশীল এবং পার্টি' ধ্বংসকারী দাবী মেনে নেয় নি। তাদের এই ধরনের দাবী থেকেই প্রমাণ হয় যে কমিউনিস্ট পার্টি'র ভিতর থেকে তারা পার্টি'কে ভাঙ্গতেই চেয়েছিল। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে পার্টি' থেকে তাদের সদলবলে বিতাড়িত করা হয়। তাদের বিতাড়িত করে সংগঠনের অরাজকতা থেকে পার্টি' মুক্ত হল, পার্টি'তে সংগঠনের শৃঙ্খলার জন্য লড়াই জয়যুক্ত হল।"[৪৭]

কমিউনিস্ট পার্টি' ও লেবার পার্টি': পার্থক্যসমূহ

ভবানী সেনের এই বিশ্লেষণ অনেকাংশেই একদেশদর্শী এবং এই বিশ্লেষণ লেবার পার্টি'র রাজনীতি সংক্রান্ত সঠিক চিত্রকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করে না। লেবার পার্টি'র কমিউনিস্টদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি'র রাজনৈতিক মতাদর্শগত ও দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য লেবার পার্টি'র ও বলশেভিক পার্টি'র পৃথক অস্তিত্বের সময় যেমন ছিল, তেমনই কমিউনিস্ট পার্টি'তে লেবার পার্টি'র কমিউনিস্টদের সাময়িক অবস্থানের সময়ও বিদ্যমান ছিল। যদিও ঐক্যের খাতিরে ঐ তিন বছর (১৯৩৬-১৯৩৯) এই পার্থক্য বা বিরোধকে সামনে আনা হত না এবং উভয় অংশই সাময়িক বোঝাপড়ায় আসেন।[৪৮] আমি এই পার্থক্যকে objectively আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

(১) ১৯৩৫ সালের জর্জি ডিমিট্রভের "যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্ব অনুযায়ী সি. পি. আই. মনে করত যেহেতু ভারতের সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর তথা তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি

কংগ্রেসের একটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা আছে, যদিও একইসঙ্গে একটি আপসকামী চরিত্রও আছে, সেহেতু কংগ্রেসে যোগ দিয়ে তার সঙ্গে "যুক্ত ফ্রন্ট" করে এই আপসকামী চরিত্রের সঙ্গে লড়াই করে তাদের সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার পথে টেনে আনতে হবে। কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব আপসকামী বলে সমালোচনা করে তাদের পরিত্যাগ করা হবে চরম সংকীর্ণতা। সেই কারণে সি. পি. আই. কংগ্রেসের গান্ধীবাদী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের সমালোচনা করলেও তাদের পরিত্যাগ করে নি। অপরদিকে লেবার পার্টি'র কমিউনিস্টরা "যুক্ত ফ্রন্ট" লাইন সম্পূর্ণরূপে মেনে নিলেও মনে করতেন কমিউনিস্ট পার্টি এই লাইনের অপব্যাখ্যা করেছে।[৪৯] কমিউনিস্ট পার্টি'তে অবস্থানকালীনই তাঁরা এই দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতেন, বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে বলশেভিক পার্টি গঠনের পর ১৯৪৪ সালের একটি *Draft Political Report* থেকে তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে—"The 'Communist' Party would 'agree' to all the principles of Marx-Leninism but would not carry them into practice, because *Leninism*, as P. C. Joshi put it, was 'out of date'; Dimitrov's thesis on *United Front* was reduced to the base theory of class collaboration with the reactionary Gandhian bourgeois leadership of the Congress.

The policy of this Party (Communist Party) has been to function as the propagandists of the Congress view, to protect the bourgeois leadership from the fury of the masses and to fight against those who would advocate *a militant*, *independent policy* of the working-class."[৫০]

লেবার পার্টি ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও আপসকামী চরিত্রের সমন্বয় স্বীকার করত। তথাপি লেবার পার্টি'র বক্তব্য ছিল, ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর যে অংশটি বৃহৎ বুর্জোয়া, যার রাজনৈতিক প্রতিনিধি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব, অর্থাৎ গান্ধী, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ, সেই অংশটি সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ত্যাগ করে আপসরফায় আগ্রহী, সুতরাং এই দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে "যুক্ত ফ্রন্ট" কখনওই সম্ভব নয়। আর বুর্জোয়া শ্রেণীর অপর অংশ, অর্থাৎ প্রগতিশীল অংশ, কংগ্রেসে যে অংশটির প্রতিনিধি মূলত বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা এবং প্রধানত সুভাষচন্দ্র বসু (লেবার পার্টি'র চোখে জওহরলাল নেহরু মতাদর্শগতভাবে বামপন্থী হলেও কার্যত দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতায় আগ্রহী নন), সেই অংশটির সঙ্গে যৌথভাবে "যুক্ত ফ্রন্ট" করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এবং দেশীয় বৃহৎ বুর্জোয়া ও তার প্রতিনিধি দক্ষিণপন্থী গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে লড়তে হবে।[৫১]

(২) "যুক্ত ফ্রন্ট" তত্ত্ব গ্রহণের পর থেকেই সি.পি.আই. সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়

ঐক্যের উপর বিশেষ জোর দিতে থাকে। বামপন্থী ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও সি.পি.আই. মূলত জোর দেয় ঐক্যবদ্ধ জাতীয় নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর। অপরদিকে লেবার পার্টি গ্রুপ এবং পরবর্তীকালে বলশেভিক পার্টি (১৯৪১ সাল পর্যন্ত) বিশেষভাবে জোর দেয় বামপন্থী ঐক্যের উপর। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনেই এই পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। পন্থ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতারা যে ভাষণ দেন, তার থেকে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, লেবার পার্টি গ্রুপের নেতা নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের ভাষণের সুর ছিল আলাদা। ভরদ্বাজ, আশরফ প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতারা পন্থ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তৃতা দিলেও শুধুমাত্র বামপন্থী নেতৃত্ব নয়, ঐক্যবদ্ধ জাতীয় নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে বিশেষ সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকেন, কারণ তাতে কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরতে পারে।[৫২] অপরদিকে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার পন্থ প্রস্তাবকে বিরোধিতা করে যে বক্তৃতা দেন, তাতে তিনি বামপন্থী ঐক্যের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন।[৫৩] দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে আক্রমণ করে এই বক্তৃতার জন্য নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক তীব্রভাবে সমালোচিত ও ভৎর্সিত হন। *National Front* পত্রিকার ১৯ মার্চ ১৯৩৯ সংখ্যায় (Vol. II,No. 6) পি. সি. যোশী ও অজয়কুমার ঘোষের কলমে ত্রিপুরী অধিবেশনে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও বঙ্কিম মুখার্জীর বক্তৃতার জন্য তাঁদের প্রকাশ্য সমালোচনা করা হয় এবং তাঁদের বিরুদ্ধে "বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদ" ও "ঐক্যবিরোধিতার" অভিযোগ আনা হয়।[৫৪] ১৯৩৯ সালের ৩ মে সুভাষচন্দ্র বসু ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করার[৫৫] পর নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টি গ্রুপ ফরওয়ার্ড ব্লককে "ঐতিহাসিক প্রয়োজন" বলে অভিনন্দন জানায়[৫৬] এবং ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেয়, যদিও এই গ্রুপের সদস্যরা ফরওয়ার্ড ব্লকের কোনও পদগ্রহণ করেন নি।[৫৭] সি. পি. আই.-এর সদস্যরা কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন নি, যদিও একসঙ্গে আন্দোলন করেছেন। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে রামগড়ে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সময় রামগড়েই সুভাষচন্দ্র বসু পাল্টা "Anti-Compromise Conference" বা "আপস-বিরোধী সম্মেলন" করেন। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা ও কমিউনিস্টরা মূল কংগ্রেস অধিবেশনেই যোগ দেন। কিন্তু স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী, এন. জি. রঙ্গ, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক প্রমুখ কৃষক সভার নেতৃবৃন্দ এবং নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক পার্টি সুভাষচন্দ্র বসুর "আপস-বিরোধী সম্মেলনে" যোগ দেন।[৫৮] এই সমস্তই হচ্ছে "জাতীয় ঐক্য" বনাম "বামপন্থী ঐক্য" বিতর্কের বাস্তব প্রতিফলন।

(৩) লেবার পার্টির কমিউনিস্টরা সি. এস. পি.-কে কংগ্রেসের "বি" টীম মনে করতেন। তাঁরা বলতেন, সি. এস. পি. গান্ধীবাদী মোহ থেকে মুক্ত নয়, সুতরাং সি. এস. পি.-র সঙ্গে একসাথে কাজ করা যেতে পারে, ফ্যাকশনালিজ্‌ম্ করার জন্য সি.

এস. পি.-তে প্রবেশ করা যেতে পারে, কিন্তু সি. এস. পি.-তে যোগ দিয়ে তাকে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করে তোলা কমিউনিস্ট সুলভ কাজ নয়। কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু সি. এস. পি.-কেই প্রকাশ্য platform হিসাবে ব্যবহার করেছে এবং সি. এস. পি.-র সঙ্গে ঐক্য বজায় রাখতে বিশেষ আগ্রহী ছিল। ঐক্যের স্বার্থে লেবার পার্টির কমিউনিস্টরা এটা মেনে নেন।[৫৯]

(৪) লেবার পার্টির কমিউনিস্টরা জোর দিতেন শ্রমিক-কৃষকের নিজস্ব দাবিদাওয়া আদায়ের লড়াই-এর উপর এবং তাঁদের বক্তব্য ছিল, এই আর্থনীতিক আন্দোলনকেই রাজনীতিক আন্দোলনে অর্থাৎ স্বাধীনতার ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে উন্নত করতে হবে। লেবার পার্টির বক্তব্য ছিল, জমি তৈরি করে রাজনৈতিক স্লোগান দিতে হবে, না হলে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে, কারণ শ্রমিক-কৃষক এখনও যথেষ্ট সচেতন হয়ে না ওঠায় এই রাজনৈতিক স্লোগান গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। অবশ্য লেবার পার্টির কমিউনিস্টরা রাজনৈতিক আন্দোলনের উপরও জোর দিয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টির চোখে লেবার পার্টির কমিউনিস্টদের কাজকর্ম ছিল অর্থনীতিবাদ ও সংস্কারবাদের দোষে বিশেষভাবে দুষ্ট, কারণ তাঁরা অর্থনৈতিক আন্দোলনের উপরই বেশী জোর দিচ্ছেন। অপরদিকে লেবার পার্টির কমিউনিস্টদের বক্তব্য ছিল, কমিউনিস্ট পার্টি "বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী" নীতি গ্রহণ করেছে।[৬০]

(৫) লেবার পার্টির কমিউনিস্টরা প্রকাশ্য কাজকর্মের উপর বেশী জোর দিতেন এবং আইনী কাজকর্মকেই বেশী মূল্য দিতেন, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ও গোপন কাজকর্মের উপরই বেশী জোর দিত, কারণ তা না হলে নিজেদের অনাবৃত করা হয়ে যাবে এবং পার্টি গঠনের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হবে।[৬১]

(৬) লেবার পার্টির কমিউনিস্টদের চোখে কমিউনিস্ট পার্টি প্রকৃত অর্থে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি ছিল না, এই পার্টি ছিল পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের পার্টি, কারণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে প্রায় কোনও শ্রমিক ছিলেন না। লেবার পার্টির কমিউনিস্টরা অপরদিকে বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন পার্টিতে শ্রমিক-কৃষকের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করার উপর অর্থাৎ পার্টিতে শ্রমিক-কৃষক content বাড়ানোর উপর এবং শ্রমিকদের পার্টি নেতৃত্বপদে নিয়ে আসার উপর। লেবার পার্টির কমিউনিস্টদের বক্তব্য ছিল, শ্রমিক-কৃষককে অধিক সংখ্যায় পার্টিতে এনে তাঁদের রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে পার্টিনেতৃত্বে নিয়ে আসতে হবে। তাঁরা এই বক্তব্যকে বাস্তবায়িতও করেছেন। শ্রমিকদের মধ্য থেকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে অনেকেই লেবার পার্টির নেতৃত্বে এসেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম আমি আগেই লিখেছি। অপরদিকে কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য ছিল, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীচ্যুত হয়ে কমিউনিস্ট হলে তাঁর সঙ্গে শ্রমিক কমিউনিস্টের কোনও পার্থক্য থাকতে পারে না। বিপ্লবী চেতনা সমৃদ্ধ শ্রেণীচ্যুত বুদ্ধিজীবীরাও সাচ্চা কমিউনিস্ট হতে পারেন। লেবার পার্টির কমিউনিস্টরা এই ব্যাপারে একমত হয়েও শ্রমিকনেতৃত্ব তৈরি করার উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।[৬২]

বলশেভিক পার্টি গঠন

১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে লেবার পার্টি'র কমিউনিস্টরা কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে এসে বলশেভিক পার্টি গঠন করেন। ১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে (১৯৩৯-১৯৪৫) বলশেভিক পাঁর্টি'র ভূমিকা ও ক্রিয়াকলাপের পর্যালোচনা পৃথক এক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

সূত্রনির্দেশ :

[এই সংকলনভুক্ত বর্তমান ও পরবর্তী প্রবন্ধদ্বয় রচনার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারসূত্রে সংগৃহীত তথ্যাবলীর এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি'র তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সাক্ষাৎকার যেমন নেওয়া হয়েছে, তেমনই কমিউনিস্ট পার্টি'র তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় নেতার কাছ থেকেও সাক্ষাৎকারসূত্রে প্রাসঙ্গিক তথ্য পেয়ে উপকৃত হয়েছি। অন্যান্য বিভিন্ন সূত্র থেকে যেমন তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তেমনই এই সমস্ত সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকারও বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি সংক্রান্ত আমার তথ্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে। বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি সম্পর্কিত তথ্য সঞ্চয়নের জন্য যাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার (১৫. ৮. ১৯৮৭.), নির্মল সেনগুপ্ত (১৮. ৮. ১৯৮৭., ২. ৫. ১৯৮৯.), প্রমোদ সেন (২০. ৮. ১৯৮৭., ২১. ৮. ১৯৮৭.), কমল সরকার (২৮. ৪. ১৯৮৯., ৩. ৫. ১৯৮৯., ২৫. ৮. ১৯৮৯., ২৭. ৮. ১৯৮৯., ৮. ৯. ১৯৮৯.), নন্দলাল বসু (১৩. ৬. ১৯৮৬., ১৭. ৬. ১৯৮৬., ২৪. ৮. ১৯৮৬., ৩০. ৪. ১৯৮৭., ৬. ৫. ১৯৮৭., ১১. ৫. ১৯৮৭., ১২. ৮. ১৯৮৭., ৭. ৫. ১৯৮৯., ১০. ৫. ১৯৮৯.), সুরেশ দাসগুপ্ত (১৪. ৮. ১৯৮৭., ১৯. ৮. ১৯৮৭.), বরদা মুকুটমণি (৯. ৯. ১৯৮৭.) ও গৌতম চট্টোপাধ্যায় (১৭. ৮. ১৯৮৭.)। এছাড়াও কমিউনিস্ট পার্টি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ দিন ধরে রণেন সেনের যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি (২৮. ৪. ১৯৮৬., ২. ৫. ১৯৮৬., ৬. ৫. ১৯৮৬., ৮. ৫. ১৯৮৬., ১৫. ১. ১৯৮৭., ২১. ১. ১৯৮৭., ২৭. ১২. ১৯৮৮., ২২. ৫. ১৯৯০.), তা থেকেও বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি সংক্রান্ত যথেষ্ট তথ্য অবগত হয়েছি। গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের কমিউনিস্ট পার্টি-বিষয়ক অন্যান্য দিনের সাক্ষাৎকার (৪. ৬. ১৯৮৬., ১২. ৬. ১৯৮৬., ৬. ৮. ১৯৮৬., ৮. ৪. ১৯৮৭., ১৩. ৪. ১৯৮৭.) থেকেও যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। প্রথম বন্ধনীর মধ্যে সাক্ষাৎকারের তারিখগুলি উল্লেখ করা হল। যেহেতু বিভিন্ন দিনের সাক্ষাৎকারে একই বিষয়ের আলোচনা অনেক সময়েই ঘুরে ফিরে এসেছে, সেহেতু স্থানসংক্ষেপের প্রয়োজনে সূত্রনির্দেশ-এ সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন তারিখের আর আলাদা করে উল্লেখ করলাম না, কেবলমাত্র যাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, তাঁদের নাম উল্লেখ করলাম।]

১. Intelligence Branch (I. B.), Government of Bengal—File No. 929 / 1935 (Year—1935) ; Panchanan Saha, 'The Communist Movement in India : The Formative Period', *Problems of National Liberation*, (hereafter *P. N. L.*), Vol. IV., No. 1., December, 1980, Calcutta, pp. 42, 44 ; সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, নির্মল সেনগুপ্ত, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু, সুরেশ দাসগুপ্ত, বরদা মুকুটমণি ও গৌতম চট্টোপাধ্যায় ; David M. Laushey, *Bengal Terrorism and the Marxist Left : Aspects of Regional Nationalism in India, 1905-1942*, Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1975, p. 115 ; Home / Poll. / F. No. 7/20/1934 & K. W., Serial Nos. 1-4, (hereafter Home / Poll. / F. No. 7/20/1934) ; Subodh Roy (ed.), *Communism in India : Unpublished Documents*, (Volume I), (1925—1934), National Book Agency, Calcutta, 1980, p. 408 ; কমল সরকার, 'কমরেড সুধা রায়', শ্রমিক আন্দোলন, বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৮, আগস্ট, ১৯৮৭, কলকাতা, পৃ ২৭৯ ; কমল সরকার, '১৯৩৪ সালে কলকাতার ডক শ্রমিক ধর্মঘট —একটি পর্যালোচনা', শ্রমিক আন্দোলন, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৪, এপ্রিল, ১৯৮৯, কলকাতা, পৃ ১১৯ ।

২. I. B., File No. 929/1935 ; I. B., File No. 1201/1933 (Year—1933) ; Panchanan Saha, op. cit., *P. N. L.*, p. 42 ; সাক্ষাৎকার—নির্মল সেনগুপ্ত ও নন্দলাল বসু ।

৩. I. B., File No. 728/1941 (Year—1941) ; সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, নির্মল সেনগুপ্ত, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু, সুরেশ দাসগুপ্ত, বরদা মুকুটমণি ও গৌতম চট্টোপাধ্যায় ; Horace Williamson, *India and Communism*, (With an introduction and explanatory notes by Mahadevaprasad Saha), Editions Indian, Calcutta, 1976, pp. 242-43 ; David M. Laushey, op. cit., p. 115 ; Panchanan Saha, op. cit., *P. N. L.*, p. 42 ; নির্মল সেনগুপ্ত, লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিজমের প্রভাব, নিশান প্রকাশনী, কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৮৯, পৃ ৩৫-৩৭, ৪১, ৫৪-৫৫, ৯৯, ১০৫ ; মনোরঞ্জন রায়, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও শ্রমিক আন্দোলন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, জুলাই, ১৯৮৭, পৃ ৪৫ ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, প্রথম খণ্ড (১৯৩০-১৯৪১), গণশক্তি পত্রিকা দপ্তর, কলকাতা, মে, ১৯৮৫, পৃ ৬১ ; রণেন সেন, বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০-'৪৮), বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, মে, ১৯৮১, পৃ ৬৭-৬৮ ।

৪. সাক্ষাৎকার—প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু ও সুরেশ দাসগুপ্ত ; Panchanan Saha, op. cit., *P.N.L.*, p. 42 ; মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪৫ ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৬১ ; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৬৮।

৫. সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু ও সুরেশ দাসগুপ্ত ; সুরেশ দাসগুপ্তের আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিচারণ (অপ্রকাশিত), ১৯৭৮, পৃ ৩৯-৪১ (১৯৭৮ সালে লিখিত অপ্রকাশিত ৪২ পৃষ্ঠা পাণ্ডুলিপির ৩৯-৪১ পৃষ্ঠা) ; Panchanan Saha, op. cit., *P. N. L.*, p. 42 ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৬১।

৬. সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, নির্মল সেনগুপ্ত, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু, সুরেশ দাসগুপ্ত, বরদা মুকুটমণি ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়।

৭. সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, নির্মল সেনগুপ্ত, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু ও সুরেশ দাসগুপ্ত।

৮. Panchanan Saha, op. cit., *P. N. L.*, pp. 42-43 ; I. B., File No. 929/1935.

৯. Panchanan Saha, op. cit., *P. N. L.*, p. 43 ; I. B., File Nos. 1201/1933 and 929/1935.

১০. *New Front*, Vol. I, No. 1, September 1, 1933, Calcutta, in L. P. Sinha, *The Left-Wing in India (1919-47)*, New Publishers, Muzaffarpur, April, 1965, p. 267.

১১. Ibid., p. 268 ; Satyabrata Rai Chowdhuri, *Leftist Movements in India : 1917-1947*, Minerva Associates (Publications) Pvt. Ltd., Calcutta, 1977, p. 230 ; Sada Nand Talwar, *Under the Banyan Tree : The Communist Movement in India : 1920-1964*, Allied Publishers Private Limited, New Delhi, 1985, p. 201.

১২. 'Speech delivered by Niharendu Dutta Mazumdar at the U. P. Labour Conference, July, 1933' and 'Bengal Labour Party Thesis with explanatory notes by Niharendu Dutta Mazumdar', in *New Front*, Vol. I, No. 1, September 1, 1933, Calcutta, in L. P. Sinha, op. cit., p. 268 ; S. Rai Chowdhuri, op. cit., p. 230 ; S. N. Talwar, op. cit., p. 201.

১৩. Naresh Chandra Sen Gupta, 'Our Duty Towards Labour', *New Front*, Vol. I., No. 2, September 15, 1933, Calcutta, in Sinha, op. cit., p. 268.

১৪. Ibid., pp. 268-69.

১৫. *New Front*, November 3, 1933, Calcutta, in Sinha, op. cit., p. 269.

১৬. সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, নির্মল সেনগুপ্ত, প্রমোদ সেন, কমল সরকার , নন্দলাল বসু ও সুরেশ দাসগুপ্ত ; Sinha, op. cit, p. 269.

১৭. সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, নির্মল সেনগুপ্ত, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু ও সুরেশ দাসগুপ্ত ; কমল সরকার, পূর্বোল্লিখিত, শ্রমিক আন্দোলন, এপ্রিল, ১৯৮৯, পৃ ১২৩ ; মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৩, ২৬-২৭, ২৯-৩১, ৩২, ৩৬-৩৭ ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৭৭ ; মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, 'বন্দর শ্রমিক ধর্মঘট (১৯৩৪) ও কমিউনিস্ট নেত্রী সুধা রায় ,' ইতিহাস-অনুসন্ধান, তৃতীয় খণ্ড, গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড্ কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ ৪১৮ ; মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলাদেশের প্রথম যুগের (১৯২০-৪০) শ্রমিক আন্দোলনে মহিলা নেতৃত্ব,' ভারত-ইতিহাসে নারী, রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী (সম্পাদিত), কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড্ কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ ১০৪-০৫ ।

১৮. সাক্ষাৎকার—নির্মল সেনগুপ্ত, কমল সরকার ও নন্দলাল বসু ; কমল সরকার, 'হাফিজ জালালুদ্দিন স্মরণে,' লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিজমের প্রভাব, নির্মল সেনগুপ্ত (লিখিত), পৃ ৫ ; নির্মল সেনগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩ ; কমল সরকার, 'বিহারের শ্রমিক নেতা কমরেড নকুল গুহ', শ্রমিক আন্দোলন, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৯, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯, কলকাতা, পৃ ৩৬২ ; মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪৮, ৮৬-৮৮ ।

১৯. সাক্ষাৎকার—নন্দলাল বসু ।

২০. Home/Poll./F.No. 7/20/1934 ; Subodh Roy (ed.), op. cit., pp. 408-10 ; কমল সরকার, পূর্বোল্লিখিত, শ্রমিক আন্দোলন, আগস্ট, ১৯৮৭, পৃ ২৭৯ ; কমল সরকার, পূর্বোল্লিখিত, শ্রমিক আন্দোলন, এপ্রিল, ১৯৮৯, পৃ ১১৯-২০ ; সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, প্রমোদ সেন, কমল সরকার ও নন্দলাল বসু ।

২১. Home / Poll. / F. No. 7/20/1934 ; Subodh Roy (ed.), op. cit., pp. 411-17 ; I. B., File No. 929/1935 ; কমল সরকার, 'হাফিজ জালালুদ্দিন স্মরণে', পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫ ; কমল সরকার, পূর্বোল্লিখিত, শ্রমিক আন্দোলন, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯, পৃ ৩৬২ ; সাক্ষাৎকার—কমল সরকার ও নন্দলাল বসু ।

২২. এই ডকশ্রমিক ধর্মঘটের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন—নয়া মজদুর, লাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির মুখপত্র, নিতাই ব্যানার্জী সম্পাদিত,

দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, ৮ই ডিসেম্বর, শনিবার, ১৯৩৪, কলকাতা, পৃ ৪ ; I. B., File No. 929/1935 ; Home/Poll./F.No. 7/20/1934 ; Subodh Roy (ed.), op. cit., p. 416 ; কমল সরকার, পূর্বোল্লিখিত, শ্রমিক আন্দোলন, এপ্রিল, ১৯৮৯, পৃ ১১৯-২৩ ; সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, নির্মল সেনগুপ্ত, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু, সুরেশ দাসগুপ্ত, বরদা মুকুটমণি ও গৌতম চট্টোপাধ্যায় ; Panchanan Saha, *History of the Working-Class Movement in Bengal*, People's Publishing House, New Delhi, August, 1978, pp. 140-42 ; মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, ইতিহাস-অনুসন্ধান, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৪১৩-১৯ ; মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, ভারত-ইতিহাসে নারী, পৃ ৯৯-১০৫ ; Williamson, op. cit., p. 243 ; Laushey, op. cit., p. 116.

২৩. কমল সরকার, পূর্বোল্লিখিত, শ্রমিক আন্দোলন, এপ্রিল, ১৯৮৯, পৃ ১২১ ; সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু ও সুরেশ দাসগুপ্ত ; Laushey, op. cit., p. 116.

২৪. I. B., File No. 929/1935 ; Home / Poll. / F. No. 7/20/1934 ; Subodh Roy (ed.), op. cit., pp. 408-10 ; Panchanan Saha, 'The Communist Movement in India : The Formative Period', *P. N. L.*, op. cit., p. 45 ; Williamson, op. cit., p. 243 ; সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু ও সুরেশ দাসগুপ্ত।

২৫. Panchanan Saha, op. cit., *P. N. L.*, p. 43 ; সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার।

২৬. সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার।

২৭. মার্ক্স-পন্থী, আব্দুল হালিম সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৪০ বাংলা সন (বা. স.), ফেব্রুআরি, ১৯৩৪, কলকাতা, পৃ ১২২-২৩ ; সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু ও সুরেশ দাসগুপ্ত ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৭৯ ; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৭৬-৭৭ ; I.B., File No. 929/1935 ; Williamson, op. cit., p. 195.

২৮. মার্ক্স-পন্থী, আব্দুল হালিম সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪১ বা. স., মে-দিবস বিশেষ সংখ্যা, মে, ১৯৩৪, কলকাতা, পৃ ১৭৩ ; *The Amrita Bazar Patrika*, Calcutta, October 4, 1934, p. 3 ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৭৯-৮০ ; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৭৭-৮০ ; সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, প্রমোদ সেন, কমল সরকার ও নন্দলাল

বসু ; Home/Poll./F. No. 7/20/1934 ; Subodh Roy (ed.), op. cit., pp. 389-91, 414 ; Panchanan Saha, op. cit., *P.N.L.*, p. 35 ; Williamson, op. cit., pp. 195-96, 245.

২৯. Home / Poll. / F. No. 7/20/1934 ; Home / Poll. / F. No. 22/68/1935 ; Subodh Roy (ed.), op. cit., pp. 391, 414 ; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৮০-৮১ ; সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও নন্দলাল বসু।

৩০. সাক্ষাৎকার—নন্দলাল বসু।

৩১. Home/Poll./F. No. 7/20/1934 ; Subodh Roy (ed.), op. cit., pp. 406-07 ; Panchanan Saha, op. cit., *P. N. L.*, pp. 44-45.

৩২. Home/Poll./F. No. 7/20/1934 ; Subodh Roy (ed.), op. cit., pp. 407-08.

৩৩. Home/Poll./F. No. 7/20/1934 ; Home/Poll./F. No. 7/25/1934 ; Subodh Roy (ed.), op. cit., pp. 197, 463 ; Panchanan Saha, op. cit., *P. N. L.*, p. 46 ; I. B., File No. 929/1935.

৩৪. Home/Poll./F. No. 24/15/1935 ; Home/Poll./F. No. 7/20/1934 ; Subodh Roy (ed.), op. cit., (1925-1934), pp. 377, 406, 466 ; Subodh Roy (ed.), *Communism in India : Unpublished Documents*, (Volume II), (1935-1945), National Book Agency, Calcutta, December, 1985, pp. 49-50 ; Panchanan Saha, op. cit., *P. N. L.*, p. 46 ; I. B., File No. 929/1935.

৩৫. সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, নির্মল সেনগুপ্ত, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু ও সুরেশ দাসগুপ্ত।

৩৬. Home/Poll. F. Nos. 24/15/1935 and 7/20/1934 ; Subodh Roy (ed.), op. cit., (1925-1934), pp. 377, 406, 466, and op. cit., (1935-1945), pp. 49-50 ; Panchanan Saha, op. cit., *P. N. L.*, p. 46 ; I. B., File No. 929/1935.

৩৭. Georgi Dimitrov, 'The Offensive of Fascism and the Tasks of the C. I. in the Struggle for the Unity of the Working Class against Fascism', (Reports to the Seventh Congress), *International Press Correspondence* (*Inprecor*), Vol. 15, No. 37, 20 August, 1935.

৩৮. সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, নির্মল সেনগুপ্ত, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু, সুরেশ দাসগুপ্ত, বরদা মুকুটমণি ও গৌতম চট্টোপাধ্যায় ;

সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৯৬ ; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৯৩, ১০৮।

৩৯. কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানকারী লেবার পার্টির কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির অভিযোগ ও বক্তব্য নিম্নলিখিত তথ্যসূত্রগুলি থেকে সংগৃহীত হয়েছে—

আব্দুল হালিম ও সোমনাথ লাহিড়ী, 'টেনে নামাতে দেব না,' গণশক্তি, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুআরি, ১৯৩৯ ; আব্দুল হালিম ও সোমনাথ লাহিড়ী, 'টেনে নামাতে দেব না,' সোমনাথ লাহিড়ী রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (১৯৩১-১৯৪৫), মনীষা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫, পৃ ১৬৭-৭৬ ; ভবানী সেন, রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট, ১৯৪৩ সালের ১৮-২১ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত তৃতীয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের শাখা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলনে পঠিত ও সম্মেলনে গৃহীত, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের শাখা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির তরফে নিরঞ্জন সেন কর্তৃক আরও কয়েকটি দলিল সহ বাংলায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯৪৩, পৃ ৪-৬, ১০-১২ ১৪-১৬, ২৩-২৪, (প্রথম প্রবন্ধ) ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৩০-৩১, ১৭২ ; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১০৮। আব্দুল হালিম ও সোমনাথ লাহিড়ীর লেখা 'টেনে নামাতে দেব না' শীর্ষক প্রবন্ধে কমিউনিস্ট পার্টিতে অবস্থানকারী লেবার পার্টির কমিউনিস্টদের নাম উল্লেখ না করে বিভিন্ন অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালানো হয়।

অপর দিকে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, প্রমোদ সেন, নির্মল সেনগুপ্ত, কমল সরকার, নন্দলাল বসু, সুরেশ দাসগুপ্ত ও বরদা মুকুটমণির বিভিন্ন দিনের সাক্ষাৎকার থেকে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে লেবার পার্টির কমিউনিস্টদের যাবতীয় অভিযোগ ও বক্তব্য সংগৃহীত হয়েছে। নির্মল সেনগুপ্ত, কমল সরকার, নন্দলাল বসু, সুরেশ দাসগুপ্ত ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার এবং মনোরঞ্জন রায়ের (পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪৫-৪৭) লেখা থেকে কমিউনিস্ট পার্টি ও লেবার পার্টির কমিউনিস্ট—উভয় পক্ষেরই পারস্পরিক অভিযোগ ও বক্তব্যের একটি সম্যক্ চিত্র পাওয়া যায়।

৪০. সাক্ষাৎকার—প্রমোদ সেন, নির্মল সেনগুপ্ত, কমল সরকার, নন্দলাল বসু, সুরেশ দাসগুপ্ত ও বরদা মুকুটমণি ; ভবানী সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৫-১৬ ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৩০-৩১, ১৭২ ; রণেন সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১০৮-০৯।

৪১. নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, নির্মল সেনগুপ্ত, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু, সুরেশ দাসগুপ্ত ও বরদা মুকুটমণি বিভিন্ন দিনের সাক্ষাৎকারে আমাকে জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে, তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।

অবশ্য নির্মল সেনগুপ্ত, কমল সরকার ও নন্দলাল বসু মনে করেন, কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে এসে তাঁরা ঠিক কাজ করেন নি। মনোরঞ্জন রায় মনে করেন, "পার্টি থেকে বের হয়ে এসে আমরা মারাত্মক ভুল করেছি।" (পৃ ৪৮, ৪৯)। তিনি এটাকে "অমার্জনীয় অপরাধ" (পৃ ৪৯) বলেও মনে করেন।

৪২. ভবানী সেন লিখেছেন, "১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে পার্টি থেকে তাদের সদলবলে বিতাড়িত করা হয়।" (পৃ ১৬)। রণেন সেন লিখেছেন, "……নীহারেন্দু কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। তাঁর সঙ্গে কমল সরকার, মনোরঞ্জন রায় প্রভৃতি উল্লিখিত কমরেডরা সি. পি. আই. থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।" (পৃ ১৪১)। অন্যত্রও (পৃ ১১৫) এই প্রসঙ্গে রণেন সেন একই কথা লিখেছেন। এই প্রসঙ্গে সরোজ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার তাঁর দলবল নিয়ে পার্টির বাইরে চলে যান। পরে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার সহ কয়েকজনকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করে দেন।" (পৃ ১৩১)। অন্যত্র প্রসঙ্গক্রমে সরোজ মুখোপাধ্যায় "নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার গোষ্ঠীর পার্টি ছাড়ার" কথা লিখেছেন (পৃ ১৭২)। এই প্রসঙ্গে গৌতম চট্টোপাধ্যায় তাঁর ১৭. ৮. ১৯৮৭. তারিখের সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেন, "লেবার পার্টির কমিউনিস্টরা সি. পি. আই. থেকে বেরিয়ে যান বা ১৯ জন expelled হন।"

৪৩. সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, নির্মল সেনগুপ্ত, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু, সুরেশ দাসগুপ্ত, বরদা মুকুটমণি ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়; মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫০; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৩১; Sinha, op. cit., p. 472; S. Rai Chowdhuri, op. cit., p. 230; Talwar, op. cit., p. 201. Sinha, Rai Chowdhuri ও Talwar সকলেই "সি. পি. আই. থেকে বেরিয়ে এসে বলশেভিক পার্টি অভ্ ইণ্ডিয়া গঠন করার" কথাই লিখেছেন।

৪৪. *National Front*, Vol. II, No. 29, September 3, 193?, Bombay, p. 462; সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, নির্মল সেনগুপ্ত, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু, সুরেশ দাসগুপ্ত ও বরদা মুকুটমণি।

৪৫. ভবানী সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪-৫।

৪৬. তদেব, পৃ ১০-১১।

৪৭. তদেব, পৃ ১৫-১৬।

৪৮. সাক্ষাৎকার—নির্মল সেনগুপ্ত, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু, সুরেশ দাসগুপ্ত ও বরদা মুকুটমণি।

৪৯. সাক্ষাৎকার—নির্মল সেনগুপ্ত, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু ও সুরেশ দাসগুপ্ত।

৫০. *Indian Politics : 1941-44*, Draft Political Report of the Politbureau of the Bolshevik Party of India, Published by the Politbureau of the Bolshevik Party of India, Calcutta, June, 1944, *Preface*, p. 1.

৫১. সাক্ষাৎকার—নির্মল সেনগুপ্ত, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু ও সুরেশ দাসগুপ্ত।

৫২. P. C. Joshi, 'Tripuri', *National Front*, Vol. II, No. 6, March 19, 1939, Bombay, pp. 96-97.

৫৩. Ibid., p. 97.

৫৪. P. C. Joshi, 'Tripuri', and Ajoy kumar Ghosh, 'Communists At Tripuri', *National Front*, Vol. II, No. 6, March 19, 1939, pp. 97, 100 (Joshi), and p. 101 (A. K. Ghosh) ; Special Branch (S. B.), Government of Bengal—File No. S. R. 506/1939 (Part-I).

৫৫. Sinha, op. cit., p. 462 ; Talwar, op. cit., p. 196.

৫৬. ভবানী সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৫।

৫৭. সাক্ষাৎকার—নির্মল সেনগুপ্ত, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু ও সুরেশ দাসগুপ্ত ; ভবানী সেন, পৃ ১৫ ; রণেন সেন, পৃ ১১৪-১৫ ; মনোরঞ্জন রায়, পৃ ৪৯-৫০ ; S. B., File Nos. S. R. 688/1939 and S. R. 506/1940 (Part-II).

৫৮. সাক্ষাৎকার—নির্মল সেনগুপ্ত, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু, সুরেশ দাসগুপ্ত ও বরদা মুকুটমণি ; মনোরঞ্জন রায়, পৃ ৫০, ৫২ ; S. B., File Nos. S. R. 688/1939 and S. R. 506/1940 (Part-II).

৫৯. সাক্ষাৎকার—নির্মল সেনগুপ্ত, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু ও সুরেশ দাসগুপ্ত ; মনোরঞ্জন রায়, পৃ ৪৩-৪৫।

৬০. কমিউনিস্ট পার্টি'র বক্তব্য—আব্দুল হালিম ও সোমনাথ লাহিড়ী, 'টেনে নামাতে দেব না', গণশক্তি, জানুআরি, ১৯৩৯ ; সোমনাথ লাহিড়ী রচনাবলী, (১৯৩১-১৯৪৫), পৃ ১১১, ১১৪-১৬ ; ভবানী সেন, পৃ ৪-৬ ; রণেন সেন, পৃ ৬৮ ; সরোজ মুখোপাধ্যায়, পৃ ১৩০-৩১ ; সাক্ষাৎকার—নির্মল সেনগুপ্ত, কমল সরকার, নন্দলাল বসু, সুরেশ দাসগুপ্ত ও গৌতম চট্টোপাধ্যায় ; Sinha, p. 269 ; S. Rai Chowdhuri, p. 230 ; Talwar, p. 201.

লেবার পার্টি'র কমিউনিস্টদের বক্তব্য—সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত

মজুমদার, নির্মল সেনগুপ্ত, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু ও সুরেশ দাসগুপ্ত।

৬১. সাক্ষাৎকার—নির্মল সেনগুপ্ত, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু ও সুরেশ দাসগুপ্ত।

৬২. সাক্ষাৎকার—নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, নির্মল সেনগুপ্ত, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু ও সুরেশ দাসগুপ্ত ; মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪৬।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বলশেভিক পার্টি : ১৯৩৯-১৯৪৫

তিরিশের ও চল্লিশের দশকে অবিভক্ত বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও বেশ কয়েকটি দল যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। এই দলগুলির মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাম বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি। ১৯৩৯ সালে বেঙ্গল লেবার পার্টি'র সদস্যরাই পার্টি'র নাম দেন বলশেভিক পার্টি। বর্তমান নিবন্ধের বিষয়-বস্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে (১৯৩৯-১৯৪৫) বলশেভিক পার্টি'র ভূমিকা ও ক্রিয়াকলাপ। এই প্রবন্ধটি লেখার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে মূলত জাতীয় মহাফেজখানা, বঙ্গীয় পুলিস-সূত্র এবং তৎকালীন বেঙ্গল লেবার পার্টি'র ও বলশেভিক পার্টি'র নেতৃস্থানীয় বিভিন্ন সদস্যের সাক্ষাৎকার থেকে। প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামতের দায়িত্ব একান্তভাবেই আমার এবং এই মতামতের সঙ্গে আমায় যাঁরা সাক্ষাৎকার ও উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁরা একমত নাও হতে পারেন।

বলশেভিক পার্টি গঠন

বেঙ্গল লেবার পার্টি'র তৎকালীন নেতাদের বক্তব্য অনুযায়ী ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বাধীন সমগ্র লেবার পার্টি গ্রুপটিই (নিত্যানন্দ চৌধুরী বাদে, আর এই গ্রুপে নতুন যোগ দেন মনোরঞ্জন রায়, নরেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন) কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।[১] আর অপরদিকে কমিউনিস্ট পার্টি'র ভাষ্য অনুযায়ী তাঁদের পার্টি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল।[২] কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর কমিউনিস্ট পরিচয় রক্ষা করে নতুন পার্টি'র কি নামকরণ করা যায়, এই প্রশ্নটি লেবার পার্টি গ্রুপের সামনে বড় হয়ে দেখা দিল। কিছুদিনের মধ্যেই সুধা রায়ের ৮, হাজরা লেনের বাড়িতে গ্রুপের একটি সভা ডাকা হল। ঐ সভায় নতুন পার্টি গঠন করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল এবং প্রমোদ সেনের প্রস্তাব অনুযায়ী নবগঠিত পার্টির নাম দেওয়া হল বলশেভিক পার্টি অভ্ ইণ্ডিয়া (Bolshevik Party of India)। শিশির রায়, বিশ্বনাথ দুবে প্রমুখ অনেকেই চেয়েছিলেন, নবগঠিত পার্টি'র কমিউনিস্ট পার্টি নামকরণ করা হোক্, কিন্তু তাতে অযথা জটিলতা সৃষ্টি হবে বলে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। এই বলশেভিক পার্টি প্রথম থেকেই গোপন সংগঠন হিসাবে গড়ে ওঠে। বলশেভিক পার্টি'র প্রকাশ্য ও আইনসঙ্গত platfrom ছিল পুরাতন বেঙ্গল লেবার পার্টি।[৩] যদিও বলশেভিক পার্টি'ই ছিল বেঙ্গল লেবার পার্টি'র core, কিন্তু উভয় পার্টি'র কাঠামো, সম্পাদক প্রভৃতি সবই পৃথক্ ছিল। যেমন, ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে গঠিত হওয়ার সময় বলশেভিক পার্টি'র প্রথম সাধারণ সম্পাদক হন প্রমোদ সেন, কিন্তু তখন প্রকাশ্য সংগঠন বেঙ্গল লেবার পার্টি'র সাধারণ সম্পাদক ছিলেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার।[৪]

বলশেভিক পার্টি ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ" : ১৯৩৯-১৯৪১

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর নাৎসী জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে এবং ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স দীর্ঘদিন অনুসৃত নাৎসী-তোষণ নীতি পরিত্যাগ করে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে সেইদিন থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অধীনস্থ দেশ ভারতকেও নিজেদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বলে ঘোষণা করে। জোর করে ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে নেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভারতীয় জনগণ ও নেতৃবৃন্দ। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র মতই বলশেভিক পার্টি তার সুদৃঢ় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থান থেকেই, তীব্র ফ্যাসিবিরোধী ও নাৎসীবিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে সম্পূর্ণভাবে "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ" হিসাবে চিহ্নিত করে এবং ভারতকে অন্যায়ভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে নেওয়ার বিরোধিতা করে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ-বিরোধিতার লাইন গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই প্রথম পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টি'র মতই বলশেভিক পার্টি'র মূল রাজনৈতিক স্লোগান ও বক্তব্যই ছিল—"এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ—এই যুদ্ধে কোনও সহযোগিতা নয়।" "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে"র যুগে বলশেভিক পার্টি'র তরফ থেকে বিভিন্ন যুদ্ধ-বিরোধী পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা ও ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। প্রত্যেকটিতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে তীব্র আক্রমণ করে যুদ্ধ-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম গড়ে তোলার ডাক দেওয়া হয়।

১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি'র তরফে বলশেভিক পার্টি'র প্রথম সারির নেতা ও লেবার পার্টি'র যুগ্ম-সম্পাদক কমল সরকার *Manifesto of the Labour Party on War and Federation*[৫] প্রকাশ করেন। *Manifesto*-তে লেখা হয়—"To oppose imperialist war plans, to rally to the fight for independence, the first task of the Indian people must be the smashing of Federal Plan." *Manifesto*-র শেষে আহ্বান জানানো হয়—"Not a man, not a rupee for imperialist war. Only an independent India can fight for democracy. No more negotiations, fight to a finish against Federation.......Every issue in India to be decided by mass struggle."

১ মে ১৯৪০ মে-দিবস পালনের আহ্বান জানিয়ে বলশেভিক পার্টি অত্ ইণ্ডিয়ার বেঙ্গল-জার্মানি ইজিনেস কমিটির তরফে প্রকাশিত হয় *Bolshevik Party's Manifesto : The 1st of May.*[৬] কমিটির নামটি নিঃসন্দেহে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। ঐ *Manifesto*-তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও হিটলার উভয়কেই তীব্র আক্রমণ করে লেখা হয়—"It will be the workers of Germany who will destroy Hitler. We shall end our own Hitler, to wit, the English Capitalist Government. We shall forcibly take out India from the grips of the English.

capitalists and break imperialism into pieces." ***Manifesto*-তে সহজানন্দ, ভাঙ্গে প্রমুখ শ্রমিক-কৃষক ও বামপন্থী নেতার গ্রেফ্‌তারের তীব্র নিন্দা করে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর সত্বর মুক্তির দাবি করা হয়।** ***Manifesto*-তে লেখা হয়—"By crushing this imperialism, by breaking it up we shall establish a workers' and peasants' rule in a free India."**

১৯৪০ সালের জুলাই মাসে হিন্দুস্থান বলশেভিক পার্টি'র (বলশেভিক পার্টি অভ্ ইণ্ডিয়ার হিন্দী রূপ) কলকাতা কমিটি **বলশেভিক পার্টি'কা ইলান** (*Elan*) নামে একটি সাইক্লোস্টাইল করা হিন্দী ইস্তাহার প্রকাশ করে।[৭] ঐ ইস্তাহারে সমস্ত শিল্প শ্রমিক ও যানবাহন শ্রমিকদের একযোগে আশু সংগ্রাম শুরু করার ডাক দেওয়া হয়। ইস্তাহারে ৩৩ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দাবি করা হয়। ইস্তাহারে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে "স্বাধীন ভারত" ও "সোভিয়েত ভারত" গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে বলশেভিক পার্টি'র বঙ্গীয় সংগঠনী কমিটি (Bengal Organising Committee) **বলশেভিক পার্টি'র ইস্তাহার** নামে একটি বাংলা ইস্তাহার প্রকাশ করে।[৮] বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই ইস্তাহারে শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের কাছেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আঘাত হানার ও সংগ্রাম শুরু করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। ইস্তাহারে ১৪ জুলাই ১৯৪০ সন্ধ্যায় হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের দাবিতে আন্দোলনকারীদের উপর পুলিসের লাঠিচালনার ঘটনাটি তীব্রভাবে ধিক্কৃত হয় এবং এই ঘটনার প্রতিশোধ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। "ভারত রক্ষার" নামে বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের ও কলকাতার ঝাড়ুদারদের উপর পুলিসের গুলিচালনায় এবং পুলিসের লাঠিচালনায় ঝরিয়ায় শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনাগুলির তীব্র নিন্দাও ইস্তাহারে করা হয়েছিল। "ভারত রক্ষার" নামে সুভাষচন্দ্র বসু, জয়প্রকাশ নারায়ণ, সহজানন্দ, রঙ্গ, বাটলিওয়ালা, আশরফুদ্দিন, শিশির রায়, প্রমোদ সেন প্রমুখকে কারারুদ্ধ করে রাখার বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে ইস্তাহারে তাঁদের শীঘ্র মুক্তির দাবি জানানো হয়েছিল। ইস্তাহারে "অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়ার" ডাক দেওয়া হয়েছিল।

এই ধরনের আরও বহু ইস্তাহার বলশেভিক পার্টি'র তরফে "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ"-এর যুগে প্রকাশ করা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির অংশবিশেষই এই নিবন্ধে উদ্ধৃত করছি। ডিসেম্বর ১৯৪০-এ বলশেভিক পার্টি'র বঙ্গীয় কমিটি একটি বাংলা ইস্তাহার প্রকাশ করে—**জুলুমবাদকে হটাও—বলশেভিক পার্টি'র ইস্তাহার।** *ঐ ইস্তাহারটির শুরুতে বলা হয়েছিল—"মজুর, চাষী, ছাত্র, যুবক, দোকানদার, ব্যবসায়ী—আজ তোমরা কি করবে?" এবং শেষে ডাক দেওয়া হয়েছিল—"নিজেদের সরকার কায়েম কর—অত্যাচারের অবসান কর।"* ইস্তাহারে ঝরিয়ায় শ্রমিকদের উপর গুলিচালনা, গৌরীপুরে শ্রমিকদের উপর লাঠিচালনা এবং শ্রমিক-কৃষক-

ছাত্রদের উপর অত্যাচারের বিভিন্ন ঘটনার তীব্র নিন্দা করে সরকারকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম শুরু করার আহ্বান জানানো হয়। ইস্তাহারে সুভাষচন্দ্র বসু, সহজানন্দ, বাটলিওয়ালা, প্রমোদ সেন, বিশ্বনাথ দুবে, শিশির রায়, আশরফুদ্দিন প্রমুখ রাজনৈতিক বন্দীদের সত্বর মুক্তির দাবি জানানো হয়।

বলশেভিক পার্টি'র বঙ্গীয় কমিটির ছাত্র শাখা কর্তৃক প্রকাশিত একটি উল্লেখযোগ্য সমসাময়িক ইস্তাহারের নাম ছিল—**ছাত্র সমাজের কাছে বলশেভিক পার্টি'র ইস্তাহার—সংগ্রাম শুরু হয়েছে, তাকে সর্বতোভাবে বাড়িয়ে তোল।**[১০] ইস্তাহারটিতে ছাত্রদের মিছিল ও ধর্মঘট করার অধিকার হরণকারী ডি. পি. আই.-এর তৎকালীন একটি সার্কুলার অমান্য করার জন্য ছাত্র সমাজের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছিল। ইস্তাহারে বলা হয়েছিল, আরও বেশি মিটিং-মিছিল-ধর্মঘট করেই এই সার্কুলারকে অমান্য করতে হবে।

বলশেভিক পার্টি'র জেলা কমিটিগুলির তরফ থেকেও বিভিন্ন ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছিল। এই রকম দুটি ইস্তাহারের উল্লেখ এখানে করছি। প্রথমটি ছিল হিন্দুস্থান বলশেভিক পার্টির হাওড়া জেলা কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত এক হিন্দী ইস্তাহার। ইস্তাহারটির শিরোনামের বাংলা করলে দাঁড়ায়—**গ্যাঞ্জেস জুট মিলসের শ্রমিকদের কাছে বলশেভিক পার্টি'র বার্তা।**[১১] ইস্তাহারটির প্রকাশকাল ছিল জুলাই ১৯৪০। ইস্তাহারে গ্যাঞ্জেস জুট মিলসের ধর্মঘটী শ্রমিকদের অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের সমস্ত দাবি আদায় অবধি ধর্মঘট চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করা হয়। ইস্তাহারে শ্রমিকদের জন্য ৩৩ শতাংশ যুদ্ধকালীন ভাতার দাবিসহ বিভিন্ন দাবির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় ইস্তাহারটি প্রকাশ করেছিল বলশেভিক পার্টি'র ব্যারাকপুর জেলা কমিটি। এই বাংলা ইস্তাহারটির নাম ছিল—**চটকল শ্রমিক ধর্মঘট—বলশেভিক পার্টি'র ইস্তাহার।**[১২] এই ইস্তাহারে ধর্মঘটী চটকল শ্রমিকদের অভিনন্দন জানিয়ে ধৃত ধর্মঘটী শ্রমিকদের আশু মুক্তি ও বরখাস্ত শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগ দাবি করা হয়। এই ধর্মঘটকে সমস্ত চটকলে ও অন্যান্য শিল্পে ছড়িয়ে দেওয়ার ডাকও এই ইস্তাহারে দেওয়া হয়েছিল।

শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র আন্দোলন ও বলশেভিক পার্টি

শুধু ইস্তাহার প্রকাশই নয়, ইস্তাহারের বক্তব্যকে কাজে রূপ দেওয়ার চেষ্টাও বলশেভিক পার্টি "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে"র যুগে করেছিল। সক্রিয় যুদ্ধ-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল বলশেভিক পার্টি। যুদ্ধ-বিরোধী কার্যকলাপের অঙ্গ হিসাবে বলশেভিক পার্টি যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন অচল করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালায়। এই সময়ে টিটাগড় ব্যারাকপুর, জগদ্দল, নৈহাটী, গৌরীপুর, হাজীনগর, কাঁকিনাড়া, শ্যামনগর প্রভৃতি অঞ্চলের চটকলগুলিতে এবং আলমবাজার ও বাঁশবেড়িয়ার একটি করে চটকলে বলশেভিক পার্টি'র নেতৃত্বাধীন শক্তিশালী ইউনিয়ন ছিল। হাওড়া জেলার চটকলগুলিতেও

বলশেভিক পার্টি এই সময় প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করতে থাকে। মহালক্ষ্মী ও মোহিনী কটন মিলের সুতাকল শ্রমিকদের মধ্যেও বলশেভিক পার্টির সদস্যরা কাজ করতেন। এগুলি ছাড়াও লেবার পার্টির কমিউনিস্টদের গড়া ইউনিয়নগুলির অধিকাংশই ছিল বলশেভিক পার্টির হাতে, তার সঙ্গে আরও নতুন কিছু ইউনিয়ন যুক্ত হয়।[১৩] এই ইউনিয়নগুলির মাধ্যমে বলশেভিক পার্টি শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার চালিয়ে তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় এবং শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতেই ধর্মঘট করতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে, যাতে এই সমস্ত ধর্মঘটের ফলে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন ব্যাহত হয়।

বলশেভিক পার্টির এই প্রচেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই সব জায়গায় সাফল্য লাভ করে নি। কিন্তু সব জায়গায় সফল হতে না পারলেও বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে আলমবাজার, টিটাগড়, ব্যারাকপুর, জগদ্দল, হাজীনগর, গৌরীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের চটকলগুলিতে শ্রমিক ধর্মঘট হয়।[১৪] এই চটকল ধর্মঘটগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল হুকুমচাঁদ জুট মিলসের (হাজীনগর) ও গৌরীপুর জুট মিলসের (গৌরীপুর) ধর্মঘট। বলশেভিক পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪০ সালের ১ মে, মে-দিবসে, হুকুমচাঁদ ও গৌরীপুর চটকলদুটিতে সফল শ্রমিক ধর্মঘট হয়। কিন্তু তারপর বহুদিন ধরে এই ধর্মঘটের জের চলে। উভয় চটকল থেকেই বহু শ্রমিক ছাঁটাই হন। এর প্রতিবাদে দুটি চটকলেই আবার নতুন করে ধর্মঘট শুরু হয়। বলশেভিক পার্টির পক্ষ থেকে উভয় চটকলেই ধর্মঘটের কাজকর্ম পরিচালনা করা হত। হুকুমচাঁদ ও গৌরীপুর—দুটি চটকলেই মালিকরা লকআউট ঘোষণা করে। গৌরীপুর চটকলে শ্রমিক-পুলিস সংঘর্ষও হয়।[১৫] "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে"র যুগে কলকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিক ধর্মঘটে (২৬ মার্চ—২ এপ্রিল ১৯৪০ এবং ২৬ আগস্ট—৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪০) এবং কলকাতা, হাওড়া জেলা ও ব্যারাকপুর অঞ্চলের বিভিন্ন চটকল ধর্মঘটে বলশেভিক পার্টির সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১৬]

সক্রিয় যুদ্ধ-বিরোধিতার অঙ্গ হিসাবে বলশেভিক পার্টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে লোক ঢুকিয়ে দিয়ে ঘাঁটি গাড়া হবে, যার সাহায্যে প্রয়োজনমত সেই সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে উৎপাদন সম্পূর্ণ অচল করে দিয়ে ব্রিটিশ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে জোর আঘাত দেওয়া যেতে পারে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পার্টির পক্ষ থেকে ইছাপুর গান অ্যাণ্ড শেল ফ্যাক্টরি, কাশীপুর গান অ্যাণ্ড শেল ফ্যাক্টরি, রেলওয়েজ, শিপিং প্রভৃতি শিল্পে লোক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।[১৭] অবশ্য এই উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে অচল করে দেওয়ার মত শক্তি বলশেভিক পার্টির ছিল না এবং ফলে এই যুগে এই সমস্ত শিল্পে কোনও ধর্মঘট হয় নি।

"সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে"র যুগেই বলশেভিক পার্টির কৃষক ভিত্তি প্রসারিত হতে থাকে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভাঙড়, সোনারপুর, হাড়োয়া, সন্দেশখালি প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে বলশেভিক পার্টির যথেষ্টপ্রভাব ছিল। এই অঞ্চলগুলি ছাড়াও হাসনাবাদে

এবং কিছুটা পরিমাণে বর্ধমান জেলার জামালপুরে, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও রাজশাহীতে কৃষক অঞ্চলে বলশেভিক পার্টি প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়।[১৮] ১৯৪০ সালের শেষদিকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার হাড়োয়া থানার বামনচক গ্রামের কামারগাতিতে বলশেভিক পার্টির সুধাংশু দত্ত, বিদ্যুৎ নস্কর, কৃষকনেত্রী তরুলতা মণ্ডল প্রমুখের নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের মত ঘটনা ঘটে। কৃষক-পুলিস সংঘর্ষ হয়, কৃষক-জনতা পুলিসের কাছ থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হন।[১৯]

"সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে"র যুগে ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র ধর্মঘটেও বলশেভিক পার্টির ছাত্র নেতারা সক্রিয় ছিলেন। ১৯৪০ সালের ২ জুলাই থেকে কলকাতার ছাত্ররা সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে হলওয়েলের স্মৃতিস্তম্ভটি অপসারণের দাবিতে এক বিরাট আন্দোলনে সামিল হন। কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র নেতা ও ছাত্র কর্মীদের মতই বলশেভিক পার্টির ছাত্র নেতারা ও ছাত্র কর্মীরা এই আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।[২০]

যুদ্ধ-বিরোধী পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা, ইস্তাহার ইত্যাদি প্রকাশের উদ্দেশ্যে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বলশেভিক পার্টির সদস্যদের উদ্যোগে 'কথা প্রেস' নামে একটি প্রেস গড়ে তোলা হয়। যুদ্ধ-বিরোধী কাজকর্মের উপর দমন-পীড়ন-অত্যাচার ক্রমশ বাড়তে থাকায় গোপন প্রকাশনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকুরিয়ার ১, ডাঃ নগেন্দ্র ঘোষ লেনে বলশেভিক পার্টি একটি সম্পূর্ণ গোপন প্রেস গড়ে তোলে। এই প্রেসের দায়িত্বে ছিলেন নির্মল সেনগুপ্ত। এই প্রেস থেকে বেশ কিছু যুদ্ধ-বিরোধী পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা ও ইস্তাহার প্রকাশিত হয়। প্রায় এক বছর গোপনে চলার পর পুলিস এই প্রেসের অস্তিত্ব জানতে পারে। ১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট পুলিস নির্মল সেনগুপ্ত ও প্রেসের সঙ্গে যুক্ত সকলকেই গ্রেফ্‌তার করে। বলশেভিক পার্টির অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধেও গ্রেফ্‌তারী পরওয়ানা জারি হয়।[২১] শুরু হয় বলশেভিক পার্টির সদস্যদের বিরুদ্ধে "ঢাকুরিয়া বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা।"[২২]

"সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ"-এর যুগে বলশেভিক পার্টি বারংবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার কথা বলেছে, কিন্তু উপযুক্ত শক্তির অভাবে এই লাইনকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় নি। যেখানে কমিউনিস্ট পার্টিরই এই ধরনের সংগ্রাম গড়ে তোলার মত শক্তি ছিল না, সেখানে বলশেভিক পার্টির মত একটি ছোট পার্টির পক্ষে যে সংগ্রাম গড়ে তোলা সম্ভব হবে না, সেটাই তো স্বাভাবিক। তবে আন্তরিকতা ছিল, কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে পুরো ব্যাপারটাই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছিল প্রচারের স্তরে। রাজনৈতিকভাবে বলশেভিক পার্টি এই যুগে যুদ্ধ-বিরোধিতার প্রশ্নে কংগ্রেসী দোদুল্যমানতার তীব্র সমালোচনা করেছে এবং সুভাষচন্দ্র বসুর "আপস-বিরোধিতা"র প্রতিই সম্পূর্ণ আস্থা ও সমর্থন জ্ঞাপন করেছে।

বলশেভিক পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি ও ফরওয়ার্ড ব্লক

১৯৩৯ সালের ৩মে সুভাষচন্দ্র বসু ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন।[২৩] ৯ আগস্ট

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সুভাষ বসুর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[২৪] কংগ্রেস থেকে প্রায় বিতাড়িত অপমানিত সুভাষ বসু কংগ্রেসের বামপন্থীদের এক অংশ সহ কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং কংগ্রেসের বাইরে এক পৃথক বামপন্থী দল হিসেবে ফরওয়ার্ড ব্লককে সংগঠিত করেন। ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হওয়ার পরই নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টি গ্রুপের সদস্যরা ফরওয়ার্ড ব্লককে "ঐতিহাসিক প্রয়োজন" বলে অভিনন্দন জানান।[২৫] তাঁরা সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে চলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন, যদিও কোনও পদ গ্রহণ করেন নি। অপরদিকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ জাতীয় নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে কংগ্রেসে থেকে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁরা ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন নি, যদিও একসঙ্গে আন্দোলন করেছেন। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে রামগড়ে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সময় রামগড়েই সুভাষচন্দ্র বসু পাল্টা "Anti-Compromise Conference" বা "আপস-বিরোধী সম্মেলন" করেন। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা ও কমিউনিস্টরা মূল কংগ্রেস অধিবেশনেই যোগ দেন। কিন্তু স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী, এন. জি. রঙ্গ. ইন্দুলাল যাজ্ঞিক প্রমুখ কৃষক সভার নেতৃবৃন্দ এবং নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক পার্টি সুভাষ বসুর "আপসবিরোধী সম্মেলনে" যোগ দেন। বলশেভিক পার্টি প্রধান গুরুত্ব আরোপ করেছিল বামপন্থী ঐক্যের উপর। বলশেভিক পার্টির লাইন ছিল ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রগতিশীল অংশের প্রতিনিধি সুভাষচন্দ্র বসু ও অন্যান্য বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে যৌথ ভাবে "যুক্তফ্রন্ট" করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং দেশীয় বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী ও তার প্রতিনিধি দক্ষিণপন্থী গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের লাইন।[২৬]

বলশেভিক পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে সমঝোতার অভিযোগ আনে—"Dimitrov's thesis on *United Front* was reduced to the base theory of class collaboration with the reactionary Gandhian bourgeois leadership of the Congress....

The policy of this Party (Communist Party) has been to function as the propagandists of the Congress view, to protect the bourgeois leadership from the fury of the masses, and to fight against those who would advocate a *militant independent policy* of the working-class."[২৭]

বলশেভিক পার্টির চোখে কমিউনিস্ট পার্টি প্রকৃত অর্থে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি ছিল না, এই পার্টি ছিল পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের পার্টি, কারণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে প্রায় কোনও শ্রমিক ছিলেন না। অপরদিকে বলশেভিক পার্টি নিজেকে সম্পূর্ণ শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টি বলেই দাবি করত। পার্টি দলিল অনুযায়ী—"The Bolshevik Party is the Party of the Indian working-class. 88% of its membership is

composed of *factory workers*, 7% is composed of poor peasants and the remaining 5% is composed of poor middle class elements who have proved their loyalty through a long period of hard work."[২৮]

বলশেভিক পার্টি ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : "জনযুদ্ধ" : ১৯৪১—১৯৪৫

১৯৪১ সালের ২২ জুন নাৎসী জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে। আক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে যোগদানের ফলে যুদ্ধের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে কি না, এই নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মত বলশেভিক পার্টির মধ্যেও বিতর্কের সূত্রপাত হয়। যুদ্ধ-বিরোধিতার কারণে বলশেভিক পার্টির প্রথম সারির নেতারা তখন প্রায় সকলেই জেলে বন্দী। ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে নির্মল সেনগুপ্ত একটি পার্টি থিসিস্ লেখেন। সেই থিসিসেই তিনি যুদ্ধের চরিত্র পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে পার্টি লাইনেরও পরিবর্তন প্রয়োজন, এই রকম একটি ইঙ্গিত দেন।[২৯] পার্টি লাইন তখনই পরিবর্তিত না হলেও এই সময় থেকেই পার্টি লাইন পরিবর্তনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়।

নির্মল সেনগুপ্তের থিসিস্ নিয়ে বলশেভিক পার্টির মধ্যে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা এবং তীব্র তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকে। নির্মল সেনগুপ্তের থিসিসের তীব্র বিরোধিতা করেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, বীরেশ গুহ ও কিরণ বসাক। যুদ্ধের চরিত্র পরিবর্তন এবং ফলস্বরূপ পার্টির লাইন পরিবর্তন নিয়ে বলশেভিক পার্টির মধ্যে দুটি পরস্পর-বিরোধী মত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে বলশেভিক পার্টি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—যুদ্ধের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে, এই যুদ্ধ আর "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ" নয়, এই যুদ্ধ এখন "ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জনযুদ্ধ"। ডিসেম্বর ১৯৪১-এই কমিউনিস্ট পার্টিও "জনযুদ্ধ"-এর লাইন গ্রহণ করে। "জনযুদ্ধ" লাইন গ্রহণ করার ফলে বলশেভিক পার্টির মধ্যে ভাঙ্গন ধরে।[৩০]

১৯৪২ সালের ২২ মার্চ কমল সরকারের ১১/সি, টাউনশেণ্ড রোডের বাড়ির একটা বড় ঘরে বলশেভিক পার্টির প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন সম্পূর্ণ গোপনে অনুষ্ঠিত হয়।[৩১] ঐ পার্টি কংগ্রেসেই নির্মল সেনগুপ্ত বলশেভিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৩২] ঐ কংগ্রেসেই নির্মল সেনগুপ্ত কেন্দ্রীয় কমিটির যুদ্ধ সম্পর্কিত থিসিস্ পেশ করেন। ঐ থিসিসে "ফ্যাসিস্ট-বিরোধী জনযুদ্ধে" নিঃশর্ত সমর্থন প্রদানের কথা বলা হয়েছিল। পাল্টা থিসিস্ পেশ করে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার বক্তব্য রাখেন। এই বক্তব্যে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেও যুদ্ধকে "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ" হিসাবেই অভিহিত করেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। প্রথম কংগ্রেস নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের থিসিস্ বাতিল করে ও কেন্দ্রীয় কমিটির থিসিস্ গ্রহণ করে।[৩৩] নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের লাইনের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন বীরেশ গুহ ও কিরণ বসাক। "জনযুদ্ধ" লাইনের বিরোধিতা করে এই তিন

প্রতিষ্ঠাতা নেতা প্রথম কংগ্রেসের পরই বলশেভিক পার্টি ত্যাগ করেন।[৩৪] সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার ঘটল বিচ্ছেদ।

"জনযুদ্ধ" লাইন গ্রহণ করার পর থেকেই শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি বলশেভিক পার্টি এতদিনকার সংগ্রামী, বামপন্থী অবস্থান পরিত্যাগ করে একটি সম্পূর্ণ সংগ্রামবিরোধী, দক্ষিণ-পন্থী অবস্থান গ্রহণ করে। "জনযুদ্ধ" লাইন গ্রহণ করার পর থেকেই বলশেভিক পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে নিঃশর্ত সমর্থন জানায়। "জনযুদ্ধ"-এর যুগে বলশেভিক পার্টি নিরন্তর ফ্যাসিবিরোধী প্রচার-অভিযান চালায় এবং কমিউনিস্ট পার্টি'র মতই ফ্যাসিবিরোধী জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টায় নিরত থাকে। জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সৈন্যবাহিনীর পক্ষে জনগণকে সামিল ও সংগঠিত করার জন্য বলশেভিক পার্টি ব্যাপক প্রচার-অভিযান শুরু করে। এই সময় বলশেভিক পার্টি জাপ-বিরোধী জন-প্রতিরোধ বাহিনী ও গেরিলা বাহিনী গঠন করার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। যুদ্ধকে সর্ব অর্থে সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলশেভিক পার্টি ঘোষণা করে, জাতীয় নেতৃবৃন্দের "ক্রিপস্‌ প্রস্তাব" মেনে নেওয়া উচিত। "ক্রিপস্‌ প্রস্তাব" বর্জনের কারণে বলশেভিক পার্টি জাতীয় নেতৃবৃন্দকে "বিপ্লবের সম্ভাবনায় ভীত" ও "ফ্যাসিস্ট-সমর্থক" বলে তীব্র সমালোচনা করে। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে বলশেভিক পার্টি "ফ্যাসিস্ট-সমর্থক" ("Pro-Fascists") বলে অভিহিত করে। বলশেভিক পার্টি'র বিশ্লেষণ অনুযায়ী—"Congress bourgeoisie are neither Fascists (M. N. Roy's theory) nor Anti-Fascists (P. C. Joshi's theory). Historical tendencies, now in operation, show that the Bolsheviks are right in calling them Pro-Fascists at present."[৩৫]

বলশেভিক পার্টি "আগস্ট প্রস্তাব" গ্রহণের এবং "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে। বলশেভিক পার্টি'র চোখে সমগ্র "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনই ছিল ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধপ্রচেষ্টায় "ফ্যাসিস্ট-সমর্থক" ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর "অন্তর্ঘাতমূলক" কাজকর্মের বাস্তব রূপ। বলশেভিক পার্টি'র অভিমত অনুযায়ী গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ মদতে এই "অন্তর্ঘাতমূলক" আন্দোলন শুরু হয় এবং যতদিন না কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ "আগস্ট প্রস্তাব" প্রত্যাহার করে এই আন্দোলনের নিন্দা করছেন, ততদিন পর্যন্ত এই "অন্তর্ঘাতমূলক" আন্দোলনের দায়িত্ব তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না। বলশেভিক পার্টি'র দৃঢ় অভিমত ছিল, গান্ধীসহ সমস্ত কংগ্রেস নেতার মুক্তি, কংগ্রেসকে বৈধকরণ ও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আলোচনার সূত্রপাত—এই তিনটিরই পূর্বশর্ত হচ্ছে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কর্তৃক "আগস্ট প্রস্তাব" প্রত্যাহার। যতদিন কংগ্রেস এই "প্রস্তাব" প্রত্যাহার না করছে, ততদিন উপর্যুক্ত তিনটির কোনওটিই হতে পারে না। সমস্ত গণফ্রণ্টেই বলশেভিক পার্টি এই লাইন রাখে। বলশেভিক পার্টি ঘোষণা করে, কংগ্রেস "আগস্ট প্রস্তাব" নিঃশর্ত প্রত্যাহার করলে তবেই বলশেভিক পার্টি

কংগ্রেসকে বৈধ করার জন্য, গান্ধীসহ কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য এবং সর্বদলীয় ঐক্য ও সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবি জানাবে এবং প্রয়োজনে আন্দোলন শুরু করবে। এই পার্টি গান্ধীর অনশনকে সম্পূর্ণ "রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত" বলে ঘোষণা করে। এই পার্টির অভিমত ও বিশ্লেষণ অনুযায়ী ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের ফলেই ১৯৪৩ সালের সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ হয়। অর্থাৎ এই অপরাধের দায়িত্ব থেকেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে রেহাই দেওয়া হল। বলশেভিক পার্টির বিশ্লেষণ অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার জনগণের সরকার না হলেও "জনযুদ্ধ"-এর যুগে বাধ্য হয়ে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এই দায়িত্বভার বহন করছে। সুতরাং যুদ্ধের সময়ে সকল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও ফ্যাসিবিরোধী শক্তির উচিত ভারতরক্ষার প্রয়োজনে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করা।[৩৬] "জনযুদ্ধ"-এর যুগের বলশেভিক পার্টির অবস্থান ও ক্রিয়াকলাপকে বিশ্লেষণ করে এই মন্তব্য নিশ্চয়ই করা যেতে পারে, "জনযুদ্ধ"-পূর্ববর্তী যুগে বামপন্থী ঐক্যের প্রশ্নে বলশেভিক পার্টির অবস্থান কমিউনিস্ট পার্টির বাম দিকে হলেও "জনযুদ্ধ"-এর যুগে "জনযুদ্ধ"-এর প্রশ্নে এই পার্টির অবস্থান ছিল নিঃসন্দেহে কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণে।

বলশেভিক পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব

নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, বীরেশ গুহ, কিরণ বসাক ও তাঁদের অল্পসংখ্যক অনুগামীরা বলশেভিক পার্টি ত্যাগ করার পর ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে "জনযুদ্ধ" লাইন গ্রহণের প্রশ্নে ও ফ্যাসিবিরোধী প্রচার-অভিযানে সম্পূর্ণ শক্তিনিয়োগের প্রশ্নে বলশেভিক পার্টির মধ্যে কোনও গুরুতর মতবিরোধ দেখা দেয় নি। বলশেভিক পার্টির সব সদস্যই যে মন থেকে পরিবর্তিত লাইন মেনে নিয়েছিলেন, তা নয়, অনেকের মধ্যেই যথেষ্ট দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু সেটা প্রকট রূপ ধারণ করে পার্টি ভাঙ্গনের দিকে যায়নি। বিষ্ণু মুখার্জী পরিবর্তিত লাইনের বিরোধী ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নকে সম্পূর্ণ সমর্থন এবং সবরকমভাবে সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামও চালিয়ে যাওয়া উচিত। দলের মধ্যে তাঁর বক্তব্যের সমর্থকও ছিলেন। কিন্তু বিষ্ণু মুখার্জী ও তাঁর সমর্থকেরা আপত্তি সত্ত্বেও পার্টি লাইন মেনে নিয়ে বলশেভিক পার্টিতেই থেকে গিয়েছিলেন।[৩৭]

বলশেভিক পার্টির মধ্যে এই সময়ে দুটি বিষয় নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ ছিল। প্রথমত, "জনযুদ্ধ" লাইনকে বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং শ্রমিক-কৃষকের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণের প্রশ্নে বলশেভিক পার্টির মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ দেখা দেয়। বিশ্বনাথ দুবের নেতৃত্বাধীন একটি গ্রুপ "জনযুদ্ধ"-এর যুগে একমাত্র ফ্যাসিবিরোধী কাজকর্ম ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত কাজকর্মই স্থগিত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা শ্রমিক-কৃষকের দৈনন্দিন সংগ্রামে অংশগ্রহণেরও পক্ষপাতী ছিলেন না, কারণ তাতে "ফ্যাসিবিরোধী জনযুদ্ধ"-এর কাজ ব্যাহত হবে। আর অপরদিকে নন্দলাল

বসু, কমল সরকার প্রমুখের নেতৃত্বাধীন গ্রুপটি এই যুদ্ধকে "জনযুদ্ধ" বলে অভিহিত করে ফ্যাসিবিরোধী কাজকর্মে শক্তিনিয়োগ করা সত্ত্বেও শ্রমিক-কৃষকের দৈনন্দিন সংগ্রামে অংশগ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা প্রয়োজনে শ্রমিক ধর্মঘটের পক্ষেও মত প্রকাশ করেছেন এবং এমন কি শ্রমিক ধর্মঘটে নেতৃত্বও দিয়েছেন।[৩৮] "জনযুদ্ধ"-এর যুগেই বলশেভিক পার্টি'র এই গ্রুপের প্রত্যক্ষ সমর্থনে হাজীনগরের হুকুমচাঁদ জুট মিলসে শ্রমিক ধর্মঘট হয় এবং জগদ্দলের চটকলে শ্রমিক বিক্ষোভ হয়।[৩৯]

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে "জনযুদ্ধ" লাইন গ্রহণের সময় থেকেই নির্মল সেনগুপ্ত, নন্দলাল বসু, কমল সরকার, মনোরঞ্জন রায় প্রমুখের নেতৃত্বাধীন একটি শক্তিশালী গ্রুপ বলশেভিক পার্টি'র পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে সকল বলশেভিকেরই কমিউনিস্ট পার্টি'তে যোগদান করা উচিত এই অভিমত প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, যেহেতু "জনযুদ্ধ"-এর যুগে কমিউনিস্ট পার্টি ও বলশেভিক পার্টি'র অবস্থান খুবই কাছাকাছি হয়ে গেছে, সেহেতু বলশেভিক পার্টি'র পৃথক অস্তিত্বের আর কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু অপরদিকে প্রমোদ সেন, বিশ্বনাথ দুবে, শিশির রায়, সুধা রায়, বরদা মুকুটমণি প্রমুখ এই ঐক্যপ্রচেষ্টার বিরোধী ছিলেন এবং বলশেভিক পার্টি'র পৃথক অস্তিত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৪৪ সালের মে মাস পর্যন্ত বলশেভিক পার্টি'র মধ্যে এই দুই মতের দ্বন্দ্ব চলে।[৪০] এটাই হল মতবিরোধের দ্বিতীয় বিষয়।

বলশেভিক পার্টির প্রভাব বিস্তৃতি ও সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই বলশেভিক পার্টি বাংলার বাইরে প্রভাব বিস্তার করতে ও সংগঠন তৈরি করতে সচেষ্ট হয়। এই উদ্দেশ্যে বলশেভিক পার্টি'র প্রথম সারির নেতারা প্রায়ই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যেতেন। ১৯৩৯ সালে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বলশেভিক পার্টি'কে সংগঠিত করার জন্য নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার দিল্লী, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাব সফর করেন। "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ"-এর যুগে ফরওয়ার্ড ব্লকের সংগঠনকে ব্যবহার করেও বলশেভিক পার্টি বাংলার বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের ও শাখা খোলার চেষ্টা করেছে। ১৯৪০ সালে নন্দলাল বসু সংগঠন বিস্তারের কাজে আসামের ও অন্ধ্র প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যান এবং সেই সব জায়গায় কৃষকদের সংগঠিত করেন। ১৯৪০ সালেই বিহারের জামশেদপুরে বলশেভিক পার্টি'র সংগঠন গড়ে ওঠে। দায়িত্বে ছিলেন শ্রীনারায়ণ ঝা। সুরেশ দাসগুপ্ত গিয়ে এই সংগঠনের সদস্যদের রাজনৈতিক ক্লাস নিতেন। উত্তর প্রদেশে সংগঠন বিস্তারের কাজে যান শিশির রায়। তিনি সেখানে কৃষকদের সংগঠিত করতে সচেষ্ট হন। বলশেভিক পার্টি'র তরফে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাঠানদের মধ্যে সংগঠন বিস্তারের কাজে যান আব্দুর রহমান খাঁ ও কমল সরকার। ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকে মনোরঞ্জন রায়কে আসাম, উত্তর প্রদেশ ও বিহারের বিভিন্ন জায়গায় সংগঠনের কাজে পাঠানো হয়। ১৯৪৪ সালে বাংলার বাইরে আসাম, বিহারের জামশেদপুর ও অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চল, উত্তর প্রদেশের কানপুর ও

বস্তি, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর ও ইন্দোর, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কয়েকটি অঞ্চল প্রভৃতি জায়গায় বলশেভিক পার্টির সংগঠন স্থাপিত হয়েছিল। জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত ফাইল থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে বলশেভিক পার্টি ২৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে বলশেভিক পার্টির সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০০। এই ৩০০ জনের মধ্যে ১৯০ জন ছিলেন অবিভক্ত বাংলাদেশে বলশেভিক পার্টির সদস্য। ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি বাংলায় বলশেভিক পার্টির সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৫০০। আসাম, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ—এই চার প্রদেশের প্রত্যেকটিতেই সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৫০। উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও বলশেভিক পার্টির বেশ কয়েকজন সদস্য ছিলেন।[৪১]

বলশেভিক পার্টি ছেড়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান

তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণামে বলশেভিক পার্টিতে ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পক্ষপাতীরাও সব বিষয়ে একমত ছিলেন না। মনোরঞ্জন রায় অবিলম্বে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন। নির্মল সেনগুপ্ত ও নন্দলাল বসু এই মত সমর্থন করলেও আরও কিছু দিন সময় নিয়ে যত বেশি সংখ্যক সম্ভব সদস্য নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন। আর কমল সরকার ও শ্রীনারায়ণ ঝা-র অভিমত ছিল, কোনও তাড়াহুড়া না করে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে সম্ভব হলে বলশেভিক পার্টির প্রায় সকল সদস্যকে নিয়েই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করা উচিত। বলশেভিক পার্টির তরফে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উদ্যোগ গ্রহণ করেন নির্মল সেনগুপ্ত ও নন্দলাল বসু। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে রণেন সেন এবং বলশেভিক পার্টির পক্ষে নন্দলাল বসু বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। শেষপর্যন্ত ১৯৪৪ সালের মে মাসে সোনারপুরে বলশেভিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠান করে নন্দলাল বসু, নির্মল সেনগুপ্ত, কমল সরকার, সুরেশ দাসগুপ্ত, মনোরঞ্জন রায়, হাফিজ জালালুদ্দিন, শ্রীনারায়ণ ঝা, নরেশ দাসগুপ্ত, কেষ্ট ঘোষ, সন্তোষ ঘোষ, জ্যোতির্ময় নন্দী, সুবোধ সেন, আলোকদূত দাস, খগেন রায়চৌধুরী, বিষ্ণু মুখার্জী, অমূল্য মজুমদার প্রমুখ বলশেভিক পার্টিকে বিলুপ্ত করে, কমিউনিস্ট পার্টির আরোপিত সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে, ভুল স্বীকার করে, ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানে অভিলাষী বলশেভিক পার্টির সদস্যরা সোনারপুর থেকে ট্রেনে করে এসে শিয়ালদহে নেমে মিছিল করে ২৪৯, বৌবাজার স্ট্রীটে কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির অফিসে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন।[৪২]

বলশেভিক পার্টি কিন্তু বিলুপ্ত হয় নি। প্রমোদ সেন, বিশ্বনাথ দুবে, শিশির রায়,

সুধা রায়, বরদা মুকুটমণি, আব্দুর রহমান খাঁ, যোগেন সরকার প্রমুখ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ১৯৪৪ সালের ১৫ জুন কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট্ হলে পৃথকভাবে বলশেভিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠান করেন। সেই কংগ্রেসে বলশেভিক পার্টির অস্তিত্ব বজায় রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।. সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এঁদের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির সমান্তরাল একটি পৃথক শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হিসাবে কাজ করতে থাকে।[৪৩]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে আবার সারা ভারত উত্তাল হল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে। "জনযুদ্ধ"-কালীন সংগ্রাম-বিমুখতা ত্যাগ করে বলশেভিক পার্টিও নেমে এসেছিল সেই লড়াইয়ের ময়দানে। কিন্তু সে আলোচনা এই প্রবন্ধের পরিধিভুক্ত নয়।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১. নন্দলাল বসু, কমল সরকার, নির্মল সেনগুপ্ত, সুরেশ দাসগুপ্ত, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার (১৫. ৮. ১৯৮৭,), প্রমোদ সেন ও বরদা মুকুটমণি বিভিন্ন দিনের সাক্ষাৎকারে আমাকে জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে, তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। অবশ্য কমল সরকার, নন্দলাল বসু ও নির্মল সেনগুপ্ত মনে করেন, কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে এসে তাঁরা ঠিক কাজ করেন নি। মনোরঞ্জন রায় মনে করেন, "পার্টি থেকে বের হয়ে এসে আমরা মারাত্মক ভুল করেছি।" মনোরঞ্জন রায়, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ও শ্রমিক আন্দোলন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, জুলাই, ১৯৮৭, পৃ ৪৮-৪৯। তিনি এটাকে "অমার্জনীয় অপরাধ" (পৃ ৪৯) বলেও মনে করেন।

২. ভবানী সেন, রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট, ১৯৪৩ সালের ১৮-২১ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত তৃতীয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের শাখা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলনে গঠিত ও সম্মেলনে গৃহীত, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের শাখা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির তরফে নিরঞ্জন সেন কর্তৃক আরও কয়েকটি দলিল সহ বাংলায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯৪৩, পৃ ১৫-১৬, (প্রথম প্রবন্ধ)। ভবানী সেন লিখেছেন, "তাদের সদলবলে বিতাড়িত করা হয়"। (পৃ ১৬)। রণেন সেন লিখেছেন, "নীহারেন্দু কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন।" রণেন সেন, বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০-৪৮), বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, মে, ১৯৮১, পৃ ১১৫, ১৪১। সরোজ মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে "নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার গোষ্ঠীর পার্টি ছাড়ার" কথা লিখেছেন। সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, প্রথম খণ্ড (১৯৩০-১৯৪১), গণশক্তি পত্রিকা দপ্তর, কলকাতা, মে, ১৯৮৫, পৃ ১৭২।

৩. লেখকের সঙ্গে কমল সরকারের সাক্ষাৎকার—২৫. ৮. ১৯৮৯, ২৭. ৮. ১৯৮৯.।

৪. *National Front*, Vol. II, No. 29, September 3, 1939, Bombay, p. 462; কমল সরকারের সাক্ষাৎকার—২৫. ৮. ১৯৮৯.; প্রমোদ সেনের সাক্ষাৎকার—২১. ৮. ১৯৮৭.; বরদা মুকুটমণির সাক্ষাৎকার—৯. ৯. ১৯৮৭।

৫. Home / Poll. / F. No. 37/3/1940. ব্রিটিশ সরকার লেবার পার্টির এই *Manifesto*-টি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে। এখানে আমি লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত যে-কটি পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা ও ইস্তাহারের উল্লেখ করব, তার সবকটিই ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

৬. Home / Poll. / F. No. 37/91/1940.

৭. Home / Poll. / F. No. 37/78/1940. File-এ *Bulletin of the Bolshevik Party* নামে ইস্তাহারটির ইংরেজি অনুবাদ আছে, মূল হিন্দী ইস্তাহারটি নেই। জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত Home / Poll. / File-গুলিতে সর্বক্ষেত্রেই মূল বাংলা ও হিন্দী পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা ও ইস্তাহার-গুলির ইংরেজি অনুবাদ আছে। ফলে উদ্ধৃত অংশের বঙ্গানুবাদ সর্বক্ষেত্রেই লেখকের।

৮. *Bolshevik Party's Communique*, Home / Poll. / F. No. 37/92/1940.

৯. *Drive Back High-handedness—Bolshevik Party's Circular*, Home / Poll. / F. No. 37/123/1940.

১০. *Bolshevik Party's Circular to the Student Community—The struggle has started, intensify it in all ways*, Home / Poll. / F. No. 37/113/1940.

১১. *Message of the Bolshevik Party to the workers of the Ganges Jute Mills*, Home / Poll. / F. No. 37/82/1940.

১২. *Jute-Mill Workers' Strike—Bolshevik Party's Manifesto*, Home / Poll. / F. No. 37/91/1940.

১৩. লেখকের সঙ্গে নন্দলাল বসুর সাক্ষাৎকার—৩০. ৪. ১৯৮৭, ১২. ৮. ১৯৮৭, ৭. ৫. ১৯৮৯, ১০. ৫. ১৯৮৯; বরদা মুকুটমণির সাক্ষাৎকার—৯. ৯. ১৯৮৭; মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫০-৫১।

১৪. নন্দলাল বসুর সাক্ষাৎকার—৩০. ৪. ১৯৮৭, ১২. ৮. ১৯৮৭, ৭. ৫. ১৯৮৯, ১০. ৫. ১৯৮৯; বরদা মুকুটমণির সাক্ষাৎকার—৯. ৯. ১৯৮৭; মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫১।

১৫. মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫১।

১৬. তদেব, পৃ ৫২, ৫৯-৬০।

১৭. নন্দলাল বসুর সাক্ষাৎকার—৩০. ৪. ১৯৮৭, ৭. ৫. ১৯৮৯, ১০. ৫. ১৯৮৯. ।
১৮. নন্দলাল বসুর সাক্ষাৎকার—১২. ৮. ১৯৮৭, ১০. ৫. ১৯৮৯ ; বরদা মুকুটমণির সাক্ষাৎকার—৯. ৯. ১৯৮৭ ।
১৯. মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫৬ ; নন্দলাল বসুর সাক্ষাৎকার—১২. ৮. ১৯৮৭., ১০. ৫. ১৯৮৯. ; প্রমোদ সেনের সাক্ষাৎকার—২১. ৮. ১৯৮৭ ; বরদা মুকুটমণির সাক্ষাৎকার—৯. ৯. ১৯৮৭ ।
২০. S. B., File No. S. R. 506/1940 (Part—II.)
২১. I. B., File No. 728/1941 ; মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫৫ ।
২২. I. B., File No. 728/1941.
২৩. L. P. Sinha, *The Left-Wing in India (1919-47)*, New Publishers, Muzaffarpur, April, 1965, p. 462.
২৪. Ibid., p. 470.
২৫. ভবানী সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৫ ।
২৬. নন্দলাল বসুর সাক্ষাৎকার—১৭. ৬. ১৯৮৬, ২৪. ৮. ১৯৮৬, ৩০. ৪. ১৯৮৭, ১২. ৮. ১৯৮৭, ৭. ৫. ১৯৮৯. ; কমল সরকারের সাক্ষাৎকার—২৮. ৪. ১৯৮৯ ; মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪৯-৫০, ৫২ ; S. B., File Nos. S. R. 688/1939 and S. R. 506/1940 (Part-II).
২৭. *Indian Politics* : *1941—44*, Draft Political Report of the Politbureau of the Bolshevik Party of India, Published by the Politbureau of the Bolshevik Party of India, Calcutta, June, 1944, Preface, p. 1.
২৮. Ibid., preface, pp. 1-2.
২৯. নির্মল সেনগুপ্তের সাক্ষাৎকার—১৮. ৮. ১৯৮৭., ২. ৫. ১৯৮৯ ; মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৭১ ; S. B., File No. S. R. 508/1942.
৩০. নন্দলাল বসুর সাক্ষাৎকার—২৪. ৮. ১৯৮৬., ৩০. ৪. ১৯৮৭., ১২. ৮. ১৯৮৭. ; কমল সরকারের সাক্ষাৎকার—২৮. ৪. ১৯৮৯., ৮. ৯. ১৯৮৯ ; নির্মল সেনগুপ্তের সাক্ষাৎকার—১৮. ৮. ১৯৮৭ ; গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার—১৭. ৮. ১৯৮৭ ; সুরেশ দাসগুপ্তের সাক্ষাৎকার—১৯. ৮. ১৯৮৭ ; প্রমোদ সেনের সাক্ষাৎকার—২০. ৮. ১৯৮৭ ; বরদা মুকুটমণির সাক্ষাৎকার—৯. ৯. ১৯৮৭ ; মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৭১-৭২ ; S. B., File Nos. S. R. 508 / 1942 and S. R. 688 / 1942.
৩১. S. B., File No. S. R. 508 / 1942. কমল সরকার তাঁর ৮. ৯. ১৯৮৯. তারিখের সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেন, সম্ভবত ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে বলশেভিক পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। মনোরঞ্জন রায়ের (পৃ ৭১)

লেখাতেও ডিসেম্বর ১৯৪১ পাচ্ছি। তবে S. B. File-এ দিন নির্দিষ্ট হিসাবে লেখা থাকায় ঐ তারিখটিই সঠিক বলে মনে হচ্ছে।

৩২. সাক্ষাৎকার—প্রমোদ সেন ও বরদা মুকুটমণি।

৩৩. S. B., File No. S. R. 508/1942.

৩৪. সাক্ষাৎকার—নন্দলাল বসু, কমল সরকার, নির্মল সেনগুপ্ত, সুরেশ দাসগুপ্ত, প্রমোদ সেন ও বরদা মুকুটমণি।

৩৫. *Indian Politics* : *1941-44*, op. cit., p. 67.

৩৬. *Indian Politics* : *1941-44*, op. cit., pp. 1-96 ; *Economic Sabotage and Indian Bolsheviks*, National Political Thesis of the Bolshevik Party of India, Calcutta, January, 1944, pp. 1-16 ; *We Will Resist Japan*, Statement Issued and Authorised by the Labour Party, Bengal, and Adopted and Endorsed by the Labour Party of India, Calcutta, June, 1942, pp. 1-14 ; *Imperialism, Indian Fascism and the People*, Central Committee Plenum of the Bolshevik Party of India, Published by the Bolshevik Party of India, Calcutta, November, 1948, pp. 28-38 ; Home / Poll / F. Nos. 12 / 1 / 1943 and K. W. II to F. No. 12/1/1943 ; S. B., File Nos. S. R. 508/1942, S. R. 687/1942, S. R. 688/1942 and S. R. 501 / 1944 ; সাক্ষাৎকার—নন্দলাল বসু, কমল সরকার, নির্মল সেনগুপ্ত, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ দাসগুপ্ত, প্রমোদ সেন ও বরদা মুকুটমণি ; L. P. Sinha, op. cit., pp. 525-27.

৩৭. কমল সরকারের সাক্ষাৎকার—২৮.৪.১৯৮৯।

৩৮. সাক্ষাৎকার—নন্দলাল বসু ও কমল সরকার।

৩৯. নন্দলাল বসুর সাক্ষাৎকার—১২.৮.১৯৮৭।

৪০. সাক্ষাৎকার—নন্দলাল বসু, কমল সরকার, নির্মল সেনগুপ্ত, সুরেশ দাসগুপ্ত, প্রমোদ সেন ও বরদা মুকুটমণি ; S.B., File Nos. S.R. 508/1942, S.R. 688/1942 and S.R. 501/1944 ; মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৭২, ৮৩-৮৫।

৪১. Home/ Poll / F. No. 12/1/1943 ; সাক্ষাৎকার—নন্দলাল বসু, কমল সরকার ও সুরেশ দাসগুপ্ত ; মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৮১-৮৩।

৪২ 'বলশেভিক পার্টি'র বিলোপ', জনযুদ্ধ, ২৪মে, ১৯৪৪, পৃ ২ ; সাক্ষাৎকার—নন্দলাল বসু, কমল সরকার, নির্মল সেনগুপ্ত, সুরেশ দাসগুপ্ত ও গৌতম চট্টোপাধ্যায় ; মনোরঞ্জন রায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৮৩-৮৫, ৮৯-৯০।

৪৩. সাক্ষাৎকার—প্রমোদ সেন ও বরদা মুকুটমণি।